সাহিত্যিকী

দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯, জুন ২০২২

বাংলা গবেষণা সংসদ

বাংলা বিভাগ | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্যিকী

সাহিত্যিকী • দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড • ৬৩ বর্ষ • জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ • জুন ২০২২

বাংলা গবেষণা সংসদ | বাংলা বিভাগ | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | রাজশাহী

ISSN: 1994-4888

সম্পাদক

সুজিত সরকার

সহযোগী সম্পাদক

দেলোয়ার হোসাইন

সাহিত্যিকী • দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড • ৬৩ বর্ষ • জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ • জুন ২০২২

প্রকাশক

বাংলা গবেষণা সংসদ

বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ফোন: +৮৮০১৭২১৭১১১৪৭ • ই-মেইল : sahityiki.ru@gmail.com

প্রচ্ছদ • রাজীব দত্ত | দাম • ৩০০ টাকা

সাহিত্যিকী

বাংলা গবেষণা সংসদ

বাংলা বিভাগ ● রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ● রাজশাহী

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক

ড. সুজিত সরকার

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

ড. খন্দকার ফরহাদ হোসেন

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. পি. এম. সফিকুল ইসলাম

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শহীদ ইকবাল

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মনিরা কায়েস

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Publisher
Department of Bangla
University of Rajshahi, Bangladesh

Cover • Razib data | Price • 300 taka

সম্পাদকীয়

সাহিত্যিকীর দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড প্রকাশিত হলো। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার একটি যথাযোগ্য উৎকেন্দ্র হয়ে ওঠার যে অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করি, *সাহিত্যিকী* প্রকাশনার ক্রম-পরম্পরা সেই সদাকাঙ্ক্ষার উদ্ভাসন।

তুলনামূলক নবীন গবেষকদের প্রবন্ধ প্রাধান্য পেয়েছে এ খণ্ডে। কিন্তু গবেষক নবীন বলে তাঁদের প্রবন্ধ অর্বাচীন নয়, এগুলোকে বরং বলা যায়, সপ্রাণ ও সম্ভাবনাময় রচনা। কেননা, তাঁদের রচনাসমূহে একটি দৃষ্টিকোণ বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য হয়ে উঠেছে যে, বীক্ষণবিন্দুর স্বাতন্ত্র্যে চর্চিত বিষয়ও কখনো কখনো নতুন চিন্তা, জিজ্ঞাসা ও আগ্রহের আধেয় হয়ে উঠতে পারে। গবেষক-প্রবন্ধকারদের এই অন্যবিধ প্রয়াস *সাহিত্যিকী* নিয়ে আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে বেশ সাযুজ্যপূর্ণ। এছাড়া, স্বতন্ত্র মূল্যায়ন ও নির্মোহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সামগ্রিক সমৃদ্ধির যে প্রত্যাশা আমরা করি, সেটাও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সাহিত্যবোদ্ধা, গবেষক-প্রবন্ধকারদের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন ও সহযোগিতায়। অব্যাহত সহযোগিতার জন্য গবেষক-প্রবন্ধকার এবং অবেক্ষকদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

এ খণ্ডে অনেকদিন বাদে 'পুস্তক-পর্যালোচনা' পর্ব যুক্ত হয়েছে। এ পর্বে প্রফেসর মনিরা কায়েস লিখেছেন কবি ও প্রাবন্ধিক জুলফিকার মতিনের নতুন বই *অমরত্বের জ্বালা* বিষয়ে। তাঁকেও আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সার্বিক পরিকল্পনা ও সহযোগিতার জন্য সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সকল সদস্য এবং এ খণ্ডের সহযোগী সম্পাদককেও জানাই হার্দ্য প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা।

সুজিত সরকার
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ আহ্বান

সাহিত্যিকী বাংলা গবেষণা সংসদের মুখপত্র। এতে প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিবিষয়ক গবেষণামূলক লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

সাহিত্যিকী

বাংলা বিভাগ | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | রাজশাহী-৬২০৫

ই-মেইল: sahityiki.ru@gmail.com

সাহিত্যিকী

দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড • ৬৩ বর্ষ • জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ • জুন ২০২২

সূ চি প ত্র

আহমেদ মাওলা
১১ জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস-পাঠ: *কারুবাসনা*

শারমিন আক্তার
৩১ শাহীন আখতারের *তালাশ* উপন্যাস: বীরাঙ্গনা জীবনের বিরূপ-বাস্তবতা

জাকিয়া সুলতানা মুক্তা
৪৭ সুকুমার রায়ের সাহিত্য: তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ

মোছাঃ আঞ্জুমানআরা বেগম
৬৯ *নামহীন গোত্রহীন* : মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞান

সঞ্জয় বিক্রম
৮৭ বাংলা উপন্যাসে 'আধুনিকতা' ও শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি*

শামীমা আক্তার
১০৯ সিকদার আমিনুল হকের কবিতা : যাপিত জীবনের ক্লেদ ও জঙ্গমতা

মুসলিমা হাফিজ চৌধুরাণী
১২৯ বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় নারী-শিল্পীর অবস্থান

মো. ইসমাইল হোসেন সাদী
১৫১ বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ: মানুষ ও প্রকৃতির বিচিত্র মেলবন্ধন

মনিরা কায়েস
১৭৯ আমি তোমাদের লোক

১৯১ **লেখকের জন্য জ্ঞাতব্য**

1994-4888

সাহিত্যিকী
দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ | জুন ২০২২ | বাংলা বিভাগ
পৃষ্ঠা : ১১-৩০ | শব্দসংখ্যা ৪৬৭৯ | ISSN: 1994-4888 | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস-পাঠ: *কারুবাসনা*

আহমেদ মাওলা*

Abstract

Jibanananda Das's main identity in the history of post-Tagor Bengali poetry is the poet. After his death, his second field of self-expression, the novelist, was gradually unveiled and discovered. As a result of the relentless efforts and research of the researchers, it is known that Jibanananda Das was actually a poet and a novelist at the same time. This is a new surprise for readers. Reading his novels, a question comes to mind, do Jibanananda's poems and novels complement each other? This question is not at all secondary to the intimate reader of Jibanananda's poems. Another dark question arises, about two and a half thousand pages, why he did not publish a single novel in his lifetime, even though he wrote many novels? Or

* অধ্যাপক | বাংলা বিভাগ | কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় | কুমিল্লা, বাংলাদেশ
ই-মেইল: mowla.bangla@gmail.com

why did you leave the trunk full without disclosing? To find the answers to these questions, we have to look back at Jibanananda's life. One has to look at his growing social time, literary-mind, learned knowledge, world of experience. When Jibanananda Das was writing the novel, India was in turmoil. Immediate economic recession of the First World War, anti-British movement, *Kallol* (1923), *Kali Kalam* (1924), *Shanibarer Chithi* (1924), *Parichoy* (1931), *Purbasha* (1932), *Kabita* (1935). The atmosphere in Kolkata at that time was rebellion against Rabindranath, Manwantar (1943), riots (1947), partition (1947) etc. in the forties. He himself went to Kolkata.

Current essay on the subject, perspective, care of his novel written in two episodes. One of his novels *Karubasana* is discussed here. It is just an attempt to explore and theorize Jibanananda's novelistic essence.

◙ সার-সংক্ষেপ

রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দ দাশের প্রধান পরিচয় কবি। মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে উন্মোচিত ও আবিষ্কৃত হলো তাঁর আত্মপ্রকাশের দ্বিতীয় ক্ষেত্র—ঔপন্যাসিক সত্তা। গবেষকদের অবিরাম প্রচেষ্টা আর অন্বেষণের ফলে জানা যায়, জীবনানন্দ দাশ আসলে যুগপৎ কবি ও ঔপন্যাসিক ছিলেন। পাঠকদের জন্য এই এক নতুন বিস্ময় । তাঁর উপন্যাস পাঠ করলে একটি প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খায়, জীবনানন্দের কবিতা এবং উপন্যাস কী পরস্পরের পরিপূরক? জীবনানন্দের কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠকের কাছে এ জিজ্ঞাসা মোটেও গৌণ নয়। আরও একটি গাঢ় প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠার মতো, অনেকগুলো উপন্যাস লিখলেও কেন জীবদ্দশায় তাঁর একটিও উপন্যাস প্রকাশিত হলো না? অথবা কেন প্রকাশ না করে ট্রাঙ্কভর্তি করে রেখে দিলেন? এসব জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে জীবনানন্দের জীবনের দিকেই আমাদের ফিরে তাকাতে হয়। উঁকি দিতে হয় তাঁর বেড়ে ওঠা সমাজ, সময়, সাহিত্য-মানস, অধীত বিদ্যা, অভিজ্ঞতার ভুবনের দিকে। জীবনানন্দ দাশ যখন উপন্যাস লিখছেন তখন ভারতবর্ষ ছিল উত্তাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত অর্থনৈতিক মন্দা, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, *কল্লোল*(১৯২৩), *কালি কলম*(১৯২৪), *শনিবারের চিঠি*(১৯২৪), *পরিচয়*(১৯৩১) *পূর্বাশা* (১৯৩২), *কবিতা*(১৯৩৫) পত্র-পত্রিকার প্রকাশ। কলকাতার তখনকার আবহ ছিল রবীন্দ্র-দ্রোহ,

চল্লিশের দশকে 'মন্বন্তর'(১৯৪৩), 'দাঙ্গা'(১৯৪৬), 'দেশভাগ'(১৯৪৭) ইত্যাদি। তিনি নিজেও চলে গেলেন কলকাতা।

দুই পর্বে লেখা তাঁর উপন্যাসের বিষয়, দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যা নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধ। এখানে তাঁর একটি উপন্যাস *কারুবাসনা* আলোচিত হয়েছে। এটা জীবনানন্দের ঔপন্যাসিক সত্তার তত্ত্ব-তালাশ করার একটা প্রয়াস মাত্র।

সংকেত-শব্দ

নৈঃসঙ্গ্যবোধ, মগ্নচৈতন্য, নিরীশ্বরবাদী, আত্মমগ্ন, বনলতা, নস্টালজিয়া, কারুবাসনা

মূল-প্রবন্ধ

জীবনানন্দের উপন্যাস 'পাঠ' করতে বসলে অনিবার্যভাবে কিছু সংকট ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় পাঠককে। প্রথম সমস্যা—জীবনানন্দ উপন্যাস লিখলেন কিন্তু জীবদ্দশায় তা প্রকাশ করলেন না কেন? কবি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সংশয় থাকা সত্ত্বেও তিনি কবিতা প্রকাশে কখনো দ্বিধা করেননি, প্রবন্ধ প্রকাশেও ছিলেন দ্বিধাহীন। কেবল উপন্যাস প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিধা ছিল কেন? কবিপত্নী লাবণ্য দাশ লিখেছেন—'বলতে শুনেছি, কবিতা যদি আমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে তবে এগুলো সকলের দৃষ্টিপথের আড়ালেই বোধ হয় থেকে যাবে।'[১] কী সেই পথ? অর্থাগমের, নাম-যশকৃর্তির? আমার বিবেচনায় এসবের কিছুই নয়। জীবনানন্দ নতুন যুগের ভিন্নতর উপলব্ধি প্রকাশের পথ খুঁজছিলেন। যুদ্ধোত্তর সভ্যতার স্বরূপ বুঝে নেওয়া, সমাজ ও মানবিক আত্মনিষ্ক্রমণের অন্যতম পথ হিসেবে জীবনানন্দ বেছে নিয়েছিলেন উপন্যাস লেখা। সমাজ-সভ্যতা ও মানুষের জীবনের অন্য একটি চেহারা ধরার চেষ্টা করে আসছিলেন তিনি। কবিতার ক্ষুদ্র আয়তনিক সীমাবদ্ধতার চেয়ে উপন্যাসে বৃহৎ পরিসরে সেই পরিত্রাণ ও পরিচর্যা সম্ভব। কারণ, বলার কথাটা বলে যেতেই হবে। দ্বিতীয় সমস্যা তাঁর বিশাল-বড়ো(সমকালে নয়, উত্তরকালে) কবিত্বখ্যাতি। রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দ দাশের প্রবল প্রতাপকে এড়িয়ে তাঁর উপন্যাসের মহিমা বিশ্লেষণ সত্যি দুরূহ। কারণ আমাদের অভ্যস্ত পাঠরীতির একটা অন্যতম দুর্বলতা

হচ্ছে—আমরা 'বই' পড়ি না 'লেখক' পড়ি : লেখকের 'খ্যাতি' পড়ি। বইতে প্রতিফলিত বিষয়ের দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। জীবনানন্দের উপন্যাস পড়তে গেলে সেই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি।

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসকে সাহিত্যতাত্ত্বিক বিচারের আলোয় আনার যৌক্তিক কারণ কাছে। জীবনানন্দ তাঁর সময়ের সবচেয়ে সচেতন লেখকদের একজন। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, উপন্যাসেও তিনি আলাদা এক নিজস্ব ভাষার জনয়িতা। করণ-কৌশলেও তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেরই রয়েছে ভিন্ন মাত্রা, একাধিক বীক্ষণ-বিন্দু।[২] জীবনানন্দের উপন্যাস বিচারে তাই প্রথাগত 'বিষয় ও শিল্পরূপ' এই ধরনের ন্যারেটিভ থিয়োরি প্রয়োগ করতে চাই না। আমরা তাঁর উপন্যাস পাঠ করতে চাই নন-একাডেমিক এ্যাপ্রোচ থেকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবনানন্দ দাশ সচেতনভাবেই উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'The Bengali Novel Today', 'The Future of the Novel', 'শরৎচন্দ্র', 'Literary criticison in Bengal' ইত্যাদি পড়লে বোঝা যায় সমকালীন বাংলা উপন্যাস বিষয়ে তিনি কতটা সচেতন ছিলেন।

'The Novel in Bengal' প্রবন্ধে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯০৮-১৯৫৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০)-কে তাদের উপন্যাসের দুর্বলতা চিহ্নিত করে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। যদিও জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি হলো, একইরকম জীবনের উপর্যুপরি উত্থাপন। উপন্যাসের বিষয় ও জীবন নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য না থাকলেও জীবনবোধের ভিন্নতা কথকতায় বহুমাত্রিক তাৎপর্য রয়েছে। আসলে উপন্যাসে জীবনানন্দ নিকটতম, অব্যবহিত বাস্তবের, রিয়েলিটির মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলেন, যে বাস্তবতা তাঁকে পরাভূত, ক্লান্ত করেছিলো, সেই বৃত্তান্তই উঠে এসেছে তার উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার পরিসরে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, জীবনানন্দ উপন্যাস লিখেছে দু'টি পর্বে। যেমনঃ

প্রথম পর্বের উপন্যাস

১. *পূর্ণিমা*(১৯৩১)
২. *মৃণাল*(১৯৩১)

৩. *বিরাজ*(১৯৩১)
৪. *কল্যাণী*(১৯৩২)
৫. *জীবনযাপন*(১৯৩২)
৬. *বিভা*(১৯৩৩)
৭. *নিরুপমযাত্রা*(১৯৩৩)
৮. *কারুবাসনা*(১৯৩৩)
৯. *জীবনপ্রণালী*(১৯৩৪)
১০. *প্রেতিনীর রূপকথা*(১৯৩৪)
১১. *জ্যোতি(১৯৩২)*
১২. *অতসী*(১৯৩৩)
১৩. *নভেলের পাণ্ডুলিপি/সফলতা-নিষ্ফলতা*(১৯৩৪) ও
১৪. *আমরা চারজন(১৯৩৪)*

দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস

১. *সুতীর্থ*(১৯৪৮)
২. *মাল্যবান*(১৯৪৮)
৩. *জলপাই হাটি*(১৯৪৯) ও
৪. *বাসমতী উপাখ্যান*(১৯৫১)

প্রথম 'পর্বের উপন্যাসগুলো পড়লে বোঝা যায়, জীবনানন্দ উপন্যাসের রচনাশৈলী বিষয়ে অনেক ভেবেছেন। শিল্পাবয়বের পূর্ণতা সম্পর্কে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে না পারায় উপন্যাসগুলো প্রচ্ছন্ন রেখে দিয়েছেন। প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য নিয়ে নিরীক্ষা করবেন, এরকম হয়তো মনে করেছিলেন। উপন্যাসে লেখায় সময় দেবেন কিনা, এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে প্রভাকর সেন নামে সমকালীন এক তরুণের সঙ্গে কফি হাউজে বসে আলাপ করেছিলেন জীবনানন্দ—

> with pravakor I go to coffee House Talks about Novels & Novel writing, About my Novels of 22/25 years ago—will they hit now? Those Novels a problem; what to do with them? Revise them? Have them fair copied by relevant persons available in cal. As stated (by Dharmades

> Mukharjee?) How to fair copy? have no Mrs. Tolstoy etc. Time Might be better Spent in writing new novels.[৩]

তাঁর উপন্যাসগুলোর ফেয়ার-কপি করার কথা ভেবেছেন, কে করবে কপি? তাঁর তো টলস্টয়ের মতো স্ত্রী নেই। সেই জন্যই প্রকাশ না করে টাঙ্কভর্তি করে রেখে দিয়েছেন। আধুনিক মানুষ যে 'ন্যারেটিভে'র ভেতরে বাস করে, আখ্যান-প্রতিবেশের মধ্যে বাস করে জীবনানন্দের উপন্যাস কী সে-অর্থে 'ন্যারেটিভ'? জীবনানন্দ 'ন্যারেটিভ টেকনিকে' যাননি। তিনি ব্যবহার করেছেন সংলাপ-শৈলী। সংলাপের ভেতর দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি গাঁথা হয়েছে। সংলাপ, কথোপকথন, আলাপচারিতার সিঁড়ি বেয়ে উপন্যাসের শুরু এবং শেষ হয়েছে। সংলাপ বা চরিত্রের মুখে মুখে আলাপচারিতার কথাগুলো স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম। সামাজিক-সাংসারিক মানুষ যেভাবে মনের ভেতরের সত্যটি প্রচ্ছন্ন রেখে কথা বলে, ঠিক সেরকম নয়। তারা কথা বলে সাজিয়েগুছিয়ে, প্রগাঢ় অনুভূতি দিয়ে, উপমা চিত্রকল্প ব্যবহার করে। সংলাপের ভাষা, বাক্য, দৃশ্যমালা, অনুভূতিমালা বস্তুজগতের রূপ অতিক্রম করে একটা চিত্তাকর্ষক মায়ার ভুবন রচনা করে। জীবনানন্দের উপন্যাস 'রিয়ালিস্টিক' তবে ভিক্টোরীয় উপন্যাসের 'এ্যান আর্ট অব দি রিয়েল'-এর মতো বাস্তবের বিবরণ নয়। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতের ভিন্ন একটি সত্য—'যারা লেখক, কল্পনাপ্রবণ, সৃষ্টিশীল স্বভাবের কারণে বাস্তবজীবনে ব্যর্থ হতে বাধ্য, আপন মুদ্রাদোষে তাদের সংসারজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ অধরা, অচরিতার্থই থাকে।' সেইরকম। *কারুবাসনা* উপন্যাসে এই উদ্ধৃতিতে তা স্পষ্ট বোঝা যায়—

> কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময় শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ, লালসা, কলরব, আড়ম্বরের ভিতর, কল্পনা ও স্বপ্ন চিন্তার দুশ্ছেদ্য অঙ্কুরের বোঝা বুকে বহন করে বেড়াবার জন্মগত পাপ। কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার সংসারকে ভরে দিয়েছে ছাই-কালি-ধূলির শূন্যতায়। যে উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্কোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস, অথবা একটা মোটর-কার, কিংবা একটা নামজাদা বই, বা চায়ের দোকান, অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যবসায়ী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেডমাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে [সেই] আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম নেই আমার।[৪]

এই মনোভাবনা, এই দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যর্থতা, নস্টালজিক, অলস, অক্রিয়তা জীবনানন্দ দাশের প্রায় সব উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রকে উজ্জ্বল, মহৎ হতে দেয়নি। তাহলে জীবনানন্দের বিশাল কবি-কিংবদন্তীর বাইরে এনে তাঁর উপন্যাসকে কীভাবে পাঠ করবো? ডিকনস্ট্রাকশনের তাত্ত্বিকরা বলেন, 'টেক্সটের কোনো স্থির উৎস নেই, কাজেই তার স্থির অর্থও নেই। 'টেক্সট' এবং তার 'অর্থের'ও কোনো স্থির কেন্দ্র নেই—'Deconstruction is an approach to understanding the relationship between text and meaning. it was ariginated by the philosppher Jacques Derrida (1930-2004) Who conducted reading of texte Looking for things that run counter to their intended meaning or structural unit.'[৫]

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসকে যদি আমরা এভাবে ভেঙে, বিশ্লেষণ করে দেখি, সেই সম্প্রসারিত অনুভবলোক, যে বিশালতাকে তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন—'কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী/ আমি বহে আনি/ [...] কোনো এক নতুনকিছুর আছে প্রয়োজন/ তাই আমি আসিয়াছি, আমার মতন/ আর নাই কেউ।' ব্যক্তির জীবসত্তা, যে সত্তায় সে রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে আর প্রাত্যহিক জীবন কাটায়, এবং পরমসত্তা, যে সত্তা ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে উপন্যাসের ফর্মে অন্যের দায় নেয়, অন্যের কাছে হাজির হয়, এই দুইয়ের সম্পর্ক নির্ধারণের সরল কোনো পথ নেই।[৬]

তৃতীয়ত, উপন্যাস বাস্তব নয়, বাস্তবের রিপ্রেজেন্টেশন। তাই যেকোনো উপন্যাসই স্থান ও কালের পরিসরকে ধারণ করে। জীবনানন্দের উপন্যাসে *জলপাইহাটি*, *বাসমতি* যে নামে ডাকা হোক না কেন, গ্রাম বলতে বোঝায় তাঁর জন্ম ও চারণভূমি বরিশাল আর শহর বলতে কলকাতা শহর। তাঁর উপন্যাসে গ্রাম ও শহরের আকর্ষণ অতিবিরোধের টানাপোড়েন আছে। গ্রামজীবনের নদী-নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধ, আপ্লুত, ব্যাকুলতা, ফেরার তৃষ্ণা, নস্টালজিয়া যেমন আছে, তেমনি আধুনিক সভ্যতা, নগর কলকাতার নির্মমতা, নগরবাসের দহন যন্ত্রণা, বিমর্ষতা, টেনশন, পরাভবের চিত্র স্পষ্ট। সময়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যখন ভারতবর্ষ উত্তাল, মানুষের দাম কমে যাচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, উপনিবেশের শোষণে পর্যুদস্ত দেশ, হতাশা, অনিশ্চয়তা, চাকরির সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যাওয়া শিক্ষিত যুবক অনেক চেষ্টা

করেও চাকরি পায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, গ্রামে থাকতে না পেরে মানুষ চলে যাচ্ছে শহরে, কৃষক তার চিরকালীন পেশা ছেড়ে হয়ে যাচ্ছে দিনমজুর, শরীর বাঁচাতে নারী শরীরকে পণ্য করতে বাধ্য হচ্ছে। স্থান ও কালের বাস্তবতায় জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবন যেমন আক্রান্ত, পর্যুদস্ত ছিলো, তেমনি তাঁর উপন্যাসের নায়ক প্রভাত, শচীন, সিদ্ধার্থ, নিশীথ, মাল্যবান, মেসে থাকে, টিউশনি করে, চাকরি খোঁজে, পায় না। উপার্জন নেই বলে বিমর্ষ, স্ত্রী অসন্তুষ্ট, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক অমসৃণ।

চতুর্থ সমস্যা, জীবনানন্দের উপন্যাসে তাঁর আত্মজীবনের প্রক্ষেপ। উপন্যাসে আত্মজৈবনিকতা দোষের কিছু নয়, কিন্তু জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সময়ের চাপ, ব্যক্তিজীবনের টেনশন স্বতঃস্ফূর্ততার বদলে সীমাবদ্ধতায় পর্যবিসত হয়েছে। যা তাঁর উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্র্য এবং শৈল্পিক সম্পূর্ণতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। প্রায় সব উপন্যাসে জীবনানন্দ একজন ব্যর্থ মানুষের ছবি তুলে ধরেছেন, ব্যর্থ মানুষটি স্পষ্টতই লেখকের মতন, সংবেদনশীল, কারুবাসনায় কাতর, অন্তর-বাহিরের নিগূঢ় সংবাদ তুলে ধরেন। নিরুত্তাপ, শীতল, মন্থরগতির চরিত্রটি যে জীবনানন্দের, তা পাঠকের কাছে অস্পষ্ট থাকে না।

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসগুলো ধারাবাহিকভাবে পড়লে মনে হয়, মানুষের জীবনে 'দুটি মূল সংকটকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। একটি হচ্ছে অর্থ। বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন। জীবনের জন্য অর্থ উপার্জন করতেই হবে। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। টাকা উপার্জনের এক রকম মানসিকতা আছে। যে ব্যক্তি সেই মানসিকতা অর্জন করতে পারে না তার সমূহ-সংকট। জীবনানন্দ নিজেও টাকা উপার্জনের প্রক্রিয়াকে করায়ত্ত করতে পারেননি। তাঁর উপন্যাসের নায়কেরা সকলেই এই সমস্যায় জর্জরিত। টাকা-শাসিত পৃথিবীর স্থূলতার প্রতি জীবনানন্দের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ছবি তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।'[৭] অন্য সংকটটি হচ্ছে, নারী-পুরুষের যৌনতা সংক্রান্ত সম্পর্কের জটিলতা। পশু-পাখির তুলনায় নর-নারীর যৌন সম্পর্কটা অনেক জটিল এবং রহস্যময়। এই সম্পর্কের সুন্দরতম রূপ হল প্রেম-নিষিক্ত শরীরী সংবেদনার মধুর উপভোগ।

কিন্তু ভালোবাসা নেই, শরীর সম্ভোগ আছে, আবার শরীরী সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয় অথচ প্রেম-বাসনা আছে এ দুটি ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হতে পারে। বৈধ সম্পর্কের

ক্ষেত্রেও দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী-বিরাগ উদাসীন, স্বামী কামে লিপ্ত হতে চায় তখন অবদমন মানসিক বিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সুস্থ যৌন সম্পর্কের জন্য দু'জন মানব-মানবীর ঐকতানে বেজে উঠা দরকার। তেমন না হলে সমস্যা।'[৮] জীবনানন্দের উপন্যাসে যৌনবাসনার অতৃপ্তি ক্ষোভ ও যন্ত্রণা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

'যৌন কামনার তৃপ্তি সাধনে ব্যর্থতা এবং যেহেতু নেহায়েত কোনো শারীরিক ব্যাপার নয়, মানসিক আবেগ ও ইচ্ছে তার প্রধান চালিকা শক্তি, তাই স্নায়ুরোগকে নিছক দৈহিক রোগ বলে ভাবা ঠিক নয়।'[৯] *মাল্যবান* উপন্যাসের উৎপলা ও মাল্যবানের চরিত্রের টানাপোড়েন মূলত উৎপলার বিরাগ, উদাসীনতা ও অহংবোধ মাল্যবানকে মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত করে।

এছাড়া জীবনানন্দের উপন্যাসের অভিনিবেশের দিকগুলো হচ্ছে, নদী-নিসর্গের রূপ, নৈঃসঙ্গ্যবোধ, মৃত্যুচেতনা, ভাষার কাব্যময়তা। আমরা দেখতে পাই, সমকালীন বাংলা উপন্যাসের অন্য লেখকদের তুলনায় জীবনানন্দের উপন্যাস স্বতন্ত্র। বয়ান-ভাষ্যে, ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্র নির্মাণে, ব্যক্তিমানুষের অন্তর্তলদেশ স্পর্শ করে জীবনকে খুলেমেলে ধরার, করণকৌশলে তিনি প্রথাগত দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থা, আধুনিক অবক্ষয়িত সভ্যতার করুণ পরিণতি, অস্থিরতা, হতাশা, অনিশ্চয়তাকে তিনি বৈশ্বিক পটভূমিতে স্থাপন করে উপন্যাসের পরিসরে পরিচর্যা করেছেন।

কারুবাসনা

উত্তর-ঔপনিবেশিক ও উত্তরাধুনিক পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে—'পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের' বৈপ্লবিক ধারণা। অর্থাৎ র‍্যাডিকাল অনুসন্ধান ও অন্বেষণ। জ্যাক দেরিদা(১৯৩০-২০০৪) রঁলা বার্থ(১৯১৫-১৯৮০) এডওয়ার্ড সাঈদ(১৯৩৫-২০০৩) প্রায় সমগোত্রীয়, কারণ এঁরা সবাই পৃথিবী এবং পৃথিবীর টেক্সটকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পাঠ করেছেন। রাজনীতি বিষয়ে দেরিদা নীরব ছিলেন, তাঁর পাঠ টেক্সটের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সাঈদ বরং রাজনীতিতে উদ্বোধিত, টেক্সটের গ্রন্থনকলায় তিনি খুঁজে দেখেছেন ওরিয়েন্টাল রাজনীতি। বার্থ টেক্সটের পাঠ ও বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এভাবে তাঁরা জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলকে সামনে রেখে টেক্সটের ভূগোল এবং মানচিত্রে :প্রবেশ করেছেন, যা সৃষ্টিশীলতার প্রাণবন্ত উদাহরণ। আজকের যুগে 'উপন্যাসকে'

টেক্সট হিসেবে পাঠ করা হচ্ছে, উপন্যাসের ভেতরে খোঁজা হচ্ছে 'আইডিওলজি' মতাদর্শ। কারণ, এ যুগে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আর বোঝা যাচ্ছে না, জটিল, অবোধগম্য হয়ে পড়েছে। ধর্ম বা আইডিওলজি সংস্কৃতির কাজগুলো করতে পারে না। অথচ ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জগৎ ও বহির্পৃথিবীর একটা মধ্যস্থতা দরকার হয়, সেই মধ্যস্থতায় 'আইডিওলজির' ভূমিকা গৌণ। 'উপন্যাস' সেই মধ্যস্থতার কাজটি, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের স্বরূপটি স্বস্তিকরভাবে উপস্থাপন করতে পারে। এজন্য আধুনিক যুগে উপন্যাসের পাঠক বেড়েছে। এর কারণ হচ্ছে, উপন্যাস সত্য বলে না, সত্য বলার দায়িত্বও তার নয়, উপন্যাস মিথ্যার মঞ্জরী। উপন্যাসে উদ্দেশ্য 'জীবন' অবিকল নয়, অনুরূপ 'জীবন'। গ্লোবাল পৃথিবীতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে কাছের মানুষ অপরিচিত, অজ্ঞাত হয়ে পড়েছে আর দূরের জিনিস নিকটতর হচ্ছে। যন্ত্রযুগের এই বিচ্ছিন্নতা একাকীত্ব, শূন্যতা, সম্পর্কেও জটিলতা ভয় ও পরাভবই উপন্যাস পাঠকে জরুরি এবং অত্যাবশ্যকীয় করে তুলেছে। আধুনিক যুগের নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বিচ্ছিন্নতা, সংঘাতময় সম্পর্কের সঙ্গে অভিযোজন, এবং মানিয়ে নিতে সাহায্য করে উপন্যাসের পাঠ।

জীবনানন্দ দাশের *কারুবাসনা*(১৯৩৩ সালে লেখা) উপন্যাসে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন আত্মজীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতা, সংকট, সমস্যা ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা, অপারগতা। *কারুবাসনা* উপন্যাসের নায়কের (নায়ক বলতে যে প্রথাগত চরিত্র আমাদের মনে ভেসে উঠে, সেরকম নয়।) নাম হেম। বয়স চৌত্রিশ, স্ত্রীর নাম কল্যাণী, আড়াই বছরের অপুষ্টিতে আক্রান্ত এক শিশুকন্যা আছে তাদের। স্কুলমাস্টার বাবা, নিপুণ গৃহিণী মা, পিসি এবং কিছুদিনের জন্য গ্রামে আসা মেজকাকা সুরেশ আছেন। চরিত্রগুলোর নাম ভিন্ন হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে 'হেম' অবিকল জীবনানন্দ, স্ত্রী কল্যাণী লাবণ্য দাশের প্রতিরূপ, শিশুকন্যাটি মঞ্জুশ্রী, (মঞ্জুশ্রীর জন্ম ১৯৩১) স্কুলমাস্টার তার বাবা সত্যানন্দ-ভিন্ন কেউ নন। বর্ষার বৃষ্টিসিক্ত গ্রামের যে বাড়িটির বর্ণনা পাওয়া যায়, তা জীবনানন্দের পৈতৃকভিটে সর্বানন্দ ভবনেরই সেই সময়ের প্রতিচ্ছবি। যৌথ পরিবার, একই বাড়িতে থাকেন সবাই, তবু মানুষগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, একাকীত্ব, শূন্যতা বিরাজ করে তাদের মধ্যে—হেমের উক্তির 'যতই বয়স বাড়ছে, এই আটচালা ঘরখানাকে ততই ভালো লাগছে আমার, চারদিকে এই আম কাঁঠাল লেবুর বন, জঙ্গল-মাঠ-নিস্তব্ধতা, বিশেষ করে, এই আষাঢ় শ্রাবণের রাতে, এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।'(পৃ. ৫৩) বর্ণনা যেন

বাল্যস্মৃতি। বরিশালে বাড়ি, উঠোন, গাছপালা, মাঠ সব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এই মায়া আমৃত্যু তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। নিরবচ্ছিন্ন যাপনের ভেতর ওঠে আসে পরিবারের গার্হস্থ্যজীবনের ছবি। যেমনঃ

> তারপর আবার চলে অন্ধকারের মধ্যে পায়চারি—এ কোঠায় ও কোঠায় সে কোঠায়—বারান্দায়. এ যেন আর ইহকালেও ফুরাবে না। নিজের কোঠায়—চেয়ারে এসে চুপচাপ বসে থাকেন। দক্ষিণের ঘরে পিসিমা. মেজকাকা ও মার হাসি-তামাশার কোলাহল ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পাই আমরা—কিন্তু এ ঘরটা খাঁ-খাঁ করতে থাকে। কল্যাণী তার কোঠায়, আমি আমার কোঠায়, বাবা নিজের কোঠায়। জীবনের হাসি–আনন্দকে আমারা কেউ অপছন্দ করি না, কিন্তু পরস্পর এত কাছে থেকেও সে জিনিস আয়ত্ত করবার অধিকার আমাদের নেই [...] কল্যাণী তেতুঁলের ঝোল খেয়ে সন্ধ্যারাতেই বাতি নিবিয়ে জীবনের ক্ষমাহীন জীবনস্রোতের কথা ভাবতে থাকে।[১০]

> **কল্যাণীর উক্তি**

> তুমি আমাকে অপমান করনি বটে. কিন্তু এত রাতে তোমার ঘরে গিয়ে তোমাওকে ডাকব জীবনের মধ্যে আমার না আছে সেই প্রীতি, না আছে এমন আবেগ। [...] বাস্তবিক, তোমার স্ত্রী হয়ে এসে তোমাকে বড্ড লাঞ্ছনা দিলাম। নিজের জীবনের কথা ভেবে দেখ যদি তুমি, তাহলে হয়তো উপলব্ধি করতে পারবে যে, লোকসান আমার বেশি হলেও শূন্যতা যেন তোমার বেশি।[১১]

> **হেমের উক্তি**

> কিন্তু পথে নেমেই কীরকম শূন্যতা, কোনো উপায় দেখি না যেন। চারদিকে সাজানো গোছানো দালান-দোকান, সাইনবোর্ড প্রতিষ্ঠিত জীবনের পরিচয় দেয়। ট্রামে-বাসে মানুষের দল তাদের জীবনের সঙ্কল্প ও কষ্টের কথা প্রচার করে চলে–[১২]

এখানে যে জীবন, তার কোনো অর্থ নেই, সার্থকতা নেই, প্রয়োজন নেই। দিন রাত কী ভয়াবহ একাকীত্ব, খাঁচার পাখিও এর চেয়ে আনন্দে থাকে। সকলের জীবন যেন এক একটা খাঁচা। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর জীবনে অর্থনৈতিক মন্দা, সময়ের চাপে, একজন শিক্ষিত যুবকের জীবন কীভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়, এ উপন্যাস সেই নির্মম বাস্তবতার আখ্যান হয়ে উঠেছে। শুধু হেমের জীবন ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, 'সে স্ত্রীর দিকে তাকায়, দেখে তার জীবন ও ব্যর্থ হয়ে গেছে, নিজের মেয়ের দিকে তাকায়, দেখে

ভবিষ্যতে স্কুলমাস্টারের বেশি কিছু সে হতে পারবে না। একটা অবসাদ, ক্লান্তি, ক্ষয় তাকে আক্রান্ত করে, ইচ্ছা হয় আত্মহত্যার।'[১৩] 'মা-আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।'(জীবনানন্দ, *কারুবাসনা*, ২০১৭: ১১০) হেম সংসারাসক্ত হয়ে কল্যাণীকে বিয়ে করে কল্যাণীর জীবনকে ক্ষয় করেছে, সন্তান জন্ম দিয়েছে অথচ সেই সন্তানের দুধের জন্য স্কুলমাস্টার বুড়ো বাবার দিকেই চেয়ে থাকতে হয়। সে ভাবে এবার কলকাতা গিয়ে দশ-দশ টাকার টিউশনি পেলেও নেবে। 'সাজতে চেয়েছিলাম জীবনের সেবায়েৎ সেজে বসেছি সেবাদাসী' নায়কের এই হতাশা, ব্যর্থতা, চাকরির খোঁজে গ্রাম থেকে কলকাতা গিয়ে মেসে থাকা, চাকরি জোটে না বলে টিউশনি দিয়ে মেসের অন্ধকারে আশাহীন, অনিশ্চিত জীবন কাটানো, চাকরি না পেয়ে গ্রামে ফিরে আসা আবার চাকরির খোঁজে কলকাতা যাবার প্রস্তুতি, এটা সমকালীন বাস্তবতায় অবরুদ্ধ জীবনানন্দের আত্মপরায়ণতার প্রতিচ্ছবি মাত্র। টাকার ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা এবং মানব-অস্তিত্বের বস্তুসত্যের আরেকটি দিক হচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামোর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে চলতে পারা। যেটা উপন্যাসের শেষ বাক্য যদুনাথবাবুর কথা—'পৃথিবীকে যদি উপভোগ করতে চাও তা হলে সৃষ্টির স্রোতের ভিতরকার অক্লান্ত সুবিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতাকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে শেখো, ভগবানও আশীর্বাদ করবেন, নারীও হাতের পুতুল হবে।'[১৪] না, এই সমঝোতা হেমের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যায় না। বারো বছর আগে সে এম.এ. পাশ করেছে, বিয়ের আগে দু-তিনটা কলেজে চাকরি করেছে। বেড়ে ওঠেছে সত্য-সুন্দর- কল্যাণের মূল্যবোধ নিয়ে। সংসার ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের জীবনপদ্ধতির সঙ্গে কোথাও সম্পূর্ণ ভিন্নতা নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছে। নিজেরই মুদ্রাদোষে নিজেই একা হয়ে গেছে আলাদা। এম.এ. পাশ ডিগ্রি, স্ত্রী সন্তান থাকা সত্ত্বেও চৌত্রিশ বছর বয়সে সে সংসারী হতে পারে না, আক্ষেপের কথাই বটে কিন্তু কেন পারে না, তার একটি যৌক্তিকতা হেমের কথায় পাওয়া যায়—

> কারুবাসনা('কারু' শব্দের অর্থ শিল্পকার, নির্মাতা, শিল্পসৃষ্টির ইচ্ছায় মগ্ন) আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময় শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ, লালসা, কলরব, আড়ম্বরের ভিতর, কল্পনা ও স্বপ্ন চিন্তার দুশ্ছেদ্য অঙ্কুরের বোঝা বুকে বহন করে বেড়াবার জন্মগত পাপ। কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার সংসারকে ভরে দিয়েছে ছাই-কালি-ধূলির শূন্যতায়। যে উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্কোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস,

> অথবা একটা মোটর-কার, কিংবা একটা নামজাদা বই, বা চায়ের দোকান, অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যবসায়ী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেডমাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে [সেই] আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম নেই আমার।[১৫] [[৪] *সংখ্যক উদ্ধৃতিটি পুনঃব্যবহৃত হলো।*]

কারুবাসনার নায়ক হেম এই বোধেই উপনীত হয় যে, শিল্প সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা এসবই তার সামাজিক সফলতা ও সংসারজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার প্রধান বাধা বা অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। শিল্পসৃষ্টির রহস্য আর হৃদয়-অনুভূতির রহস্যে তলিয়ে থাকার ইচ্ছাই জীবনানন্দের নায়কের প্রকৃতি। শিল্পীর মগ্নচৈতন্যের জন্য একটা অলস-অবকাশ প্রয়োজন হয়, আবার সংসার-সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য অর্থের সংস্থানও করতে হয়। এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মধ্যে কোনো সহজ সমঝোতা বা মীমাংসা হয় না। লক্ষ্মী আর সরস্বতী যে এক জায়গায় হয় না। এটা হেমের বিশ্বাস, একধরনের আইডিওলজি। মার্কস-এঙ্গেলসের মতে, 'আইডিওলজি' হলো সেই জগৎ যা ইহজাগতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা সমাজ কাঠামোর সেই বাস্তবতা, যা কিছুসংখ্যক ক্ষমতাসীন বৃহৎ অধঃস্তন শ্রেণির ওপর চাপিয়ে দেয়। ইহজাগতিক বস্তুবাদী প্রক্রিয়া থেকে তৈরি হয় সমাজকাঠামো যা উপরিকাঠামোর অন্তর্গত। সোজা কথায়, সামাজিক মানুষই তৈরি করে মতাদর্শ, নৈতিকতা, আইন, নিয়মের সংস্কৃতি। ফ্রয়েড অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, মানুষ নয়, তাদের প্রবৃত্তিই সৃষ্টি করে আইডিয়া বা ভাবাদর্শ, কারণ তা লৈঙ্গিক পীড়ন ও অবদমনজাত। *কারুবাসনার* নায়ক হেম ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। (জীবনানন্দ দাশের কোনো উপন্যাসের নায়কই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।) উপন্যাসে পিতা-পুত্রের আলাপচারিতায় তা উঠে আসে—

- 'কলকাতায় যাবার টাকাটা জোগাড় করেছি। কবে যাবে?'
- 'একদিন গেলেই হয়।'
- 'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় তত ভালো।'
- 'এই সাত বছর ধরে কত বারই তো এলাম-গেলাম, বাবা।'
- 'কিন্তু এবার তো গত সাত বছরের মত হবে না।'
- 'কী করে জানলে, বাবা?'
- 'আমার বিশ্বাস, তোমার মারও বিশ্বাস। [...]' [...]
  'তোমার মেজকাকার সঙ্গে কথা হয়েছিল?'
- 'চাকরি-বাকরির কথা?'
- 'কী বললেন?'

- 'বললেন, তুমি আর তোমার বাবা ইহকালটা নমো-নমো করে কাটিয়ে দাও, পরকালে হয়তো কপাল খুলবে।'
- 'মন্দ বলেনি। কিন্তু পরলোকে আমি তো বিশ্বাস করি।'
- 'আমিতো কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না।'
- 'পারলে না?'
- 'মৃত্যুর পর কী আর থাকে?'
- 'থাকে বইকি, সমস্তই থাকে, আরো গভীর অধ্যাত্মভাবে থাকে, উপনিষদে—
  'উপনিষদ যারা তৈরি করেছেন তারা পরলোক থেকে ফিরে, এসে রচনা করেননি তা, রক্তমাংসের শরীরে ইহলোকে বসে যে ধারণা তাদের ভালো লেগেছে তাই ব্যক্ত করে গেছেন, তাদের বিশ্বাস আশ্বস্ত হবার কোনো কারণ দেখি না।'[১৬]

এটাই হচ্ছে নিরীশ্বরবাদী ইহজাগতিকতা, জীবনানন্দ নিজেও এই বিশ্বাসে স্থির ছিলেন। হেমের জন্য চাকরির অনুরোধ করায় মেজকাকা সুরেশ বিদ্রূপ করেই হেম এবং তার বাবাকে পরকালের বিশ্বাস, নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। কারণ, দরিদ্র স্কুল শিক্ষক পরিবারের প্রতি রয়েছে তার করুণা ও অবজ্ঞা। সুরেশ জীবনকে উপভোগ করেছে, জীবনের নগদপ্রাপ্তিতেই তার আস্থা, তার রয়েছে সাংসারিক সফলতা। বিপরীতে হেম এবং তার বাবা জীবনের আরাম-বিলাসের জিনিশগুলো যাদের হাত থেকে ফসকে গেছে, ঐশ্বর্য যাদের নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত করেছে, তাদের কাছে ত্যাগের মহিমা কৃত্রিম ভক্তের অশ্রু ছাড়া আর কী! ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে আস্থা, বাতাসশূন্য বেলুনের মতোই প্রহসনের নামান্তর। মেজকাকা সুরেশ আবগারি ডিপার্টমেন্টে সাব-ইনসপেক্টর পদে ঢুকে কমিশনার হয়ে এখন পেনশনে আছেন। সার্ভিসে থাকতে স্কুলমাস্টার দাদাকে চাইলে সাহায্য করতে পারতেন, এম.এ. পাশ ভাইপো হেমেরও একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। পিসিমা হেমের চাকরির কথা বলতে তিনি ক্ষুব্ধ হন—'তোমরা মনে কর আমি একেবারে লাটশাহেব, চাকরি আমার পকেটে। মানুষের চাকরি জুটিয়ে দেয় শ্বশুর কিংবা মামা।' 'ওর শ্বশুর তো নেই, মারা গেছেন'—'এমন জায়গায় বিয়ে করতে গেলে কেন?' অথচ, তার হাঁটুতে গাউটের ব্যথার মলম ঘষে দেয়ার জন্য রাতে বৌমাকে চান। তার জন্য দরিদ্র স্কুলমাস্টারকে কয়েক সের দাদখানি চাল, মা পিসিমা তার ভালো খাওয়ার আয়োজনে চাকরানির মত খাটছেন, খাঁটি দুধ, সোডা মদ, ছানার মিষ্টি, লুচিভাজি, সিগারেটের ব্যবস্থা করতে হয় দরিদ্র দাদাকেই এমনকি তার জন্য একটা চাকর রাখতে হয়। তার

চাকরের বেতনটা দাদাকেই দিতে হয়। মেজকাকা বলেন—'ছক্কু, আমাদের বয়, বিহারে বাড়ি। সে তোমাদের চেয়ে ভালো খায়। হেমের মেজকাকা রমেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর। আইসিএসের কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেমাক বেড়েছে, সে তোমাদের ডাকে? একটা চিঠি লিখে? একটা পয়সা পাঠায়, বারোশো টাকা মায়না পায়, ছশো টাকা দাদাকে পাঠাতে পারে না? মেজকাকা সুরেশ এসব বলে চেঁচামেচি করেন কিন্তু তিনি নিজেও তা করতে পারতেন, করেননি। এই যে, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া, অন্যের ওপর দোষ চাপানো, এটা বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির শ্রেণিগত স্বভাব, আত্মপর, স্বার্থপর হয়ে উঠার অসুস্থ মানসিকতা। উপন্যাসের পরিসরে বিষয়টা খুব সূক্ষ্মভাবে পরিচর্যা করেছেন জীবনানন্দ দাশ। হেমের চাকরির ব্যবস্থা হয় না। যদুনাথের মতো অশিক্ষিত লোক গ্রামের লোকদের সঙ্গে সংশ্রব নেই, হঠাৎ ইলেকশনে দাঁড়িয়ে ভোট চাইতে এসে হেমকে উপদেশ দেওয়ার ছলে ডিমের ব্যবসা, দুধ বিক্রি, মোটর ড্রাইভার, এমনকি চাষের কাজ করতে বলেও অপমান করে। দাম্ভিক, আত্ম-অহংকারী মেজকাকার ফাঁপা বুলি, যদুনাথের অপমানের গ্লানি হেমের ভেতরটা সংকুচিত করতে পারেনি। চাকরির চেষ্টা তার অব্যাহত থাকে, কারুবাসনা বা সুকুমারবৃত্তির চর্চা, অর্থাৎ কবিতা লিখছে সে। হেমের বাবা স্কুলমাস্টার হলেও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, হেম যে কবিতা লেখে, সেটা তিনি জানেন, হেম কলকাতা গিয়ে সামান্য পয়সার টিউশনি করুক, পঁচিশ টাকা বেতনের স্কুলমাস্টারি করুক, সেটা তিনি চান না। কারণ, বি.এ. পাশ হেডমাস্টার গিয়ে ইংরেজি পড়াবে, তাকে দেবে হয়ত ভূগোল বা অঙ্ক পড়াতে। এই অবিচার চোখ বুঝে মেনে নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বাবার সঙ্গে হেমের সম্পর্কটা বরং আন্তরিক, সৌহার্দ্যপূর্ণ। তিনি হেমের সমস্যাটা বোঝেন, তার অপারগতা ও ব্যর্থতার জায়গাটা উপলব্ধি করতে পারেন। উপন্যাসে দুজনের আলাপচারিতায় তা বোঝা যায়। 'আমার সন্তান হয়ে যখন জন্মেছ তখন অনেক বেদনা বইতে হবে তোমাকে, কিন্তু প্রাণ যাতে চিমসে যায়, ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে, এমন কোনো জিনিশ করো না তুমি, বেদনা ও সংকীর্ণতা এক জিনিশ নয়।' (জীবনানন্দ: *কারুবাসনা*, ১৯৩৩, পৃ. ৪৬) বাবার এই প্রগাঢ় উচ্চারণের মধ্যে সহমর্মিতা, স্নেহের প্রশ্রয় হেমের অতৃপ্ত হৃদয়ে এতটুকু সান্ত্বনা সে হয়তো পায় কিন্তু স্ত্রী কল্যাণী কিছুতেই হেমের এই অবস্থান মেনে নিতে পারে না। হেমের কাছে স্ত্রীর বিশেষ কোনো চাহিদা নেই, তার স্বপ্ন ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের সংসার। সেটা সম্ভবপর হয় না বলেই হেমের প্রতি তার প্রচণ্ড ক্ষোভ। রোজ পান্তাভাত মরিচ পোড়া, তেঁতুল গুড়ের ঝোলখেয়ে

চোখের সামনে মরতে চায়। রাতে রুগ্ণ মেয়েটা কেঁদে উঠলে কল্যাণী পাখার ডাঁট দিয়ে মারে। কল্যাণী খেঁকিয়ে ওঠে—'আমি পরের মেয়ে, আমাকে গাল দিয়ো না বলে রাখছি।' [...] রাত দুপরে বাপ-মা তুলে গাল। অমানুষ। তোমাদের ওই ঘরে মানুষ কটা শুনি? 'ফের যদি গাল দিয়েছ তো তোমার মেয়ের গলা টিপে আমি জলে ফেলে দিয়ে আসব।'[১৭]

হেম কল্যাণীর দাম্পত্য জীবনের এই তিক্ততা, জীবনান্দ এবং লাবণ্য দাশের ১৯৩৩-৩৪ সালের জীবনের অনুরূপ। উপন্যাস লিখতে বসে জীবনানন্দ দাশ আত্মজীবনের অসহ্য প্রাত্যহিক বাস্তবতাকে এড়াতে পারেননি। দাম্পত্য-জীবনের এই তিক্ততা, ভালোবাসাহীন সম্পর্ক আরো প্রকট রূপ ধারণ করে। সেটা তাঁর দ্বিতীয় পর্বে লেখা *মাল্যবান*(১৯৪৮) উপন্যাসে আরও ব্যাপকভাবে রূপায়িত হয়েছে। অনেকেই *মাল্যবান* উপন্যাসকে জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবনের অন্তঃছবি দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। লাবণ্য দাশ নিজেও *মাল্যবান* উপন্যাস প্রকাশ হোক তা চাননি। কিন্তু আমি মনে করি *মাল্যবানের* চেয়ে *কারুবাসনা* উপন্যাসেই জীবনানন্দের বিবাহ-উত্তর বরিশালের বেকারত্বের দিনগুলোর প্রাত্যহিকতা ও সংসার-দাম্পত্য টানাপোড়েনের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। একজন সমালোচক লিখেছেন—'তাঁর নায়ক-নায়িকা কেউ কেউ তাঁর নিজের এবং তাঁর স্ত্রীর আদলে সৃষ্ট, সন্দেহ নেই। নায়িকা পরিপাটি সাংসারিকতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, কর্তৃত্বের সুযোগ, গতানুগতিক সুখ-ভোগ, স্বামীর বিত্ত-বেসাত ইত্যাদির অনুরাগী, কিন্তু এসবের অভাবে অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্ট, আর নায়ক নিশ্চেষ্ট, নিরীহ, পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে অসমর্থ, অর্থ উপার্জনে ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে নিরুৎসাহ, কর্মকুণ্ঠ, ভোগলিপ্সু, আত্মমগ্ন, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে অপরাধবোধে পীড়িত, স্ত্রীর চাপে বিপর্যস্ত—স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অসুখী। জীবনানন্দ উপন্যাসে কোথাও কোথাও আত্মজৈবনিক।'[১৮] *কারুবাসনা* উপন্যাসে দুটো শাখা কাহিনি দেখা যায়। একটি হচ্ছে, কল্যাণীর সঙ্গে ছোটবেলায় নির্মলদা নামের একজনের সম্পর্ক ছিলো। স্বদেশি করতো বলে ম্যাট্রিক পাশের পরই জেলে যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চামড়ার ট্যানারিতে চাকরি নিয়েছিল। কল্যাণীদের পাশের বাড়িতেই ছিল। সে যক্ষায় আক্রান্ত, মৃত্যুশয্যায়। তাকে দেখার জন্য কল্যাণী মেদিনীপুরে যেতে চায়। কিন্তু যাওয়ার খরচ দেয়ার মতো হেমের সামর্থ্য নেই। গয়নার বাক্স কল্যাণীর একমাত্র সম্বল, আজ বিক্রি করে দিলে অভাবের দিনে কী হবে! তাছাড়া গয়নাগুলো তো শুধু কল্যাণীর জিনিশ নয়—এ তো

খুকির জিনিশ, তাকে বঞ্চিত করার অধিকার তার নেই। এ ভেবে নির্মলের মৃত্যুশয্যায় যাওয়ার কথা বাদ দেয়। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হচ্ছে, 'বনলতা' নামের একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই এই উপন্যাসে। উদ্ধৃতি—

> সেই বনলতা– আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে: [...] বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল; কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝপথে গেল থেমে, তারপর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে, শামুক-গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নিচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।
> তারপর তাকে আমি দেখিনি।
>
> অনেকদিন পর আজ আবার সে এল; মনপবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরে, চিকন চুল ঝাড়তে ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি অন্ধকারে তার যাত্রা—।[১৯]

'বনলতা সেন' কে? এই প্রশ্ন নাকি স্বয়ং জীবনানন্দ দাশকেই কেউ কেউ করেছেন। উত্তরে তিনি কী বলেছিলেন, তা কোনো গবেষক উদ্ধার করতে পারেননি। *কারুবাসনা* উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৩৩, 'বনলতা সেন' কবিতা ১৯৩৪-এর রচনা। *জীবনানন্দ সমগ্র*'-এর তৃতীয় খণ্ডে (১৯৮৬) সম্পাদক দেবেশ রায় লিখেছেন '১৯৩৪ সালে চিহ্নিত কবিতার সেই খাতাটিতে বেশ কয়েকপৃষ্ঠা সযত্নে কাটা। তারই একটিতে 'বনলতা সেন' কবিতাটি ছিল। উল্লেখ্য 'বনলতা সেন' 'কবিতা পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৪২ সংখ্যায়(১৯৩৫ সাল) প্রকাশিত হয়েছিল। আবদুল মান্নান সৈয়দ জানিয়েছেন, 'বরিশালে প্রথম যৌবনে হয়তো কোনো নারীর প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ, যার নাম ছিল 'বনলতা (এটাই গোপনস্বভাবী কবির পক্ষে বেশি সম্ভব) অথবা কবি তার নামকরণ করেছিলেন 'বনলতা'। 'সেন' উপাধি দিয়ে 'নাটোর' নামক তদানীন্তন রাজশাহী জেলার একটি অঞ্চলের অধিবাসী করে কবি তাকে বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট করেছিলেন। এমনকি তার মুখে 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' এই অতিসাধারণ প্রাত্যহিক কথাটি বসিয়ে দিয়েছিলেন।'[২০] এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, 'বনলতা সেন' জীবনানন্দ দাশের কল্পনারাজ্যের অশরীরী ছায়ামাত্রা নয়, তার

অস্তিত্ব বাস্তবেই ছিল। *কারুবাসনা* উপন্যাসের আরেকটি জায়গায়, হেম এবং তার বাবার আলাপচারিতায় আরো বাস্তব সত্য হয়ে উঠে এভাবে—

- 'বহুদিন কলকাতা দেখি না, কে কোথায় বলতে পারো?'
- 'না তো।'
- 'আর বনলতার বাবা সেই কেদারবাবু- আচ্ছা এমন বন্ধু কি মানুষের এক জীবনের তপস্যায় জোটে? চল্লিশটা বছর পাশাপাশি আমরা কাটালাম। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাটির মতো মন, কত ক্ষণে-অক্ষণে আমার 'কাছে এসে বসেছেন। এমনি বৃষ্টির রাতেও কত গভীর রাত পর্যন্ত মুখোমুখি বসে আমরা আলাপ করেছি কিংবা চুপচাপ বসে রয়েছি।' [...] 'আর বনলতা? [...] 'মনে হয় তার কথা তোমার?'[২১]

বনলতার বাবার নাম কেদারবাবু। প্রায় 'চল্লিশ' বছর তারা পাশাপাশি ছিলেন। কেদারবাবুর 'চেয়ারা লম্বা চওড়া' 'মাটির মতো মতো মন'—এসব কথা কি কেবল উপন্যাসের বর্ণনা? বাস্তবের নয়? আমাদের ধারণা ১৯৩০ সালে ঢাকার বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি দেশের বাড়ি বরিশালে চলে গিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে ব্রজমোহন কলেজে চাকরি পাওয়ার আগ পর্যন্ত জীবনানন্দ সম্পূর্ণ বেকার ছিলেন। আর্থিক অনটন, অফুরন্ত অবসর এই সময়ে গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি *বনলতা সেন* গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ লিখেছিলেন। এসময় লেখা উপন্যাসে তার আত্মজীবনের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে। *কারুবাসনা* উপন্যাসের 'হেম' চরিত্রটিকে জীবনানন্দ দাশের অবিকল আত্মজৈবনিক না-ও ধরি, অন্তত 'অনুরূপ' তো বলতে পারি। কারণ, কল্পনার ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব আর উপন্যাস, বাস্তবের নিকটবর্তী শিল্প। সেই হিসেবে জীবনান্দ দাশের জীবনে প্রতিবেশী 'কেদারনাথ সেনের' মেয়ে 'বনলতা সেন'-এর অস্তিত্ব এবং উপস্থিতি বাস্তব, কল্পনার সৃষ্টি নয়। 'বনলতা' নামটি আমরা প্রথম পাই তাঁর *কারুবাসনা* উপন্যাসে। তখনও 'বনলতা সেন' কবিতাটির জন্ম হয়নি। এই কবিতাটির একটা খসড়া পাওয়া গেছে তার খাতায়—

শেষ হলো জীবনের সব লেনদেন
বনলতা সেন।
কোথায় গিয়েছ তুমি আজ এই খেলা
শালিখ করে না তার নীড় অবহেলা
উচ্ছ্বাসে নদীর ঢেউ হয়েছে সফেন
তুমি নাই বনলতা সেন।

এছাড়া 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায়ও নামটি দেখা যায়—

'মনে আছে? শুধালো সে—শুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন।' শৈশবেই দেখেছিলেন প্রিয় দর্শিনী 'বনলতা সেন'কে এবং একবার চকিতে দেখেই তার প্রেমে পড়েছিলেন। জীবনের তরে ভালোবেসেছিলেন তাকে। তারপর হারিয়ে গেছে সে। নাহলে কী করে বলেন—'চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল সে। তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝপথে গেল থেমে, [...] তারপর, পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।' যদি প্রেমময় কোনো সম্পর্কই না থাকবে, তবে তার ঘরের দিকে আসতে চেয়েছিল কেন? আসতে গিয়ে মাঝপথে 'অন্যমনস্ক নত মুখে' থেমে গেল। তারপর অদৃশ্য। এ দৃশ্য কী কেবলই কল্পনার? হতে পারে না। 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের জীবনে বাস্তব নায়িকা, প্রণয়িনী, প্রেমিকা, মধুর মঞ্জরী, বিরাট নস্টালজিয়া।

এই উপন্যাসে জীবনানন্দের আত্মচরিত্রের প্রক্ষেপ আছে। স্মৃতি ও চেতনার প্রকাশ আছে। বোঝা যায়, জীবনানন্দ যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, কবিতায় তা প্রকাশ করতে পারছিলেন না। তার জন্য দরকার হয়েছিল উপন্যাসের মতো বৃহৎ-পরিসর। সময়ের বাস্তবতা এমনভাবে তার জীবনের ওপর চেপে বসেছিল, কিছুতেই তিনি সেই রূঢ় বাস্তবতাকে এড়াতে পারছিলেন না। তাই আত্মজীবনই হয়ে উঠেছে তাঁর আত্মনিষ্ক্রমণের অনিবার্য পথ। ব্যক্তি-জীবনের পরিসরকে ব্যবহার করেতে গিয়েই স্মৃতি ও চেতনায় তাঁকে ভর করতে হয়েছে। নায়ক-নায়িকার নাম যা-ই হোক না কেন, স্বভাবে ও জীবনভাষ্যে তা জীবনানন্দেরই আত্মপ্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায়। যেন বেকার, বিপর্যস্ত, বিপন্ন, উৎকণ্ঠিত অথচ সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ব্যস্ত। সুকুমারবৃত্তির চিন্তার কারণেই সে কর্মকুণ্ঠ অথবা কর্মহীন। তার স্ত্রী বা প্রেমিকা ক্রমাগত সংসার অনটন, দরিদ্রতায় অসন্তুষ্ট। কারুবাসনার কারণে সংসার ছাই-কালি মাখা। অথচ কোনো আদর্শ বা ঈশ্বর-বিশ্বাসের স্থান নেই জীবনে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা চাকরির খোঁজে কলকাতায় যায় কিন্তু চাকরি পায় না। দমবন্ধ মেসে-বোর্ডিংয়ে থাকে, টিউশনি করে, ব্যর্থ হয়ে গ্রামে ফিরে আসে, আবার যায় কলকাতায়। তবু তাদের বেকারত্ব, দারিদ্র্য ঘোচে না। এভাবেই নিঃশেষিত হয় জীবন। এই বোধ-উপলব্ধিতে *কারুবাসনা* উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে।

তথ্যনির্দেশ

১. লাবণ্য দাশ, 'কবির গল্প', *জীবনানন্দ দাশের গল্প*(কলকাতা: দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানি, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ)
২. সুমিতা চক্রবর্তী, *জীবনানন্দ: সমাজ ও সমকাল*(কলকাতা: সাহিত্যালোক, ২০১৬), পৃ. ৪৩
৩. শাহাদুজ্জামান, *একজন কমলালেবু*(ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭), পৃ. ১৯০
৪. জীবনানন্দ দাশ, 'কারুবাসনা', *তিনটি উপন্যাস*(কলকাতা: প্রতিক্ষণ, ২০১৭), পৃ. ৪০
৫. Deconstruction, wikipedia, https://en.m.wikipedia.org
৬. মোহাম্মদ আজম, *কবি ও কবিতার সন্ধানে*(চট্টগ্রাম: কবিতাভবন, ২০২০), পৃ. ১৫
৭. সুমিতা চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
৮. তদেব, পৃ. ৪৮
৯. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ*, ভাষান্তর: অরূপরতন বসু(কলকাতা: দীপায়ন, ২০২১), পৃ. ১১১
১০. দেবেশ রায় সম্পা., 'তিনটি উপন্যাস', *জীবনানন্দ সমগ্র* থেকে পুনর্মুদ্রিত(কলকাতা: প্রতিক্ষণ, ২০১৭) পৃ. ৯০
১১. জীবনানন্দ দাশ, *কারুবাসনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
১২. তদেব, পৃ. ১০৮
১৩ সালাহউদ্দিন আইয়ুব, *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা*(ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ৭৬
১৪. জীবনানন্দ দাশ, *কারুবাসনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২
১৫. তদেব, পৃ. ৪০
১৬. তদেব, পৃ. ৪৪-৪৫
১৭. তদেব, পৃ. ৬৪
১৮. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা*(ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৯), পৃ. ৪৬
১৯ দেবেশ রায় সম্পা., *জীবনানন্দ সমগ্র*(তৃতীয় খণ্ড)(কলকাতা: প্রতিক্ষণ, ১৯৮৬), পৃ. ৪২
২০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, ২০১৭: 'শুদ্ধতম কবি', অনু হোসেন সম্পা. *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি* ষষ্ঠখণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭), পৃ. ১০
২১. জীবনানন্দ, *কারুবাসনা*, পুর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

সাহিত্যিকী
দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ | জুন ২০২২ | বাংলা বিভাগ
পৃষ্ঠা : ৩১- ৪৬ | শব্দসংখ্যা ৩৫৬৬ | ISSN: 1994-4888 | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শাহীন আখতারের *তালাশ* উপন্যাস বীরাঙ্গনা জীবনের বিরূপ-বাস্তবতা

শারমিন আক্তার*

Abstract

Shaheen Akhtar (Born 1962) is an intellectually stimulating litterateur of contemporary Bengali literature. She starts to receive critical attention with her debut novel *Palabar Path Nei* (2000). *Talash* (2004) her second novel has been exceptional creation. This novel centres around the 1971 war of independence (1971), the victims of Pakastani atrocities in 1971, especially Bangladeshi women affected by the war of independence. Shaheen Akhtar's *Talash* for a perfect picture of

* সহকারী অধ্যাপক | বাংলা বিভাগ | বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল, বাংলাদেশ
ই-মেইল: slucky.bu.ju@gmail.com

the adverse reality of Birangana's life is truly an outstanding work. Twenty-eight years after independence, a researcher by the name of Mukti interviewed the heroines and the reality of their struggle for survival during and after the liberation war came to light. Through Maryam, the novelist paints a picture of the realities of life of the heroines. This helpless woman has received deception and reprimand wherever she wanted to live. This paper aims to project the pains, agonies, and the conflicting emotions of fulfilment and non-fulfilment of the war women of 1971.

◙ সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের প্রাজ্ঞ ও প্রত্যয়ী কথাসাহিত্যিক শাহীন আখতার(জ. ১৯৬২)। প্রথম উপন্যাস *পালাবার পথ নেই*(২০০০) রচনার মধ্যদিয়ে পাঠক-সমালোচকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকাশের দিক থেকে দ্বিতীয় *তালাশ*(২০০৪) উপন্যাসটি প্রকৃতই তাঁর অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ম। মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাক্রান্ত এবং যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট মানুষ বিশেষত নারী এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বীরাঙ্গনা জীবনের বিরূপ বাস্তবতার নিখুঁত চিত্র শাহীন আখতারের *তালাশ* যথার্থই এক অসামান্য রচনা। স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ আটাশ বছর পর মুক্তি নামে জনৈক গবেষক কর্তৃক বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে ওঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তরকালে তাদের বেঁচে থাকা তথা টিকে থাকার সংগ্রামের হাল-হকিকত। মরিয়মের মধ্যদিয়েই ঔপন্যাসিক বীরাঙ্গনাদের জীবনবাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন। যাকে যেখানে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে সেখানেই অসহায় এই নারী পেয়েছে প্রতারণা ও ভর্ৎসনা। মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাঙা-গড়া, প্রত্যাশা-প্রাপ্তির অন্বেষণই আলোচ্য প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

সংকেত-শব্দ

বীরাঙ্গনা, সম্ভ্রম, বঙ্গবন্ধু, যুদ্ধাপরাধী, পুনর্বাসনকেন্দ্র, পাক-বাহিনী, স্বাধীনতা

মূল-প্রবন্ধ

প্রতিশ্রুতিশীল কথাসাহিত্যিক শাহীন আখতারের লেখালেখির হাতেখড়ি ছোটবেলাতেই। *তালাশ* উপন্যাসের জন্য তিনি দেশি-বিদেশি একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্য অনেক উপন্যাস থেকে আলোচ্য উপন্যাসটি স্বতন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলোতে সাধারণত মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ আলোচনার সূত্রে সংক্ষিপ্ত পরিসরে নারীদের অবদান আলোচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ সবই যেন দুই লাইনে প্রকাশযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। শাহীন আখতার সেই ক্ষুদ্র অংশে আলোচিত নারীদের প্রসঙ্গই প্রধান হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে, তাদের প্রকৃত পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। এই নারীদের অতীত ও বর্তমান জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তা। ঠিকানাহীন মরিয়মরা জলে ভাসা পদ্মের ন্যায় ভেসে বেড়ায় অবিরাম। সংসারে কোথাও তাদের ঠাঁই নেই। নিজেদের মেধা ও শ্রমের ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকতে গিয়েও প্রতিনিয়ত তাদের শিকার হতে হয় অপমান, অসম্মান এবং লাঞ্ছনার। সহিংসতার সরাসরি বর্ণনার পরিবর্তে ঔপন্যাসিক চরিত্রের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের বিভীষিকাময় জীবনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন।

উপন্যাসটি অনেকগুলো অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অংশের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ পৃথক শিরোনাম। শুরু হয়েছে 'জলাভূমির গোলকধাঁধা' শীর্ষক শিরোনামের মাধ্যমে আর সমাপ্তি ঘটেছে 'তালাশ' অংশের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও বীরাঙ্গনারা কোনো ঠিকানার সন্ধান খুঁজে পাচ্ছেন না। গোলকধাঁধার সমাধান তালাশ করে চলেছেন নিরন্তর। অন্বেষণ দিয়ে শুরু আর অন্বেষণেই উপন্যাসের সমাপ্তি। মরিয়ম ওরফে মেরি নামক চরিত্রের জবানীতেই কাহিনির সূত্রপাত। উপন্যাসে শাহীন আখতার মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করলেও বীরাঙ্গনা মরিয়মের কথা সর্বাগ্রে ঠাঁই পেয়েছে। জীবনের জটিল ঘূর্ণাবর্তে ধাক্কা খেতে খেতে মরিয়ম বয়ে বেড়ায়

নিজের প্রায় বিলীয়মান অস্তিত্বকে, *তালাশ* উপন্যাসের জন্য 'এশিয়ান লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্তিতে *The Daily Star*(বাংলা)-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শাহীন আখতার বলেন—

> এটি মুক্তিযুদ্ধের হলেও এর বিশাল অংশজুড়ে যুদ্ধোত্তর সময়ের কাহিনি। *তালাশ* লেখার পটভূমিতে রয়েছে ৭১-এর ওরাল হিস্ট্রি প্রোজেক্টে আমার কাজের অভিজ্ঞতা, যা আইন ও সালিশ কেন্দ্র ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে শুরু করেছিল। তখন কয়েকজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার ছিল চোখ খুলে দেয়ার মতো। তারা নির্যাতন বা লড়াই করে বাঁচার কাহিনি বলতে গিয়ে যুদ্ধের নয় মাসের মধ্যে আটকে থাকেননি। বরং কাছাকাছি সময়ের বা বর্তমান সময়ের অভিজ্ঞতা বেশি করে বলতেন। তাছাড়া তাদের যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের কষ্টের অভিজ্ঞতা কখনো কখনো যুদ্ধের ভয়াল অভিজ্ঞতাকে ঢেকে দিত। আমি যখন লিখতে বসি, আমার ঝুড়িতে বীরাঙ্গনাদের শুধু নয় মাসের নির্যাতনের স্মৃতিই নয়, তার পরবর্তী ২৬, ২৭, ২৮ বছরের স্মৃতির সম্ভার। তখন আমার নিজের কাছে একটা সরল যুক্তি ছিল—আমি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস লিখছি ঠিক আছে, কিন্তু লিখতে বসেছি ২০০০ সালে। যুদ্ধপরবর্তী এ ৩০ বছরের স্মৃতি কী করে বাতিল হবে, যেখানে মানুষগুলো এখনো চরম ভুক্তভোগী! সত্যি বলতে—চোরাবালির তলদেশের জলস্রোতের মতো তাদের উৎপীড়িত হওয়ার ক্ষরণ আমরা খালি চোখে দেখি বা না-দেখি, তা আমৃত্যু বইতেই থাকে। আমি চাইছিলাম, সেটা *তালাশের* পাতায় উঠে আসুক।[১]

গবেষক মুক্তি গৃহীত সাক্ষাৎকারে খুঁজে পাই মরিয়ম, অনুরাধা, শোভারাণী, টুকি, বিন্দুবালার ন্যায় বেশ কয়েকজন সম্ভ্রম হারানো নারীর জীবনাভিজ্ঞতার কথা। ১৯৬৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে এদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অঙ্গনে সংঘটিত ঘটনাক্রমের উপস্থিতি লক্ষণীয় এ উপন্যাসে। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব এবং পরবর্তী মরিয়মের জীবনাচারের মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক বীরাঙ্গনা জীবনের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন। 'মহাভারতের অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের পুরো যুদ্ধটা দেখতে হয়েছিল। দেখিয়েছিলেন সঞ্জয়—এক অন্ধ পিতাকে পুত্রদের হত্যাদৃশ্য, কৃষ্ণের কূটচাল, ধর্মপুত্রের মিথ্যাচারণ, বালক অভিমন্যুর চক্রব্যূহে প্রবেশ।'[২] অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সামনে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যেরূপ নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন, গবেষক মুক্তি চরিত্রের

মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক সেরূপ সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের তথ্যচিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরতে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

মুক্তি তার সাক্ষাৎকারে যুদ্ধাক্রান্ত মানুষগুলোর বিশেষত নারীদের একান্ত আপনার কথামালা তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। কাজটি পরিচালনা করতে গিয়ে গবেষক নিজেও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বহু অজানা সত্য আবিষ্কারে হয়েছেন সক্ষম। 'মুক্তি নাম ব্যতিরেকে যুদ্ধের আর কিছু ধারণ করে না, জানেও না বিশেষ। [...] বরং আগেভাগে কিছু জানার চেয়ে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে শোনাটাই যে বেশি জরুরি এবং শুনতে শুনতে একদিন যুদ্ধের আগাপাশতলা জানা হয়ে যাবে, কর্তৃপক্ষ প্রথম দিনই তাকে পই পই করে বলে দিয়েছেন।'[৩] গবেষক সেই নির্দেশ পূর্বাপর মনে রেখেছেন এবং কর্মক্ষেত্রে মেনে চলেছেন। সহজ-স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে আজ বীরাঙ্গনাদের অনেকেই অন্যের অসম্মান এবং গঞ্জনা নিয়ে বেঁচে আছেন। একই বছর প্রকাশিত *জোছনা ও জননীর গল্প*(২০০৪) শীর্ষক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) সংক্ষেপে এবং বিস্তৃতরূপে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় সকল প্রসঙ্গ স্পর্শ করে গেলেও পাকিস্তানিদের বর্বরতার নির্মম শিকার হওয়া ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীদের বিষয়টি আলোচনায় আনেননি। অন্যদিকে শাহীন আখতার মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করলেও পাক-হানাদার বাহিনীর দ্বারা ধর্ষিত ও নির্যাতিত নারীদের কথাই সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়েছেন। মরিয়মের কণ্ঠেই ঔপন্যাসিক সব হারানো লক্ষ নারীর নিদারুণ-নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। 'এই একাত্তরের নরকই কেবল নয়, আর তিন দশকের অনুবর্তনও এ-উপন্যাসের উপজীব্য। কিন্তু তা নিরালম্ব ইতিহাস বা ঘটনাক্রমিক বিবরণ নয়, অভিজ্ঞতা। আর সেই অভিজ্ঞতার অধিকারী নারী। এবং যে-নারীকে আমরা আগাগোড়া দেখি সে মরিয়ম ওরফে মেরি।'[৪] স্বামী-সন্তান-সংসার নিয়ে মরিয়ম কেবল শান্তির নীড় রচনার প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু চিরায়ত নারীর সেই স্বপ্ন-সার্থকতার মুখ দেখেনি। জসীমউদ্‌দীনের(১৯০৩-১৯৭৬) বিখ্যাত "কবর" কবিতার বৃদ্ধ দাদুর ন্যায় মরিয়ম যখন যাকে জড়িয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে সেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। জীবনের বাঁকে বাঁকে সে প্রতারণা-প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছে।

> পৃথিবীতে নারীই সবচেয়ে করুণ, ঘৃণ্য ও দীর্ঘতম শোষণের শিকার। সামাজিক আবর্তনে শোষক ও শোষিত পুরুষ প্রজন্মক্রমে স্থান বদলাতে পারে। আজ যে

> শোষক তার পরবর্তী প্রজন্ম হতে পারে শোষিত। [...] কিন্তু নারী শোষিত হয় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, তার শ্রেণী শোষিত হয়ে এসেছে আমাদের জানা ইতিহাসের সূচনা থেকে, হয়তো আরো পূর্বকাল হতে।[৫]

আর বীরাঙ্গনা নারীদের ক্ষেত্রে সেই শোষণের মাত্রা সহস্র গুণ বেশি। বিভীষিকাময় রজনীর অন্তে স্বস্তির ভোর আসার কথা, কিন্তু নতুন আলোর বদলে বীরাঙ্গনাদের জীবন অন্ধকারে ঢেকে যায়। 'ধর্ষিত নারীর নিপীড়ন যুদ্ধকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। [...] তাই *তালাশ*-এ যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী দু'ধরনের বাস্তবতা আছে।'[৬] পরিবার-সমাজ-সংসার কেউ তাদের গ্রহণ করতে চায় না। এক যুদ্ধ শেষ হলেও নতুন যুদ্ধে তাদের অবতীর্ণ হতে হয়। এই লড়াই অনেক বেশি নির্মম ও মর্মঘাতী। মরিয়মের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—'আমি কিন্তু আত্মহত্যার কথা ভাবতাম না। বাঁচার কথা ভাবতাম। আত্মহত্যার কথা ভেবেছি যুদ্ধের পর।'[৭] একদিকে এই নারীরা পাক-বাহিনীর পাশবিকতার শিকার হয়েছে অন্যদিকে নিজের জন্মদাতা পিতা-মাতা, রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা পর্যন্ত তাদেরকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেই দুঃখ রাখার, সান্ত্বনা পাবার কোনো আশ্রয় অবশিষ্ট থাকে না বীরাঙ্গনাদের জীবনে। আর্মি ক্যাম্প থেকে উদ্ধারকৃত নিপীড়িত নারীদের বাড়িতে চিঠি পাঠালেও তাদের স্ত্রী-কন্যা-বোনদের বাড়ি ফিরিয়ে নিতে তেমন কেউ আসে না। আর যদিওবা আসে তারা তাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিতে নারাজ। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায় তাদেরও সাদরে স্বাগত জানানো উচিত ছিল সকলের। কারণ, 'একাত্তরের নিগৃহীত নারীকে আমাদের দেখতে ও জানতে হবে দৃষ্টির সুগভীর আন্তরিকতায়। প্রথমত বুঝতে হবে, কেবল নারী বলেই যুদ্ধের সময় তারা নিগৃহীত হয়েছিল। নারীর এ-ও একধরনের যুদ্ধ, তার শরীরের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ [...]'[৮] বীরাঙ্গনা মরিয়ম পুনর্বাসন কেন্দ্রের চিকিৎসালয়ে থাকাবস্থায় দেখতে পায় তার ছোট ভাই মন্টুর জন্য পত্রিকায় নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে অন্যদিকে হারিয়ে যাওয়া মেয়ের খোঁজ জানিয়ে, 'পত্র পাঠানো সত্ত্বেও কফিলউদ্দিন আহমেদের দেখা নেই।'[৯] মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কফিলউদ্দিন ও মনোয়ারা দম্পতির চার সন্তানের মাঝে বড় মরিয়ম। বীরাঙ্গনা টুকির পরিস্থিতি আরো নাজুক, কষ্টেসৃষ্টে বাড়িতে ফিরে গেলেও দ্রুতই সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হয় সে। বাবা-মা সন্তানের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় কিন্তু বীরাঙ্গনা মেয়ের জন্য এই সত্য যেন প্রযোজ্য নয়। কারণ :

> নিজের বাবা-মাও চায়নি সমাজে কলঙ্কিনী হয়ে এ মেয়ে বেঁচে থাকুক। মানুষের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম টুকির বাবা বঁটিতে শান দেয়। তবে নিজের হাতে মেয়েকে খুন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরের বার মা বদনায় বিষ গুলে তার গালের ভিতর ঢেলে দিয়েছিল। মায়ের রাতদিন এক কথা, 'তোরে বাঁচায় রাইখ্যে কিনো লাভ নাই। তুই মর!'[১০]

পর পর দু'টি মৃত পুত্রের জন্মদানের দশ বছর পর মরিয়ম ওরফে মেরির জন্ম হয়েছিল। ফুলতলি গ্রামের স্কুলে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী থাকাকালে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় জসিমুলের সঙ্গে ইংরেজি সিনেমা দেখতে গিয়ে সিনেমার এক আবেগঘন মুহূর্তে পরস্পরের হাত ধরাবস্থায় পরিচিত কয়েকজনের সামনে পড়ে যায় ওরা। হাত ধরার কলঙ্ক ঢাকতে ঢাকায় পাঠানো হয় মরিয়মকে, বোনের পাহারায় নিয়োজিত হয় ছোটভাই মন্টু। ভাই-বোনের লেখাপড়া, প্রেম ও রাজনীতি বেশ ভালই চলছিল ঢাকায়। দেশের উত্তাল রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এম. হলের ছাত্রনেতা আবেদকে ঘিরে মরিয়মের স্বপ্ন ডানা মেলে। '১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।'[১১] আন্দোলনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সম্পর্কের প্রগাঢ়তাও যেন বেড়ে চলছিল আবেদ-মরিয়ম জুটির। এক পর্যায়ে মরিয়ম সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে আবেদ মেরির গর্ভের সন্তানের দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাপ্নিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশ্যে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে। '৭ মার্চ ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ঐ ঐতিহাসিক ঘোষণা বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা।'[১২] ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দফায় দফায় অনুষ্ঠিত বৈঠক ব্যর্থ হয়, বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়ার আপোশ প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে,

> [...] ২৫ শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে এবং সকল প্রকার মানবিক রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের জাগ্রত জনসাধারণের ওপর সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সর্বাত্মক আক্রমণ ও নির্বিচার গণহত্যা চালাবার জন্য পাকিস্তানের সুনিপুণ সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়। তারপর একদিকে বিশ্ব ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড অপর দিকে বাঙালীর অভূতপূর্ব বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম।[১৩]

অন্যদিকে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মরিয়মের মাঝে বাড়তে থাকা সুপ্ত ভ্রূণটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। মুমূর্ষু মরিয়মের জীবন বাঁচায় রমিজ শেখ যে কিনা স্ত্রী হত্যার অপরাধে দশ বছর জেল খেটে সদ্য মুক্তি পেয়েছে। ২৫ মার্চে পাকিস্তানিদের পরিচালিত নির্মম নিধনযজ্ঞের পর মানুষ দলবেঁধে শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। মরিয়ম যাদের সঙ্গে যাচ্ছিল তারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে স্বর্গধাম নামে সদ্য পরিত্যক্ত একটি বাড়ির সন্ধান পায়। তবে অবিবাহিত মরিয়মকে তারা নতুন ঠিকানায় নিজেদের সঙ্গে রাখতে রাজি হয় না। ফলে ক্লান্ত শরীর এবং ভগ্ন-হৃদয়ে মরিয়ম বাধ্য হয় অপরাধী রমিজ শেখের হাত ধরে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে বের হতে। নতুন গাঁয়ের চৌধুরী বাড়িতে অবশেষে সহায় পেলেও মরিয়মের এই মাথাগোঁজার ঠাঁইয়ের পাঠ দ্রুতই চুকে যায়। পাক-বাহিনী মরিয়মসহ বেশ কয়েকজন নারীকে ধরে নিয়ে যায়। মিলিটারি ক্যাম্পে বন্দি করে তাদের ওপর চালানো হয় বর্বরোচিত নির্যাতন। মল্লিকপুর স্কুলকে অস্থায়ী ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে পাক-বাহিনী গ্রাম থেকে ধরে আনা মেয়েদের বিভিন্ন কক্ষে বন্ধ করে তাদের ওপর চালায় অকথ্য অত্যাচার। প্রতিদিন ওদের অন্নজলের সংস্থানও প্রায়ই করা হয় না। শরীর থেকে পোশাকগুলোও খুলে রাখে এবং ঘরে কোনো ফ্যান বা ফ্যানের হুক পর্যন্ত ছিল না কারণ অনেক মেয়েই এই অসহনীয় জীবন থেকে আত্মহত্যার মাধ্যমে মুক্ত হতে চেয়েছিল। মরিয়মের দেয়া সাক্ষাৎকারে জানা যায়—

- তখন আপনার পরনে সালোয়ার-কামিজ আর ওই ওড়নাটা ছিল?
- না, ছিল না। টাইনে-টুইনে ছিঁড়ে ফেলাই দিছিল মিলিটারিরা। জমাদার বর্জ্য নেওয়ার সময় দলা পাকিয়ে সেই যে নিল, এগুলো আর ফেরত পেলাম না। তাই রমিজ শেখকে দৌড়ে আসতে দেখে প্রথম সরে গেছিলাম জানলার পাশ থেকে।[১৪]

এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে তাদের প্রতিনিয়ত হাত বদল করা হয়। খোলা ট্রাকে পণ্যের মতো তাদের বহন করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থান্তরে নির্যাতনের প্রকারে বদল না হলেও হয়তো মাত্রাগত পরিবর্তন হয়। মরিয়ম আর্মি ক্যাম্পে বহুবার বহুজন কর্তৃক ধর্ষিত হলেও একই নামের দুই মেজরের কথা তার মনে ছিল বহুদিন। মেজর ইশতিয়াক নামের দুই অফিসারের মধ্যে একজনকে ভালোবাসায় অন্যজনকে ঘৃণায় স্মরণ করে মরিয়ম। স্বাধীন দেশে মরিয়মের ন্যায়

অসংখ্য বীরাঙ্গনা মুক্তি পায়। অনেকেই ভয়াবহ অসুস্থ ছিল, সন্তানসম্ভবা ছিল বহু নারী। পরিস্থিতি অনুপাতে তাদের চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়।

> [...] দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ডের সভাপতি বিচারপতি কে. এম সোবহান, মিশনারীজ অব চ্যারিটির সিস্টার মার্গারেট মেরি এবং আইপিপিএফ-এর ড. জিওফ্রে ডেভিস, ওডার্ট ফন শুল্‌জ প্রমুখের [...] সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, স্থানীয় বাঙালি চিকিৎসকদের সহায়তায় ব্রিটিশ, মার্কিন ও অস্ট্রেলীয় চিকিৎসকদের একটি দল ঢাকায় বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ২৩ হাজার নির্যাতিতা মহিলার গর্ভপাত ঘটান।[১৫]

মরিয়ম, অনুরাধা, শোভারাণী তিনজনই গর্ভবতী থাকলেও শোভার গর্ভেরই কেবল মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। 'কেন্দ্রের 'দ্রুত চিকিৎসা' কর্মসূচির আন্ডারে মরিয়ম ভর্তি হয়ে গেল। সেখানে চিকিৎসা, বিশ্রাম তারপর গর্ভপাতের লম্বা সিরিয়াল।'[১৬] অনেক নারী নিজের কলঙ্ক ঢাকতে আত্মহত্যা করেছে, অনেকে পাকিস্তান পাড়ি জমিয়েছে আবার অনেকে পরিচয় লুকিয়ে বিয়ে করে সংসার করছে। পরিচয় জেনেও অনেক পুরুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বীরাঙ্গনা নারীদের বিয়ে করেন বা বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেলাই মেশিনসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদানপূর্বক বিয়ে দিলেও কিছুদিনের মধ্যেই স্বামী-শ্বশুরবাড়ির লোকজন উপঢৌকন রেখে স্ত্রী বিদায় করেন সংসার থেকে। '[...] একবার দশ জনকে দশ হাজার টাকা দিয়ে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ওয়াইফ সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র, সেলাই মেশিন-টেশিন দিলেন। যারা টাকা নিয়ে বিয়ে করল, তারা খালি টাকা নিল, বউ নেয়নি। যারা বউ নিল, তারা তাদের পদে পদে অপমান করার জন্য নিল।'[১৭] মরিয়মের মামা গোলাম মোস্তফাও নিজের হাবা ছেলে সাজুর সঙ্গে বীরাঙ্গনা ভাগ্নির বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পুত্র কর্তৃক বীরাঙ্গনা বিয়েকে ব্যানার হিসেবে ব্যবহার করে তিনি নিজের ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলে আগ্রহী ছিলেন। এই বিয়ের মধ্যদিয়ে নিজের কৃতকর্মগুলোকে আড়াল করতে চেয়েছেন গোলাম মোস্তফা। তিনি জানেন বীরাঙ্গনার বিয়েতে—

> প্রধান অতিথি সস্ত্রীক বঙ্গবন্ধু। তিনি ব্যস্ততার কারণে আসতে না পারলে, বেগম মুজিব ঠিকই আসবেন। বীরাঙ্গনা-বিবাহের তিনি সবচেয়ে বড় উদ্যোক্তা। এভাবে মরা হাতিও যে লাখ টাকা, গোলাম মোস্তফা দেশবাসীকে তা জানিয়ে ছাড়বেন। কাগজে ছবি ছাপা হবে—আরেকটি বীরাঙ্গনা-বিবাহ। কন্যা সম্প্রদান করছেন

> স্বয়ং বেগম মুজিব। [...] কারণ গোলাম মোস্তফার পাকিস্তানের দালাল থেকে রাতারাতি দেশপ্রেমিক হওয়া দরকার। এতে করে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া বাড়ি দুটির পুনর্দখলও সম্ভব।[১৮]

মামার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ বীরাঙ্গনা ভাগ্নির বিয়ের উদ্দেশ্য মরিয়ম সফল হতে দেয় না। তবে টিকে থাকার তাগিদে আশ্রয়ের অন্বেষণে সে স্খলিত চরিত্রের জানা সত্ত্বেও মমতাজের বিয়ের প্রস্তাবে বিনা বাক্যব্যয়ে রাজি হয়ে যায়। বুক ভরা আশা আর ভালোবাসা নিয়ে সংসার করতে এসে তাকে পড়তে হয় বহু বিড়ম্বনায়। কিছুতেই সে স্বামীর মন পায় না, কারণে-অকারণে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। যে-কোনো প্রসঙ্গে মমতাজ নিজের স্ত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণে বসে পড়ে। মরিয়মকে অপমানের মাধ্যমেই মমতাজ নিজের ক্ষমতা আর দাপট প্রকাশ করে। বীরাঙ্গনা বিয়ে করে বীরত্ব দেখানো এবং মহানুভব সাজার ইচ্ছা ব্যবসায়ী মমতাজের দ্রুতই বিলীন হয়ে যায়। এখন তাই মরিয়মের সকল কিছুতেই তার আপত্তি। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আজ মরিয়মকে অসহ্য ঠেকে তার লম্পট স্বামীর।

বীরাঙ্গনাদের সংসার ভাঙার গল্পের সঙ্গে আছে বিয়ে এবং সংসারের স্বপ্ন অপূর্ণ থাকার গল্প। টুকি আক্ষেপ করে বলে, 'জীবনে আমি স্বামী পালাম না, বাচ্ছা পালাম না, সংসার পালাম না।'[১৯] নারীর সেই আশৈশব লালিত স্বপ্ন টুকির জীবনে অপূর্ণ থাকার একটাই কারণ সে বীরাঙ্গনা। শহরে গার্মেন্টেসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে প্রাপ্ত অর্থ জমিয়ে গ্রামে কবরের জন্য একটু জায়গা কিনতে চেয়েছিল টুকি বেগম। কিন্তু গ্রামের মানুষ রাজি হয়নি দ্বিগুণ দামেও তার কাছে জমি বিক্রি করতে। জীবদ্দশায় গ্রামে বসবাসের অধিকারের ন্যায় মৃত্যুর পর সমাহিত হবার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয় টুকি। 'টুকির ভাগ্যটাই খারাপ। [...] বাকি জীবন গৃহস্থ হয়ে কাটাতে চেয়েও সে ব্যর্থ হলো। মরলে যে কবরে শোবে, নগদটাকা দিয়েও সে তা কিনতে পারল না।'[২০] প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে স্বেচ্ছায় এবং প্রতারণায় প্রবাসী হওয়া বীরাঙ্গনার সংখ্যা খুব বেশি নয়। বীরাঙ্গনাদের বেশিরভাগই দেশে থেকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করেছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নিপীড়িত এই নারীদের বীরাঙ্গনা বলে স্বীকৃতি দিলেন। পুনর্বাসনকেন্দ্রে এই নারীদের বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলে, বেঁচে থাকার নতুন পথ দেখিয়েছেন। 'কিন্তু সেলাই-ফোঁড়াই, টাইপিং বা রান্না শেখায় তার মন নেই। সে মুক্তিকে বলে, 'এসব কাজে

মনের স্থিরতা লাগে, গিন্নিবান্নির মতো ধৈর্যের দরকার হয়,' যার একটিও তখন তার ছিল না। কারণ অতীতটা বিভীষিকা, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত [...]'[২১] পুনর্বাসন কেন্দ্রে দলে দলে মানুষ ভিড় জমায় তাদের দেখতে। বীরাঙ্গনাদের দেখার অনেক আগ্রহ সাধারণের কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা আছে, শ্রদ্ধা নেই। 'বীরাঙ্গনা মানে অসহায়-নির্যাতিত নারী, সহানুভূতির আড়ালে সর্বান্তঃকরণে সকলে তাদের ঘৃণাই করে।'[২২] চাকরি, সংসার কোথাও সফল না হলে মরিয়ম মায়ের গহনা বিক্রির টাকা এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রাপ্ত সেলাই শিক্ষাকে মূলধন করে ব্যবসা শুরু করে। পুঁজি, পরিশ্রম ও আন্তরিকতায় ঘাটতি না থাকলেও ব্যবসায় সে খুব একটা উন্নতি করতে পারে না। উদ্যোগ-আয়োজনে স্বল্পতা না থাকলেও সমৃদ্ধিতে স্বল্পতা ছিল। ছোট ছোট কাজের অর্ডারের অজুহাতে বিভিন্ন মেয়েরা বীরাঙ্গনা দেখতে আসতো। একসময় মরিয়ম অস্থির হয়ে ওঠে একঘেঁয়ে পরিশ্রমে। কারণ, 'মেরির সোনার হাতের দিকে তাদের নজর নেই। নতুন ডিজাইনের সুন্দর সুন্দর জামাকাপড়গুলো একপাশে সরিয়ে, মিলিটারির নষ্ট করা শরীরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর নাশতার সঙ্গে ঘন দুধের চা খেয়ে উঠে পড়ে।'[২৩]

ব্যবসায়ে বিফল হয়ে মরিয়ম যখন হতাশায় নিমজ্জিত তখন পুরনো প্রেমিক আবেদ জাহাঙ্গীর তার দুয়ারে আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে আসে। মনে তীব্র ঘৃণা থাকলেও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সে আবেদকে বিপদে সাহায্য করে। বিপদ কেটে গেলে সে আবার চলে যায় নিজের সংসারে, নিঃসঙ্গ একাকী পড়ে থাকে মরিয়ম। আবেদ থাকাকালে প্রয়োজনীয় উপকরণের সংস্থান এবং সঙ্গ কিছুতেই সংকট ছিল না কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে অর্থাভাবে অচলপ্রায় হয়ে যায় মরিয়মের একার সংসার। বেঁচে থাকার তাগিদে মরিয়মকে আবার পথে নামতে হয় চাকরির খোঁজে। আবেদ জাহাঙ্গীরের সুপারিশেই একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে এবার তার চাকরি হয়। কাজের শুরুতে বেতন কম থাকলেও বছরান্তে তা বাড়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, বীরাঙ্গনা পরিচয়টি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার কর্মজীবনে। অহেতুক মালিক কাম ম্যানেজার তাকে দেখলেই রেগে যান। বেতন বাড়ানো বাদ দিয়ে তার ছোটখাট ভুলে ভীষণ ভর্ৎসনা করতে শুরু করেন। বস এবং সহকর্মীদের বিরূপ আচরণে বাধ্য হয়ে নতুন চাকরির সন্ধানে তাকে অফিস থেকে অফিসে ছুটে যেতে হয়। তবে বেতন ও ব্যবহার কোথাও খুব একটা ভাল পায় না—

> সে শুধু মতিঝিল, দিলখুশা, ফকিরাপুল এলাকার ট্রাভেল এজেন্সি থেকে আরেক ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি বদল করে। সর্বত্র সেই কাঁচের ঘর, টাইপরাইটার আর একই ধরনের টেলিফোন সেট। বসদের মধ্যেও তেমন তারতম্য নেই। একজন ছাড়া সবাই তার কাজের খুঁত ধরে। [...] লোকটার একটাই চাওয়া ছিল, ছুটির পর কিছুটা বাড়তি সময় সে যেন অফিসে থাকে। মতিঝিল অফিসপাড়া যখন নির্জন, বেশিরভাগ বিল্ডিং ফাঁকা হয়ে গেছে, তখন সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর দু'পা ফাঁক করে লোকটা বসত তার বেলে মাছের মতো লুতলুতে নির্জীব পুরুষাঙ্গটি বের করে।[২৪]

অফিসে কাজের সূত্রেই মরিয়মের পরিচয় হয় দেবাশিস দত্তের সাথে। সমকামী দেবাশিসের জীবনে শূন্যতা বিরাজ করছিল সঙ্গী আশিক খন্দকারের বিদেশ গমন এবং বিয়ের খবরে। সে খুব ভেঙে পড়ে, চারদিকে রিক্ততা বিরাজ করতে থাকলে সে আসে মরিয়মের কাছে যন্ত্রণাতুর হৃদয়ের বেদনার কথা বলে হালকা হতে। ট্রাভেল এজেন্সির সবাই দেবাশিসের রোজকার উপস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে তাকে উপেক্ষা করে চলার চেষ্টা করলেও মরিয়ম তার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে সাধ্যমত সহানুভূতির সাথে। ছোটভাইয়ের মতো করে তাকে আশ্রয় দিলেও সমাজ বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ না করে মরিয়মের সঙ্গে তার বিয়ে দেয় দেবাশিসের ধর্মান্তরপূর্বক। নাম-পদবি পরিবর্তন হলেও তার স্বভাবের বদল ঘটে না। পুরুষাসক্ত দেবাশিস, অনুপম শিকদার নামে জগন্নাথ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রকে জোগাড় করে নিয়ে আসে। মরিয়মের বাড়িতে ওরা যেন সংসার পেতে বসে। মরিয়ম মরিয়া হয়ে স্বামীসঙ্গ প্রত্যাশা করলেও কোনো সাড়া পায় না দেবাশিসের কাছ থেকে। দুবছর এখানে থাকার পর নতুন সঙ্গীর আপত্তির মুখে দেবাশিস মরিয়মকে ছেড়ে যায় ছোট্ট একটি চিঠি লিখে। 'বারংবার অন্ধকার গর্তে পড়া তার নিয়তি।'[২৫] সুখ তার জীবনে কখনই ধরা দিল না। নিঃসঙ্গ জীবন আজ বড় অসহ্য বোধ হয় মরিয়মের। তার জীবনে বহু পুরুষ আসলেও সে কারো স্ত্রী নয়; গর্ভে একাধিকবার সন্তান এলেও সে কারো মা নয়। এমনকি কন্যা বা সহোদরা রূপেও কেউ তাকে স্বীকার করে না। অথচ—

> মরিয়ম স্বামী চেয়েছিল, সংসার চেয়েছিল, আর কিছু নয়। এর কিছুই সে পেল না, পেল বীরাঙ্গনার বিড়ম্বনা ও অপমান যে-বীরাঙ্গনা পরিচয় সে সাধ্যমতো গোপন করেছে। [...] যুদ্ধের গৌরবগাথা নয়, যুদ্ধের অমানবিকতা, যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি,

> যুদ্ধের অসহায় শিকার নারী, এরই সাহিত্যিক দলিল হলো এই উপন্যাস, আমার ধারণায় এক কালজয়ী উপন্যাস।[২৬]

জীবনে শূন্যতাকে মেনে নিয়ে চাকরি আঁকড়ে বেঁচে থাকতে শুরু করে মরিয়ম। শিক্ষিত মরিয়ম বিলম্বে এবং কম বেতনে হলেও চাকরি করে রুটি-রুজির সন্ধান করতে পেরেছে। কিন্তু যাদের সেসকল যোগত্য বা দক্ষতা নেই ভাগ্যাহত সেসব বীরাঙ্গনা জীবন বাঁচাতে স্বেচ্ছায় অথবা কারো তঞ্চকতায় বারাঙ্গনার জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। একসময় সম্মানজনক মনে হওয়া বীরাঙ্গনা উপাধি আজ, 'মনের সমস্ত দৃঢ়তা ও ঘৃণাকে সম্বল করে আমি আমার কলঙ্ক আচ্ছাদিত গৌরবময় অতীতকে ভুলে গেছি। কারণ আমার যা ছিল গর্বের, আমার পরিবার ও সমাজের তাই ছিল সর্বাধিক লজ্জা, ভয় ও ঘৃণার।'[২৭] তবে স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পরে তারামন বিবির প্রাপ্ত স্বীকৃতি ও সম্মান টুকি বেগমের মনে আশার সঞ্চার করে। বীরাঙ্গনা পরিচয়টির জন্য বারংবার বিপত্তিকর পরিস্থিতির শিকার হওয়া এই নারী আজ স্বপ্ন দেখে সম্মানপ্রাপ্তির। স্বাধীনতার একুশ বছর পর, '১৯৯২-এর ২৬ মার্চ, সকাল এগারোটায় [...] যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় ঘোষণা করা হবে।'[২৮] বিচারের রায় শুনতে এসেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বীরাঙ্গনা টুকির সঙ্গে দেখা হয় মরিয়মের। একই পরিচয়ের ঘরে-বাইরে একা দুই নারী পরস্পরকে পেয়ে যেন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। গার্মেন্টসের চাকরি ছেড়ে এখন টুকি হাঁস-মুরগি পালন করে আর নতুন দিনের স্বপ্ন বোনে। একটা গণ আদালত তাকে আশান্বিত করে আবার ব্যথিত হয় এই ভেবে যে, তিনজন বীরাঙ্গনা এখানে সাক্ষ্য দিয়েছে। অথচ শহরে থেকেও সে এসবের কিছুই জানতে পারেনি। গবেষক বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য তাদের ঠিকানার খোঁজে বিভিন্ন সমাজকর্মীর কাছে গিয়েও সঠিক তথ্য পায় না। তারপর—

> সমাজকর্মী বীরাঙ্গনাদের খোঁজার জন্য যে কয়েকটা জায়গার নাম মুক্তিকে বলেন, তার সবকয়টি ব্রথেল, বেশ্যালয়। কিন্তু মুক্তি তো খুঁজছে বীরাঙ্গনাদের! 'তাতে কী! বীরাঙ্গনা থেকে যারা বারাঙ্গনা হয়ে গেল,' সমাজকর্মী বললেন, 'তারাই আজ তোমার কাছে মুখ খুলবে। এ দিয়ে একটা মেগা স্টোরি লিখতে পারবে তুমি।' 'কিন্তু একাত্তরের নির্যাতিতরা কি সত্যি সত্যি প্রস্টিটিউশনে চলে গেছে?' 'যাবে না তো কী করবে? নো বডি কেয়ারস ফর বীরাঙ্গনাস। সমাজ তো দূরের কথা, কেউ ফিরেও তাকায়নি।'[২৯]

বঙ্গবন্ধু সর্বদাই বীরাঙ্গনা নারীদের বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তাঁদের মনে সাহস জুগিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন জীবনের প্রতি আগ্রহ। 'বাংলাদেশ সরকার, বঙ্গবন্ধু তাদের বলেছিলেন, 'বীরাঙ্গনা' [...] এ উপাধি তাদের কান্না থামাতে পারেনি। অথচ, মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যায় নিহতদের মতো তারাও বলি। তারা সামাজিকভাবে শহীদ।'[৩০] জাতির জনক বীরাঙ্গনাদের বিয়ের দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং স্থাপন করেছিলেন পুনর্বাসন কেন্দ্র। কিন্তু তাঁর সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের পর বীরাঙ্গনারা যেন পিতৃহারা হয়ে পড়েন কারণ, 'বঙ্গবন্ধু চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বাসনকেন্দ্রগুলোও উঠে গেল,' প্রবীণ এক সমাজকর্মী দুঃখ করে বলছিলেন মুক্তিকে। 'শুনেছি জিনিসপত্রও নাকি ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। পতিতালয় উচ্ছেদ করার মতো করে মেয়েদের তাড়িয়ে দেয়।'[৩১] কুকুর-বেড়ালের মত করে তাদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে তাড়িয়ে দেয়। শ্যাওলার ন্যায় বীরাঙ্গনাদের জীবন এগিয়ে চলে নিরুদ্দেশ পানে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন *চর্যাপদ*-এর ১০ নং চর্যায় উল্লিখিত নগরের বাইরে বসবাসকারী সেই অস্পৃশ্য ডোম্বীর মতো অনেকেই বীরাঙ্গনাদের ছুঁয়ে গেলেও ঘরে নিতে চায় না কেউ। পরিবার-সমাজ সবাই তাদের প্রান্তিক করে রাখে। আখেরে অনুরাধার কথাটিই যেন সত্য হয়ে ওঠে, 'যুদ্ধ শেষে পুরুষেরা হয় বীর, মেয়েরা হয় কলঙ্কিনী।'[৩২] এই কলঙ্কের বোঝা তাদের বয়ে বেড়াতে হয় আজীবন। বাইরের রক্তক্ষরণের চেয়ে অন্তর্গত এই দহন অনেক বেশি যন্ত্রণার। শেষপর্যন্ত সন্ধান করেও সহস্র সমস্যার সমাধান খুঁজে পায় না মরিয়ম। ব্যক্তি, স্থান এবং প্রতিষ্ঠান বদলে বীরাঙ্গনা জীবনে দুর্বিপাকের প্রকার ও পরিমাণে পার্থক্য দেখা গেলেও বিপত্তিকালের অবসান হয় না। কারণ 'মরিয়ম যেন পুরাণের সেই ফিনিক্স পাখি, যার ধ্বংস নেই। পোড়া ছাই থেকে নতুন শরীর নিয়ে সে উড়ে এসেছে বিগত জীবনে আগের ঠিকানায়।'[৩৩] মৃত্যুর অভাবে বেঁচে থাকা বীরাঙ্গনারা তড়পাতে তড়পাতে কোনোমতে জীবনকে ধারণ করে টিকে থাকে। তাই জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পঞ্চাশ বছর বয়সী মরিয়ম, টুকি বেগমকে সঙ্গে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার গন্তব্যটি যেন সবারই অজানা।

শাহীন আখতার বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতিনিধিত্বকারী লেখক। ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এবং সাহিত্যের রস অক্ষুণ্ন রেখে তিনি আলোচ্য উপন্যাসটি রচনা করেছেন। তাঁর কর্মসূত্রে প্রাপ্ত এবং জ্ঞাত অভিজ্ঞতার আলোকে সমৃদ্ধ *তালাশ* উপন্যাসটি। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী মুক্তি চরিত্রের মাঝে আমরা ঔপন্যাসিককেই যেন

খুঁজে পাই। মুক্তিযুদ্ধের ওরাল হিস্ট্রি প্রোজেক্টে কাজের সুবাদে তিনি বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে তাদের যাপিত জীবনের বহু অজানা তথ্য এবং সত্য জানতে পেরেছেন। প্রাপ্ত তথ্য, ইতিহাস ও জীবনবোধের আলোকে মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ধর্ষিত-নির্যাতিত নারীদের জীবনালেখ্যই প্রাধান্য পেয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। অসংখ্য চরিত্র এবং কাহিনির সমাবেশে ঔপন্যাসিক দীর্ঘ আটাশ বছরে স্বাধীন বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। রূপক এবং প্রতীকের সার্থক ব্যবহারে উপন্যাসটি পাঠকের মন ও মননে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। পাক-বাহিনীর নির্মম নিষ্ঠুরতার শিকার এই নারীদের বীরাঙ্গনা বলে স্বীকৃতি দেয়া হলেও পরিবার-সমাজ-সংসার কেউ তাদের গ্রহণ করে না। সর্বত্রই তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে অসম্মান আর অবহেলা। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই নারীদের যাপিত জীবনের রূঢ় বাস্তবতার স্বরূপ তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। ঠিকানাবিহীন বীর এই নারীরা টিকে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চলে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেও তাদের অবস্থার উন্নতি হয় না। সিসিফাসের ন্যায় তাদের ভাগ্য থাকে অপরিবর্তিত। বিরূপ পরিবেশে বিধ্বস্ত জীবন তাদের অবিরাম বয়ে চলতে হয়। অনিশ্চিত জীবনের বন্ধুর পথে বীরাঙ্গনাদের বিরামহীন যাত্রার বিরূপ বাস্তবতার চিত্রই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন নিপুণভাবে।

তথ্যনির্দেশ

১. https://www.thedailystar.net/bangla/শীর্ষ-খবর/শাহীন-আখতারের-সঙ্গে-তালাশ-পরিভ্রমণ-188901
২ শাহীন আখতার, *তালাশ*(ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪), পৃ. ৩০
৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
৪. https://www.kaliokalam.com/13495/
৫ জোহরা পারুল, *নারীর ইতিহাস*(ঢাকা : সংবেদ, ২০০৭), পৃ. ১১
৬. https://www.banglatribune.com/literature/news/118089/আমি-বলতে-চাই-না-অতীত-ছিল-খারাপ-বা-বর্তমান-ভালো
৭. শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
৮ মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*(ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ১২

৯. শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
১০. পূর্বোক্ত. পৃ. ২৪৭
১১. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা, *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন*(ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০০৯). পৃ. ১১
১২. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*(ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩). পৃ. ১১৩
১৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*(ঢাকা : ১৯৯৫, আগামী প্রকাশনী), পৃ. ২৫৩-২৫৪
১৪. শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
১৫ মুস্তফা চৌধুরী, "যুদ্ধশিশু", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), খণ্ড-১১, পৃ. ৪৫১
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭
২৬. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, "মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক তিনটি উপন্যাস", আবুল হাসনাত সম্পা., *কালি ও কলম*(ঢাকা : দ্বাদশ সংখ্যা, ২০০৫), পৃ. ১৪
২৭ নীলিমা ইব্রাহীম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*(ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১১-১২
২৮. শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩
৩০. মুনতাসীর মামুন, *বীরাঙ্গনা* ৭১(ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৩), পৃ. ভূমিকাংশ
৩১. শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩
৩২ শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯
৩৩. শাহীন আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

সাহিত্যিকী

দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ | জুন ২০২২ | বাংলা বিভাগ

পৃষ্ঠা : ৪৭- ৬৮ | শব্দসংখ্যা ৪৩৭৬ | ISSN: 1994-4888 | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সুকুমার রায়ের সাহিত্য: তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ

জাকিয়া সুলতানা মুক্তা*

Abstract

This paper ascertains how Sukumar Roy's (1887-1923) literary oeuvre transcends conventional critical analyses and merits to be underpinned through contemporary theo-critical perspectives. Sukumar Roy could adroitly pinpoint his social milieu with a subtlety and sensitivity that espoused child psyche as a receptacle of the visionary and emancipatory life and philosophy. His literature, therefore, turns out to be predominantly children-centric in its thematic concerns that deal with profoundly serious subjective matters and linguistically sophisticated presentation in a very tongue-in-check manner and thus, ushers a pro-children attitude and expression of literature. However, in doing so, his literary

* সহকারী অধ্যাপক | বাংলা বিভাগ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | গোপালগঞ্জ | ই-মেইল: zakiamukta@gmail.com

identity did not sacrifice its affiliations with his contemporary socio-politico-cultural-religious milieu. With this given, Sukumar's literature, then, strongly rejects the art-for-art's sake convention of literature and embraces an open-hearted ecology of criticisms and theoretical groundings. Thus, his literature corresponds to Post-modern leitmotifs of artistic creations and tears apart all grand designs of art and literature through an exaltation of the individual idiosyncrasies over the dominant and trendy forms and narratives of creativity like literature.

সার-সংক্ষেপ

সুকুমার রায়(১৮৮৭-১৯২৩)-এর সাহিত্যকে সাহিত্যের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে দেখতে গেলে দেখা যায়, সুকুমার-সাহিত্য এতদিনকার ননসেন্স-সাহিত্যের মূল্যায়নের বাইরেও ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হওয়ার দাবি রাখে। তিনি এমনই একজন সাহিত্যিক, যাঁর সমাজ ও জীবনকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল দৃষ্টিতে দেখার সক্ষমতা ছিলো প্রবল। গতানুগতিক সাহিত্য রচনার চেয়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন শিশুর মননকে, যদিও তাঁর রচনায় অনুধাবন করা যায় জাগতিক জীবনের প্রতি অসাধারণ সব দার্শনিক পর্যবেক্ষণ। তাই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, তিনি শিশুদের মূল্যায়ন করতেন ভবিষ্যতের দার্শনিক ও সময়ের প্রকৌশলী হিসেবে। একারণেই দৃশ্যমান প্রকাশে তাঁর রচনার আঙ্গিকে মেলে শিশু-উপযোগী হাস্য-রসাত্মক সরল নির্মাণ ও স্বপ্নচারী অবাধভঙ্গির। কিন্তু ভাষিক প্রকাশের গভীরতল-অনুধাবনে ও পাঠকের বিনির্মাণে ধরা পড়ে তাঁর সাহিত্যিক-মানস গড়নে তৎকালীন সমাজ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক ও ধর্মীয় যাবতীয় পরিপার্শ্বের প্রভাব। সুকুমার-সাহিত্য তখন সাহিত্যিক বিভিন্ন তত্ত্ব-তালাশের বিশ্লেষণে হয়ে ওঠে খানিকটা কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্য থেকে একেবারে উত্তর-আধুনিকতাবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিক আগ্রহের স্থল। কারণটাও পরিষ্কার, সুকুমার-সাহিত্যের ননসেন্স আবোল-তাবোল রচনার মধ্য দিয়ে ভেঙেছেন যাবতীয় বৃহদাখ্যানের বৃত্ত, ঝাণ্ডা উড়িয়েছেন অত্যন্ত সংবেদনশীল ক্ষুদ্র আখ্যানের বিজয়কেতন।

সংকেত-শব্দ

ননসেন্স রাইম, কলাকৈবল্যবাদী, বকচ্ছপ, অপ্রাতিষ্ঠানিক, পরাবাস্তববাদ, উত্তর-আধুনিকতাবাদ

মূল-প্রবন্ধ

সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্য-আকাশের এক ক্ষণজন্মা জ্যোতিষ্ক। সাহিত্যজগতে তিনি এমন একজন তারকা, যাঁর কর্ম ও দর্শনকে ব্যাখ্যা করা আজও দুরূহ। তিনি যে সময় ও বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে তাঁর সাহিত্য রচনা করেছিলেন, সেই সময়ে এই ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নানামুখী বাতাবরণও ছিলো ভীষণরকমের দ্বান্দ্বিকতায় পূর্ণ। ব্রিটিশ শাসনাধীন ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার পূর্বাপরের সংক্ষুব্ধ সময়ে ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যিক মনস্তত্ত্ব তখন পাড়ি দিচ্ছিলো এক আত্মসচেতনা-বিনির্মাণের উৎসারণের মধ্য দিয়ে। তাইতো সুকুমার-সাহিত্যকে পূর্বাপর সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে আসে, তাঁর জীবনবাস্তবতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় জাগ্রত নানান চিন্তনসূত্র। যার সম্পর্কে স্বয়ং সুকুমারের বক্তব্যটিই এখানে প্রণিধানযোগ্য, 'জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, শিল্পীর মন তাহার ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলিকে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট 'আদর্শের' অনুযায়ী করিয়া লয়'।[১] এক্ষেত্রে লেখক কোন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত কিংবা তাঁর সাহিত্যকর্মকে কোনধরনের সমালোচনাতত্ত্বের অধীন করা যেতে পারে তার তথ্যানুসন্ধানের লক্ষ্যেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত। উল্লেখ্য, মাত্র ছত্রিশ বছরের জীবনে তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে শিশু-কিশোরপাঠ্য ননসেন্স রাইম ঘরানার ছড়া, গল্প, নাটক ও অন্যান্য গদ্যরচনা ও কিছু বয়স্কপাঠ্য রচনা এবং পত্রাবলি।

বিনির্মাণের প্রাসঙ্গিকতায় সুকুমার-সাহিত্য

সুকুমার রায়ের ননসেন্স ঘরানার রচনাসমূহকে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে দেখলে, তা সাহিত্যের কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্য হিসেবেই মনে হতে পারে এবং তা স্বতঃস্বাভাবিকও। কারণ, এতে সুকুমার শিশুদের উপযোগী করে যে কল্পনার রাজ্য

গড়েছেন, তাতে একান্তই সৃষ্টিশীলতার উৎসাহেই শিল্পের উৎসারণ ঘটেছে। সেটা বাঁধনবিহীন, কোনো নিয়মের তোয়াক্কা না করা শিল্পরসের ভাণ্ডার। একান্তই 'ননসেন্স রাইম' ঘরানার সাহিত্যসম্ভার। যা কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্য রচনার মৌলিক স্তম্ভ, শিল্পের জন্য শিল্প(Art's for art sake)। এজন্যই সুকুমার রায় তাঁর *আবোল-তাবোল*(১৯২৩) ছড়াগ্রন্থের কৈফিয়ত তথা মুখবন্ধে লেখেন:

> যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই। সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।[২]

অর্থাৎ তিনি নিজেই তাঁর রচনাকে কোনো নিয়ম বা তত্ত্বের অধীন করায় আগ্রহী ছিলেন না। কেবল মনের খেয়ালে খেয়াল-রসের এই গ্রন্থের পরতে পরতে শিল্পের জন্যই তিনি শিল্পের শিল্পিত বুভুক্ষাকে মেটাতে চেয়েছেন। কোনো পার্থিব জীবনের জাগ্রত চাহিদার অন্বেষণ সেখানে ছিলো না। কিন্তু আমরা সুকুমারেরই আরেক ছড়াগ্রন্থ *খাই খাই*(১৯৫০)-এর 'বেশ করেছো!' ছড়াটিতে খুঁজে পাই ভিন্ন এক ব্যঞ্জনার আভাস:

> এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা,
> কেউ বা বুঝে পুরোপুরি, কেউ বা বুঝে আধা।
> কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে,
> গাছের 'পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখ না গোঁফে।
> একটি একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান,
> মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্বকথাই সাবান।
> বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ঐখেনে দাও দাঁড়ি,
> হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি![৩]

এমন উচ্চারণ সুকুমার-শিল্পকে কলাকৈবল্যবাদী তত্ত্বাধীন করানোর বিরুদ্ধ ঘোষণা কিনা, এই দ্বন্দ্বই পাঠককে নতুন চিন্তায় ফেলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই সুকুমার রচনাকে যদি পুনঃপাঠ বা বিনির্মাণের ছুরি-কাঁচির নিচে ফেলে নতুনভাবে দেখা যায়, তবে সুকুমারীয় ভাষায় রচিত ভাষার উপরিতলে খেয়াল রসের চুপচুপে আনন্দে যে চিত্রকল্প এতদিন পাঠককে আন্দোলিত করেছে, সেই একই ভাষার গভীরতলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাকেই আবার নতুনভাবে ভাবাতে বাধ্য করবে। এ প্রসঙ্গে খোন্দকার আশরাফ হোসেনের বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক:

> দেরিদা ভাষাকে তার আধিবিদ্যক চামড়া থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ডিকন্সট্রাক্ট অর্থাৎ জোড় খুলে খুলে দেখালেন এর ভেতরকার দ্বন্দ্বসমূহকে। এই হলো ভাষার ভেতরে নেমে ভাষাকে ভাঙা। এর ফলে যা স্পষ্ট হয় তা হলো শব্দের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই; ভাষার একমাত্র অর্থ অসম্ভব।[৪]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে সুকুমার-রচনার ক্ষেত্রে বিনির্মাণের দিকটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাই দেখা যায়, বিনির্মাণের বিশ্লেষণী ব্যাখ্যায় সুকুমার কোনোভাবেই একজন অরাজনৈতিক রচয়িতা ছিলেন না। তাঁর সময় ও জীবনাভিজ্ঞতা তাঁকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করেছে এবং তা কোনোভাবেই তাঁর রচনায় বিচ্ছিন্ন থাকেনি। 'বাবুরাম সাপুড়ে' ছড়াতেই যেমন, ভাষার উপরিতলে আবালবৃদ্ধবণিতার জন্য এতে আছে নির্মল হাস্যরসের খোরাক। কারণ যে সাপের বিষদাঁতই নেই, আবার যে সাপ কামড়ায় না, এমনকি ফোঁসফোঁসও করে না; এমন সাপকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার মাঝে বাহাদুরিটা ঠিক কোথায়? কিন্তু লক্ষণীয় যে, কেন ডাণ্ডা বাগানো পালোয়ানের এমনধরনের সাপই লাগবে ঠাণ্ডা করার জন্য? ডাণ্ডা বা দণ্ডের একটা ভিন্ন ব্যঞ্জনা এক্ষেত্রে খুঁজে নেয়া যায়। ডাণ্ডা হলো শোষণের হাতিয়ার। অর্থাৎ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বা শাসকের প্রতিভূ। এদিকে এর গভীরতল খুঁজতে গেলে পাঠক খুঁজে পাবে এক ভঙ্গুর ব্যক্তিত্বের মধ্যস্বত্বভোগী নতজানু গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব, শাসকের সামনে কোনো ধরনের সত্য উচ্চারণ বা প্রতিবাদের কোনো সাহস যাদের থাকবে না বলে শাসক শ্রেণির প্রত্যাশা। ব্রিটিশ শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চারিত্রিক এই বৈশিষ্ট্যকেই বোধ করি সুকুমার তাঁর এই ছড়ার চিত্রিত বর্ণনায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। কারণ, চাটুকারিতা আর আজ্ঞাবহ জীবনযাপনই যাদের মৌল ব্যক্তিত্ব, তারা শাসকের করা অন্যায়ের বিরুদ্ধে না পারে কোনো আন্দোলন করার কথা ভাবতে, না পারে নিজের জন্য কোনো সুষ্ঠু সম্মানের পরিপার্শ্ব সৃষ্টি করতে। যার উল্লেখ আছে উক্ত ছড়ার প্রতিটি চরণে চরণে—

> বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস্ বাপুরে?
> আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা–
> যে সাপের চোখ্ নেই, শিং নেই নোখ্ নেই,
> ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,
> করে নাকো ফোঁস্‌ফাঁস্, মারে নাকো ঢুঁশঢাঁশ,
> নেই কোন উৎপাত, খায় শুধু দুধ ভাত–
> সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আনত?

তেড়ে মেরে ডাণ্ডা ক'রে দেই ঠাণ্ডা[৫]

বিনির্মাণের উপর্যুক্ত প্রাসঙ্গিকতা সুকুমার-সাহিত্যকে আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সম্ভাবনাকে উস্কে দেয়। কারণ সুকুমার রায় তাঁর রচনায় সমাজকে নানাভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন তাঁর নিজস্ব লেখন-আঙ্গিকের আলোকে, উৎসাহিত করেছেন প্রশ্নের-সংস্কৃতিকে।

প্রশ্নের সংস্কৃতি বিনির্মাণে

তিনি তাঁর রচনায় সমাজস্থিত বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করতে বা নিজস্ব প্রতিবিধান রচনা করাতে নিঃসংকোচ ছিলেন। তাইতো তিনি কখনো কখনো বেছে নিয়েছেন সক্রেটিসীয় পদ্ধতির অনুকরণে প্রশ্ন-উত্তরভিত্তিক এক অভিনব সংলাপভিত্তিক পদ্ধতি, যাতে ছিলো জীবন ও জগৎ সম্পর্কে শিশু মননে প্রশ্ন তৈরির উৎসাহ-সম্বলিত উপযোগী প্রশ্ন-উত্তর নির্মাণের আবহ। কারণ সমসাময়িকদের মাঝে তিনি ছিলেন রীতিসিদ্ধ প্রকাশের ধরনধারণের বিরুদ্ধে, তাই তাঁর প্রকাশ ছিলো একান্তই তাঁর নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গির অধীন। সেই নিজস্বতার কাছে সক্রেটেসীয় পদ্ধতির হুবহু মিল না থাকলেও, এই প্রশ্নের সংস্কৃতি বিনির্মাণে সুকুমারীয় সংলাপভিত্তিক পদ্ধতিটিও বেশ কার্যকর। এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়নটি এরকম:

> বাস্তবিক আমাদের অন্বেষণ প্রশ্নেরই অন্বেষণ—প্রশ্নকে যখন ঠিক ধরিতে পারি তখন উত্তর পাইতে আর বিলম্ব হয় না। মানুষের চিন্তা, মানুষের সাধনা, মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সকল প্রকার প্রয়াসের মধ্যে প্রশ্নটাকে বারবার না বিচিত্ররূপে জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়।[৬]

সক্রেটিসীয় পদ্ধতির আলোকেই বলি বা সুকুমারের এই নিজস্ব সংলাপভিত্তিক রচনার কথাই বলি; এসবের দেখা মেলে সুকুমারের অনেক রচনাতেই, বিশেষ করে তাঁর *খাই খাই* ছড়াগ্রন্থে 'মূর্খমাছি' ছড়াতে এই পদ্ধতিটির একটি সুন্দর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখানে কী উদ্দেশ্যে মাকড়সা মাছিকে নিজের আঙিনাতে ডাকাডাকি করছে, আর মাছিটাও ঠিক কী কী যৌক্তিক ব্যাখ্যার আলোকে মাকড়সাটাকে বিশ্বাস বা ভরসা করতে পারছে না; তার কৌতূহলোদ্দীপক বাস্তবিক বাহাস রয়েছে:

> মাকড়সা
> সান্-বাঁধা মোর আঙিনাতে
> জাল বুনেছি কালকে রাতে,

ঝুল ঝেড়ে সব সাফ করেছি বাসা।
আয়না মাছি আমার ঘরে,
আরাম পাবি বসলে পরে,
ফরাশ পাতা দেখবি কেমন খাসা!

মাছি
থাক্ থাক্ থাক্ আর বলে না,
আনকথাতে মন গলে না–
ব্যবসা তোমার সবার আছে জানা।
ঢুকলে তোমার জালের ঘেরে
কেউ কোনদিন আর কি ফেরে?
বাপ্রে! সেথায় ঢুকতে মোদের মানা।[৭]

খানিকটা সক্রেটেসীয় পদ্ধতির আলোকে হলেও সুকুমারের প্রশ্নের মাধ্যমে শিশু ও পরিণত মানসে চিন্তার বীজ উপ্ত করানোর পদ্ধতিটা কিছুটা স্বতন্ত্র। অনেকক্ষেত্রেই তিনি মজার ছলে নানান প্রশ্নের অবতারণা করে একধরনের নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তার মধ্যে যদি ছড়াগ্রন্থ *আবোল-তাবোল*-এর অন্তর্গত ছড়াগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তবে ওখানকার প্রশ্নগুলোর বাস্তবিক ছন্দটা একান্তই হেঁয়ালিতে পূর্ণ বলে ধরা দেবে, যেহেতু *আবোল-তাবোল* বিশেষভাবে সুকুমারের 'ননসেন্স রাইম' ঘরানার উঁচুস্তরের সাহিত্যকর্ম। যাকে পুনঃপাঠের বিনির্মাণে উঁচুদরের রাজনৈতিক স্যাটায়ার হিসেবেও গণ্য করা যায়। যেমন 'খিচুড়ি' ছড়াটিতে প্রশ্ন আছে:

টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা–
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা?
কিংবা,
গরু বলে, 'আমারেও ধরিল কি ও রোগে?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে?[৮]

এমন প্রশ্নের মাধ্যমে 'খিচুড়ি' ছড়াতে সুকুমার বুঝি তৎকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অরাজক পরিস্থিতি নিয়েই বিদ্রুপ করেছেন। কারণ, তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসনের অধীন সমাজে এ মাটির মানুষের মনস্তত্ত্বে যে দ্বান্দ্বিকতা ক্রিয়াশীল ছিলো, তার প্রকাশ ইতিহাস থেকে সুস্পষ্টভাবে ধারণা পাওয়া যায়। সেসময়ে এদেশবাসী যে আত্মপরিচয়ের সংকট-মুহূর্ত পার করছিলো, তার ধারণা পাওয়া যায় তৎকালীন সংগঠিত হওয়া কিছু বিপরীতমুখী সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের

দর্শন অনুধাবনে আনলে। একদিকে যেমন আত্মপরিচয় সচেতন 'স্বদেশী আন্দোলন', আবার অন্যদিকে আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত 'ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট'। যদিও প্রথমটি রাজনৈতিক আন্দোলন ও পরেরটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন; তবে এ কথাতো স্বীকার্য যে, কোনোকিছুই রাজনীতির বাইরে নয় এবং যেকোনো দার্শনিক আন্দোলনই সমাজের প্রগতি কিংবা পশ্চাৎপদতার স্বাক্ষরবাহী। এমনকি সেসময়ে এ জনপদ সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা ক্রান্তিকালও পার করছিলো। রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, বিদেশিদের হাতে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ, পুঁজিবাদী বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উত্থানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি ইত্যাদি টানাপোড়েন তখন একইসঙ্গে সক্রিয় ছিলো। সবমিলিয়েই এক জগাখিচুড়ি সমাজচিত্র সেসময়ের বাস্তবতা।

এরকম একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ঘেরাটোপে আবর্তিত সুকুমার উল্লেখিত 'হাঁস' চরিত্রটির মতন শান্তিপ্রিয় প্রাণী নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই আত্মরক্ষায় কাঠিন্য ধারণকারী গায়ে কাঁটাসর্বস্ব 'সজারু'র মতন কোনো প্রাণীই হতে চাইলেও চাইতে পারে। কিন্তু এইধরনের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ জীবন ও বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হওয়ার পেছনে যতই টিকে থাকার কৌশল গ্রন্থিত থাক না কেন, তবুও এই পরস্পরবিরোধী সংমিশ্রণের ফলাফলে প্রতিটি প্রাণের 'আত্মপরিচয়ের সংকট' আরও প্রবলভাবে সক্রিয় হয়। পুরো 'খিচুড়ি' ছড়াটিতেই সেসময়ের বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট ও ভিন্নধারার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে সুকুমার হাস্য-রসাত্মকভাবে হেঁয়ালির আদলে বর্ণনা করে গেছেন। যে সংকট আছে 'বকচ্ছপ', 'টিয়ামুখো গিরগিটি', 'বিছার ঘাড়ে চড়া ছাগল', 'ফড়িং এর ঢং ধরা জিরাফ', 'মোরগের ভয়ে ভীত গরু', 'হাতিমি', 'সিংহরিণ'-সহ সবার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মাঝে। কারণ, এহেন বৈসাদৃশ্যমূলক অনুকরণপ্রিয় মৈথুনমুখিতায় তারা সবাই তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে, আক্রান্ত হয়েছে এক আত্মবিশ্বাসহীন হতাশাপূর্ণ মানসিক বিকারগ্রস্ততায়।

'বকচ্ছপ' যেমন পারে না স্বতন্ত্র কচ্ছপের মতন বিপদে খোলসের মাঝে মাথা ঢোকাতে, তেমনি বক বর্তমান খোলের ভারে পারে না পূর্বের মতন স্বাচ্ছন্দ্যে তড়িৎ উড়তে। তেমনি 'টিয়ামুখো গিরগিটি' হতে গিয়ে টিয়া হারিয়েছে তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য, হয়েছে গিরগিটির মতন রঙ বদলানো বহুরূপী চরিত্র বিলীন হয়েছে তার সৌন্দর্যপ্রকাশক উজ্জ্বল লাল ঠোঁটের আভিজাত্য। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অতৃপ্তি, দ্বিধা-সংশয় আর সিদ্ধান্তহীনতার এক মহাসংকট। অযাচিত, অকারণ,

আরোপিত এহেন সামাজিক-রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়ায় কেবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই হারিয়ে যায়নি, হারিয়ে গেছে অনেক প্রাচীন চর্চা ও ঐতিহ্যও। বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রাণ ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার স্বরূপ লক্ষ্য করা যায় ছোট্ট ফড়িং-এর বৈশিষ্ট্যকেও যখন জিরাফের মতন বৃহদাকার প্রাণী গ্রাস করতে চায়। আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের চিত্র পাওয়া যায়, বিছার ঘাড়ে ছাগল চড়ার বর্ণনা আর মোরগের ভয়ে ভীত গরুর মতন স্থূলকায় প্রাণীর আত্মবিশ্বাসহীন আশঙ্কার ভেতর। সমাজ-রাজনৈতিক দর্শনের তৎকালীন টালমাটাল অবস্থার মধ্যে ধর্মীয় দর্শনগত বেশ কিছু দ্বান্দ্বিকতাও সেসময়ে বিদ্যমান ছিলো। সবকিছু মিলিয়েই 'হাতিমি'র মধ্যে উপস্থিত মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বিকাশ এক পর্যায়ে সমাজে চরম বিপর্যয়ে ইঙ্গিত দিয়ে যায়। স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ফেরার তাড়নায় মিলনোন্মুখ সংমিশ্রণ এক পর্যায়ে দুর্ভাগ্যজনক এক প্রতিবেশ সৃষ্টি করে। আর সমাজের অন্তর্গত বসবাসকারীদের তখন নিজস্ব গৌরবান্বিত শৌর্য-বীর্য হারিয়ে দিনশেষে নিজেকে অন্য মানুষ হয়ে অসন্তুষ্টি নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে বাঁচতে হয়।

প্রশ্নের এই যে ক্ষমতা, প্রশ্নই প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে; এটা সুকুমার তাঁর লেখনীতে বারবার ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে। কখনো সংলাপের আদলে দ্বিপক্ষীয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে, কখনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তার প্রেক্ষিতে, আবার কখনো স্বপ্রণোদিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্নে। প্রশ্নের এই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার এ রূপ অভিনব কায়দা এদেশীয় সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আবহে তুলনামূলক কম চর্চিত। এরকম আরও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছড়ার মাঝে আছে যেমন—*আবোল-তাবোল* ছড়াগ্রন্থের 'বোম্বাগড়ের রাজা', 'সৎ পাত্র', 'কিম্ভূত', *খাই খাই* ছড়াগ্রন্থের 'জীবনের হিসাব', 'বিষম চিন্তা', 'আড়ি' এবং *অন্যান্য কবিতা* সংকলনের 'কত বড়', 'ছিটেফোঁটা', 'খোকা ঘুমায়' ইত্যাদি ছড়া।

সমাজবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচনে

প্রশ্নটা যখন ননসেন্স রাইম কিংবা ননসেন্স সাহিত্যের আড়ালে রাজনৈতিক বা ভিন্ন কোন দর্শনগত স্যাটায়ার রচনার, সেক্ষেত্রেও সুকুমার অত্যন্ত সিদ্ধহস্তে তাঁর সাহিত্যিক বিদ্রুপ অত্যন্ত সাবলীল হাস্যরসের মধ্য দিয়ে করে গেছেন। এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণের ক্ষুরধার রচনাগুলোর মাঝে; যেটিই পূর্বে সুকুমারের বয়ানে যেকোনো সাহিত্যিকেরই যে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট করে হলেও কোনো না কোনো দর্শন থাকে এমন বক্তব্যের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়েছিলো। তাইতো সুকুমারকে কেবল শিশুসাহিত্যিক হিসেবে মূল্যায়িত

করেই ক্ষান্ত দেয়ার সুযোগ কম। ননসেন্স ঘরানার সাহিত্য রচনার মাধ্যমে বাংলা তথা বিশ্বের সাহিত্যিক-সমাজে আলাদা অবস্থান অর্জন করে নেয়া সুকুমার, কোনোভাবেই কেবল শিশু সাহিত্যিক হিসেবে মূল্যায়ন পাবার মতন সাহিত্যিক নন। তিনি গভীরভাবে মূল্যায়িত হওয়ার দাবি রাখেন ভিন্নধারার শক্তিশালী একজন সাহিত্যিক হিসেবেও, যেমন গল্পকার, প্রাবন্ধিক ইত্যাদি। কারণ, তিনি তাঁর বহুমুখী রচনাতে কেবল ননসেন্স সাহিত্যই রচনা করেছেন এমন নয়, লিখেছেন সমসাময়িক বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যভিত্তিক রচনা এবং প্রাণ-প্রকৃতির অন্তর্গত সভ্যতার অগ্রগতি সম্বন্ধীয় আগ্রহোদ্দীপক ইতিহাস ও দর্শনভিত্তিক রচনাও। যদিও রচনার বৈশিষ্ট্যে প্রতিটি রচনাই হয়ে উঠেছে সুকুমারীয় সাহিত্য-রচনার বিশিষ্ট আঙ্গিকাধীন, কিন্তু তা সর্বদাই ননসেন্স সাহিত্যের খেয়াল রসে লিখিত হয়নি। যদিও তিনি অন্য সবার থেকে বিশেষ বলে পরিচিত বিশেষত তাঁর রচিত ননসেন্স ঘরানার সাহিত্য রচনার জন্যই, তবুও তাঁর রচনার ভঙ্গিতে যে হেঁয়ালির ঢং বিদ্যমান তা কোনোভাবেই সমকালীন জাগতিক ঘটনাবলির প্রভাববিচ্ছিন্ন নয়। তাই তাকে কেবল ননসেন্স ঘরানার কল্পনার রাজ্যের রচয়িতা না বলে, বরং বলা ভালো তিনি ভীষণভাবেই সময়ানুগ-বাস্তব এবং একইসঙ্গে কালোত্তীর্ণ তাঁর সাহিত্যিক সম্ভার। এ সম্পর্কে সুকুমারের নিজের মূল্যায়নটিই এখানে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক, 'অলৌকিক রসের অবতারণা করিতে হইলে লৌকিকের জ্ঞানটা একটু বিশেষ মাত্রায়ই আবশ্যক'।[৯] এই বিষয়টা সুকুমার কেবল প্রশ্ন করার মাধ্যমেই পাঠকের কাছে তুলে ধরেননি, তিনি সমকালের গতানুগতিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য চর্চার বিরুদ্ধে শক্ত উচ্চারণের যথাযথ আবহ সৃষ্টি করেছেন হাসি-কৌতুকের মোড়কে। এক্ষেত্রে *আবোল-তাবোল* এর 'একুশে আইন' ছড়াটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ, এই ছড়াতে সমকালীন অরাজক পারিপার্শ্বিকতার এত নিখুঁত বর্ণনা তিনি তৈরি করেছেন তার উপরিতলে নিছক শিশু সাহিত্যের আদল থাকলেও, তা বিনির্মাণের বিশ্লেষণে ভাষিক গভীরতলের এসে পূর্ববর্ণিত তৎকালীন অস্থির পারিপার্শ্বিকতার অভিজ্ঞান রচনা হিসেবে পরিগণিত। কারণ, 'একুশে আইনে' স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসক ও শোষকশ্রেণির ক্ষমতার অপব্যবহারের এমন চমৎকার স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনা খুব কমই আছে। পাঠক যদি এই ছড়াকে সুকুমারপুত্র বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের *হীরক রাজার দেশের* মূলভাবের সঙ্গে মেলাতে চায়; দু'য়ের মাঝে ভাবগত একটা অন্ত্যমিল খুঁজে পাবে। মনে হতেই পারে সত্যজিতের এই জনপ্রিয় চলচ্চিত্রটি বুঝি পিতা সুকুমারের 'একুশে আইন'-এর থেকেই ভাব পরিগ্রহণ করেছে, অনুপ্রাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য

সুকুমারপ্রভাবিত সত্যজিতের শিল্পকর্মের এই ভাব উদ্দীপিত হওয়ার বিষয়ে অজয় মিশ্রের বক্তব্যটি এরকম:

> বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু
> আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু
> আজকে হেথায় চামচিকে আর পেঁচারা
> আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা।'
>
> সুকুমার রায়ের 'হ য ব ও ল' কবিতার অংশবিশেষ দিয়ে শুরু হচ্ছে 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর শশী পালের মৃত্যু দৃশ্য। সুকুমার রায় প্রসঙ্গ আমরা নানাভাবেই সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মে দেখতে পাবো।[১০]

সুতরাং এই মূল্যায়নের সূত্র ধরে 'একুশে আইন' ছড়াকে যদি সর্বকালের সব অরাজক স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপক হিসেবে ব্যবহারোপযোগী 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমার চলচ্চিত্রায়ণ হিসেবে ধরা যায়, তবে এর নিম্নোল্লেখিত অংশবিশেষকে উক্ত চলচ্চিত্রের 'যন্তরমন্তর' ঘরের ভাব ও দৃশ্যায়নের প্রণোদনার রূপ হিসেবে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যাবে:

> যেসব লোকে পদ্য লেখে,
> তাদের ধ'রে খাঁচায় রেখে,
> কানের কাছে নানান সুরে,
> নামতা শোনায় একশো উড়ে,
> সামনে রেখে মুদীর খাতা–
> হিসেব কষায় একুশ পাতা।[১১]

এছাড়াও 'আশ্চর্য' ছড়াটির উল্লেখে সুকুমার আমাদের সহজ উচ্চারণে অনুধাবিত করাতে পারে যে, সর্বকালের সব ক্ষমতাবানদের চক্ষুশূল হওয়ার উপাদান হলো লেখা বা সত্য উচ্চারণ। পরিস্থিতির চাপে প্রতিবাদকারীর ভাষা ও স্বাভাবিক চলনে কী ভয়াবহ শৃঙ্খলের সৃষ্টি হয়, তা উক্ত ছড়াটিতে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। ছড়াটি নিম্নরূপ:

> নিরীহ কলম, নিরীহ কালি,
> নিরীহ কাগজে লিখিল গালি-
> 'বাঁদর বেকুব আজব হাঁদা
> বকাট ফাজিল অকাট গাধা।

আবার লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্টি, যতন করি-
'শান্ত মানিক শিষ্ট সাধু
বাছারে, ধনরে, লক্ষ্মী যাদু।'
মনের কথাটি ছিল যে মনে,
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে,
আঁচড়ে আঁকিতে আখর ক'টি
কেহ খুশী, কেহ উঠিল চটি।[১২]

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে সুকুমারের ননসেন্স রাইম বা ননসেন্স সাহিত্যের হেঁয়ালির ভাষা কিংবা এর অন্তর্গত হাস্যরসাত্মক বর্ণনা অথবা যেকোনো রচনাতেই সমাজের সমকালীন ও কালোত্তীর্ণ দার্শনিক ও বাস্তবিক পর্যবেক্ষণ বিদ্যমান। যা কেবলই শিশু সাহিত্যের অন্তর্গত নয়, বয়স্কপাঠ্যও বটে।

Unschooling movement বা অপ্রাতিষ্ঠানিক মুভমেন্টের প্রাসঙ্গিকতায়

শিশুর মনস্তত্ত্বে পরিণত বিশ্বে যৌক্তিক প্রশ্ন রাখার সামর্থ্য সৃষ্টিতে ও শিশুদেরকেই সেই সক্ষমতার সমান্তরালে ভাবতে সুকুমার পছন্দ করতেন বলে যদি মনে করা হয়, বিনির্মাণ-পরবর্তী বিশ্লেষণে তা অগ্রাহ্য করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে বর্তমানের 'Unschooling movement' বা 'অপ্রাতিষ্ঠানিক মুভমেন্ট'-কে স্মরণ করা যেতে পারে। বর্তমানের চোখ দিয়ে বিংশ শতকের সুকুমারের শিশু পাঠকের প্রতি যে ধরনের সযত্ন সম্মান তাঁর রচনার মাঝে দেখা মেলে, তা উক্ত 'অপ্রাতিষ্ঠানিক মুভমেন্ট'-এর সমান্তরাল হিসেবেই বিবেচনা করা যেতে পারে। সুকুমার যখন তাঁর লেখায় শিশুদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চান:

মিষ্টি সুরে দোয়েল পাখি জুড়িয়ে দিল প্রাণ,
তার কাছে কৈ বসলে নাতো শুনলে না তার গান।

কিংবা,
খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকোখানি ডুবল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, 'একি বিপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবল নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?'
মাঝি শুধায়, 'সাঁতার জানো?' মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, 'মশাই, এখন কেন কাবু?

বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোলআনাই মিছে।[১৩]

ওপরে বর্ণিত দু'টো রচনার মতো আরও অনেক এমন অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষণের প্রতি আন্দোলিত হওয়ার ব্যাপারে, অর্থাৎ স্বশিক্ষিত হওয়ার প্রতি শিশুদের মনোযোগ ফেরাতে সুকুমারের ঐকান্তিক চেষ্টা ছিলো। Unschooling movement বা অপ্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলন উনিশশত সত্তরের দশকে যাত্রা শুরু করে, কিন্তু উনিশশত নব্বইয়ের দশকে এসে সংঘবদ্ধ আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। Rolstad & Kesson(২০১৩) এর মতে, 'আনস্কুলিং বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা(Unschooling) রাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রিত প্রথাবদ্ধ শিক্ষাদান ও পঠনের বাইরে গিয়ে স্বপরিচালিত একটা শিক্ষামাধ্যম।'[১৪] Taylor-Hough(২০১৩) এর মতে, 'আনস্কুলিং বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা(Unschooling) সব ধরনের বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত শিক্ষা, যা সাধারণ মানুষের জীবন থেকে নেয়া। যে শিক্ষা প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পিছিয়ে পড়া ও নির্যাতিতদের মুক্তির শিক্ষা(Subaltern) হিসেবে চর্চিত হয়। আনস্কুলিং পিছিয়ে পড়া, অশ্রুত ও অবহেলিত শ্রেণির মধ্যে শিশুদেরকে অগ্রগণ্য বলে ধরে এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন ও সামগ্রিক সম্ভাবনাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখে।' শিশুদের নিয়ে আনস্কুলিং এর এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সুকুমার রায়ের সাহিত্যে ভীষণ প্রাসঙ্গিক। উল্লেখ্য, John Holt-এর 'Teach your own'(1977: 44) গ্রন্থে শিশুদের ক্ষমতায়ন ও মূল্যায়নের বিষয়ে যে দর্শন উচ্চারিত হয়েছে, তারই অনুরণন সুকুমার রায়ের শিশুসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায়; যা আনস্কুলিং এর ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত:

> Children want to learn about the world, are good at it, and can be trusted to do it without much adult coercion or interference.[১৫]
>
> [শিশুরা তাদের চারপাশের পৃথিবীকে জানতে চায়। সেটাতে তারা বেশ পারঙ্গম এবং তাদের বিশ্ববীক্ষা অর্জনে তাদেরকে বড়দের প্রভাবমুক্ত রেখেই বিশ্বাস করা যায়।]

সুকুমারের শিশুসাহিত্যে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষণের প্রতি উৎসাহ ছিলো সবসময়। সমসাময়িক কিংবা ঐতিহ্যগতভাবে এদেশের ছড়াকারদের ছেলে ভোলানো 'আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা' কিংবা 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে' ধরনের

ছড়া সুকুমারের শিশুসাহিত্যে কম পাওয়া যায়। বরং শিশুকেও তাঁর লেখায় উৎসাহী চিন্তাশীল পাঠক হিসেবে তিনি মূল্যায়ন করেছেন। শিশুদের মনে এ জগৎ সম্পর্কে জানার যে বিস্তর জিজ্ঞাসা, তার প্রতি কোনো চাপানো মতবাদ কিংবা ছেলে ভোলানো লেখা না লিখে; তিনি শিশুদের এই নানাবিধ প্রশ্নের বিস্তৃতিতে একজন শিশু হয়েই তাদের জানার প্রশ্ন আরও বাড়িয়ে দেবার মাধ্যমে তাদের যৌক্তিক মানস গড়নে ভূমিকা রেখেছেন।

সুররিয়েলিজম বা পরাবাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে

সমকালের গণ্ডি পেরিয়ে আজও যে সুকুমার খুব সহজেই বর্তমানে চলমান 'অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষণ আন্দোলন'-এর ব্যাখ্যাতেও ব্যাখ্যত হওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক, এর পেছনে রয়েছে সুকুমারের পারিবারিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকারিত্বের প্রভাব। সুকুমারের পারিবারিক ঐতিহ্যেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি দুর্দান্ত এক অনুরাগ বিদ্যমান ছিলো এবং ব্যতিক্রমী ও উদ্যোগী অগ্রগামী চিন্তার সূত্রেই সুকুমারের শৈশবের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। তৎকালীন সময়েই তিনি ইলাস্ট্রেশনের উপর উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে এসেছিলেন সেই দূরদেশ থেকে। তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনাতেই এই ইলাস্ট্রেশনের ছোঁয়া পাওয়া যায়। সুকুমারের এই ইলাস্ট্রেশনকে কেউ কেউ খুবই সংকীর্ণ মূল্যায়ন করলেও, তিনি যে এসবে বিচলিত হওয়ার মতন পাত্র ছিলেন না; তার উল্লেখ পাওয়া যায় শোভন সোম বর্ণিত 'চিত্রকর সত্যজিৎ রায়' প্রবন্ধেঃ

> এদেশের শিশুদের কথা ভেবেই তাঁরা লেখার কলম ও আঁকার তুলি হাতে নিয়েছিলেন। শিশুমনের খোরাক জোগানোর জন্য তাঁরা কেবল সাহিত্যরচনাকেই নির্ভর করেননি, সেই সাহিত্যরচনার সমান মানের সচিত্রণেও তাঁরা তৎপর হয়েছিলেন। বুক ইলাস্ট্রেশনকে অনেকে বিজ্ঞাপনশিল্প মনে করলেও সত্যজিতের ঠাকুরদা ও বাবা উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার সে ধরনের ছুঁৎমার্গে বিশ্বাস করতেন না।[১৬]

এমনকি সমকালীন চিত্রশিল্পের চর্চায় ঘটে যাওয়া নানান শিল্প-আন্দোলন সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট খোঁজখবর রাখতেন এবং এ-সংক্রান্ত তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধও রয়েছে। এ ব্যাপারে আব্দুল মান্নান সৈয়দের বক্তব্যটি উল্লেখ না করলেই নয়— 'এখন থেকে অনেক বছর আগে শিশুসাহিত্যিক সুবিখ্যাত সুকুমার রায়ই প্রথম বাংলা ভাষায় কিউবিজম, ফিউচারিজম ইত্যাদি সম্পর্কে লিখেছিলেন।'[১৭] সুকুমারের এই

ইলাস্ট্রেশনের পেছনের মূলগত রচনার বর্ণনা ও তাঁর রচিত চিত্রকলার বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ে রচনার বিষয়টিকে একসঙ্গে বিবেচনা করে দেখলে, এক্ষেত্রেও একটি চমকপ্রদ বিনির্মাণ দৃষ্টিগোচর হয়। তা হলো সুকুমারের এই ননসেন্স সাহিত্য নির্মাণের প্রণোদনায় তাঁর সমসাময়িক চিত্রশিল্পের আন্দোলনগুলোর প্রভাব থাকার সমূহসম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, সুকুমার-উত্তর সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদ আন্দোলনের একটা অপূর্ণাঙ্গ পূর্বরূপের সন্ধান তাঁর রচিত খামখেয়ালী জগতের বর্ণনা ও সেসবের চিত্রিত স্বরূপের মাঝে পাওয়া যায়। বিশেষত তাঁর খেয়াল-রসের সাহিত্য তথা রচনাগুলোকে এই নিরিখে কেবল ননসেন্স সাহিত্য হিসেবে না বিবেচনা করে, একইসঙ্গে এসব ভাবনাকে সুররিয়ালিজিমীয় বা পরাবাস্তববাদী রচনার সঙ্গে খানিক মেলানো যেতে পারে। কারণটা খুব স্পষ্ট, এ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যাটি শিল্পী কামাল আহমেদের ভাষ্য থেকে খোঁজা যেতে পারে:

> সুররিয়ালিজম শুধুমাত্র সৌন্দর্যতত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি, জীবনদর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রূপকথা ও উপকথা মানুষের চিন্তাধারার মতোই পুরোনো। স্বপ্নের প্রতি শিল্পীরা স্বভাবতই আগ্রহী। তারা সর্বযুগেই স্বপ্নকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সুররিয়ালিজম স্বপ্ন, রূপকথা, প্রতীক এবং সচেতন ও অবচেতন মনের কল্পনার মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো শিল্পী এতে বিদ্রূপ, ভয়ভীতি এবং অবচেতন মনের কল্পনাকে যোগ করেছেন।[১৮]

উপরে উল্লেখিত সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে সুকুমারের রচনা ও সচিত্রিত-ইলাস্ট্রেশনের খুব দূরগত সম্পর্ক নয়, বরং খেয়াল করলে অনুধাবন করা যায় সম্পর্কটি বেশ একান্ত। যেমন, তাঁর *হ য ব র ল*-এর প্রারম্ভে যে দৃশ্যকল্পের বর্ণনা আমরা পাই, তা যথেষ্টই সুররিয়েলিস্টিক ভাবাদর্শগত চিত্রকল্প। গল্পের দৃশ্যে কল্পরাজ্যের আবহে সৃষ্ট সুকুমার ননসেন্স সাহিত্যে যে বিভ্রান্তির ঘোর বিদ্যমান, তার সঙ্গে সুররিয়ালিস্টিক চিত্রশিল্পী সালভাদর ডালির(১৯০৪-১৯৮৯) 'মেটামরফোসিস-অব-নার্সিসাস'-এর তুলনা করা যেতে পারে। এটা এ কারণেই যে:

> 'মেটামরফোসিস' শব্দের অর্থ আকারের পরিবর্তন। আমরা দেখতে পাই ডালি কি সুন্দরভাবে এই পরিবর্তন করেছেন; চিত্রটির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যে হাতটি ডিম ধরে রেখেছে তা পাথরে পরিণত হয়েছে। পিঁপড়া তার উপর চলাফেরা করেছে। ডানদিকের দাবার ছকটি শহরের স্কোয়ারে পরিণত হয়েছে। একজন দাবা খেলোয়াড় স্কোয়্যারের মধ্যে পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। এমনকি নদীর পানি কাঁচে পরিণত হয়েছে।[১৯]

সালভাদর ডালির চিত্রকর্ম

সুকুমার রায়ের দৃশ্যকল্প

[illegible]

উক্ত চিত্রশিল্পের আঙ্গিকের সঙ্গে সুকুমারের পূর্বোল্লোখিত দৃশ্যকল্পের আঙ্গিকে খুব মিল রয়েছে। ভাব ও প্রকাশের এই মিলটুকুই সুকুমার সাহিত্যে সুররিয়ালিস্টিক বা পরাবাস্তববাদের আবহ থাকার বিষয়টিকে স্পষ্ট করে। বিশেষত পরাবাস্তববাদী শিল্পী সাহিত্যিকদের মনোভাব ও কর্মের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুকুমারের রচনার বৈশিষ্ট্যের অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে পরাবাস্তববাদী শিল্পীদের সম্পর্কে গোলাম ফারুক খান বিধৃত 'আধুনিকতাবাদী শিল্প ও সাহিত্য আন্দোলন: কতিপয় ইশতেহার' প্রবন্ধে উল্লেখিত বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক:

> অবচেতন থেকে উৎসারিত চিত্রকল্প, প্রতীক, স্বপ্ন আর খণ্ডদৃশ্য পরাবাস্তববাদী শিল্পের প্রাণবীজ। যুক্তি ও মননের গ্রন্থি এখানে ভেঙে পড়ে, স্বপ্ন হয়ে ওঠে সবকিছুর নিয়ামক। যুক্তির নিষ্পেষণ মনকে মুক্ত করে সত্তার বাঁধনহারা ও লীলাচঞ্চল উৎসারকে ধারণ করাই পরাবাস্তববাদীদের অভীষ্ট।[২০]

সুতরাং পরাবাস্তববাদের আলোকে সুকুমারের সাহিত্য পর্যালোচনা করলে তৎকালের নানান সমাজ ও বিশ্ববীক্ষা সম্পর্কে সুকুমার রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনের ক্ষেত্র তৈরি হবে বলে ধারণা করা যায়।

উত্তর-আধুনিকতাবাদী চিন্তাকাঠামোয়

সাহিত্যিক সুকুমারের ননসেন্স সাহিত্য থেকে শুরু যাবতীয় রচনাকে বর্তমানের নানান সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনাতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়, কারণ তিনি ছিলেন

তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রসর ও অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন সাহিত্যিক। তাই প্রবন্ধের শুরুতেই তাঁর ননসেন্স সাহিত্যের মূল্যায়নে কলাকৈবল্যবাদী বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও, একই সঙ্গে সুকুমারের বয়ান থেকে জানা এর বিরুদ্ধ-অবস্থানের ইঙ্গিতের প্রেক্ষিতে যে বিনির্মাণের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিলো, তা যে আখ্যান উপজীব্য করে; তা হলো এর উত্তর-আধুনিক চারিত্রের স্ফূরণ। যদিও উত্তর-আধুনিকতাবাদের চর্চা সুকুমারের প্রয়াণের বেশ পরে শুরু হয়েছে, তবুও তাঁর রচনাতে উত্তর-আধুনিকতাবাদের বৈশিষ্ট্য বেশ প্রকট। কারণ, তাঁর রচনার পরতে পরতে খোঁজ মেলে মূলে ফেরার এক অমোঘ ডাক। যা বর্তমান উত্তর-আধুনিকতাবাদের সমান্তরাল। তাই সুকুমার তাঁর ছড়ার ভাষায় লিখে যেতে পেরেছিলেন:

> ঐ যে মাঠে শালিখ পাখি ডাকে
> তার কাছে কৈ যাওনিকো ভাই শুধাওনিতো তাকে ![২১]

সুকুমারকে বুঝতে হলে বিশেষ করে সুকুমার শিশু-সাহিত্য বলে এতদিন যেসব রচনা সমাদৃত, তা নতুন মূল্যায়নে পুনঃপাঠের প্রয়োজন এ কারণেই যে, তাঁর রচনার বৃহদাংশ জুড়েই রয়েছে শিশু-মনন উপযোগী সাহিত্যিক-অনুষঙ্গ ও সরল নির্মাণ, যা একইসঙ্গে পরিণতদের মননকেও আন্দোলিত করতে সক্ষম। আর এ সাহিত্যকর্মকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিসত্তার স্বরূপটি অনুধাবন জরুরি। এক্ষেত্রে তাঁর যাবতীয় রচনাসমগ্রকে বিশ্লেষণ করে তাঁকে একজন 'উত্তরব্যক্তিসত্তা' বলে উল্লেখ করা হলে অত্যুক্তি করা হবে না। যেহেতু তাঁর রচনার ভাষা (কী ননসেন্স রাইম কী অপরাপর রচনার নির্যাস) বলে, তিনি এমন একজন সাহিত্যিক, যাঁর পরিচয় দিতে হলে কবি-প্রাবন্ধিক বীরেন্দ্র চক্রবর্তীর উত্তর-আধুনিকতার সমবায়ী পাঠকৃতিতে উক্ত ব্যক্তিসত্তার নিরীখে যে ব্যাখ্যাটি রয়েছে, তা এখানে প্রাসঙ্গিক:

> ব্যক্তির জন্ম এমনই এক দেশ ও কালে; তার গঠনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ঐতিহ্য-তার চিন্তা ও চেতনা রূপ নেয় এই বাস্তবতারই সংঘাতে। নিজস্ব সময় ও সমাজের অবস্থানে অতীত ও ভবিষ্যতের ভারসাম্যে যে বর্তমানকে সে বুঝতে বা গঠন করতে চায়, —সে প্রয়াসে ভিন্ন ঐতিহ্যের প্রতিতুলনায় দেখে নিজেকে, তার মধ্য দিয়েও নিজস্ব পরিস্থিতির অন্তর্গত অস্তিত্ব-প্রভাবকে আত্মস্থ করেও স্বভাবের অনন্যতাকে ব্যক্ত করে।[২২]

কীভাবে সুকুমার উত্তর-আধুনিকতাবাদ সাহিত্যদর্শনের পূর্বসূরি সাহিত্যিক হয়েও উত্তরব্যক্তিসত্তাকে ধারণ করেছেন, তা অনুধাবন করতে হলে দৃষ্টি ফেরাতে হবে তাঁর রচনাগুলোর দিকে। যেগুলো নিতান্তই খেয়াল রসের আধার হয়েও, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে সমকালীন সময় ও জীবনকে ধারণ করেছে। যেমন তাঁর ছড়াগ্রন্থ *আবোল-তাবোল*-এ অন্তর্ভুক্ত ছড়াসমূহের দিকে লক্ষ্য করা যায়, দেখা যাবে তাতে মানুষের আবেগ আর কল্পনার বন্ধনহীন আতিশয্যের লক্ষণ পাওয়া যাবে। তা পাঠকের হৃদয়কে শিল্পিত রসের চূড়ান্ত স্বাদ আস্বাদিত করতে সাহায্য করবে। *আবোল-তাবোলের* প্রতিটি ছড়ার মাঝেই এক ধরনের হেঁয়ালিপূর্ণ খেয়ালের ছড়াছড়ি, ভাষার উপরিতলের বিশ্লেষণ-বিবেচনায় যার কোনো যৌক্তিক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া ভার। দ্বিধাহীন মুগ্ধতা আর হাস্যরসের উপাদানে ভরপুর এই সাহিত্যকে তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় শিল্পের জন্যই শিল্প। যখন সুকুমারের ছড়ায় পাওয়া যায়:

ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা-
ফুল ফোটে [...] ? তাই বল। আমি ভাবি পটকা!
শাঁই শাঁই পনপন, ভয়ে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ [...]?
হুড়মুড় ধুপধাপ—ওকি শুনি ভাই রে!
দেখছনা হিম পড়ে—যেও নাকো বাইরে।[২৩]

তবে উপরোল্লেখিত ছড়াতে কী কেবলই শিল্পিত নির্যাসই লুক্কায়িত, নাকি এর মাঝে প্রকৃতির অকৃত্রিম অখণ্ডকে স্পর্শ করার সংবেদনশীলতাও একইসঙ্গে বিদ্যমান। যেকোনো সংবেদনশীল সত্তা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কল্যাণে এরকমের স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শ অনুভূতির অতলে অনুভব করতে পারে। উত্তর-আধুনিকতাবাদের আলোকে বিবেচ্য সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্যে তো এই সংবেদনশীলতা আর সৃষ্টিশীলতাই মূখ্য বিবেচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখক মঈন চৌধুরীর ভাষ্যে উত্তর-আধুনিকতার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের একটি হলো—'উত্তর-আধুনিকতা synthesis-এর বিপক্ষে, কোনো এক antithesis দিয়ে ভাঙতে চায় সমাজকে।' এই বৈশিষ্ট্যের আভাষই তো আছে সুকুমারের সম্পূর্ণ সাহিত্য জুড়ে। সমাজের উঁচুশ্রেণির মানুষদের একজন হয়েও তাঁর রচনার চরিত্রগুলো গ্রান্ড-ন্যারেটিভ বা মহাআখ্যানভুক্ত চরিত্রের আদলে নির্মিত হয়নি। তিনি তাঁর রচনায় সবসময়েই 'মাইক্রো-ন্যারেটিভ' নিয়ে কাজ করেছেন। তাই তাঁর 'জীবনের হিসাব' ছড়ায় 'বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই' পশ্চিমা ক্ষুদ্র ন্যারেটিভে উদ্ভূত

হয়েও বাস্তবিক ও মানবিক চর্চা ও জ্ঞানে হেরে যান 'মাঝি' চরিত্রের মাইক্রো-ন্যারেটিভ বা ক্ষুদ্র ন্যারেটিভের কাছে। এমনকি সুকুমার সাহিত্যে জীবনযাপনের নানা অনুষঙ্গ এসেছে মনুষ্যব্যতীত অন্যান্য প্রাণীদের চিত্রায়ণের মাধ্যমে। এই যে প্রকৃতিকে অনুভব করতে চাওয়া; মানুষের মাঝেও এমন মানুষদের জীবনের নানান সুর তুলে নিয়ে এসেছেন, যারা প্রান্তিক, যাদের আখ্যানগুলো প্রথাগত চর্চায় খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়নি—যেমন ঐ ছড়ার মাঝি, খোকা কিংবা হাঁসজারু প্রমুখ। সুকুমারের ব্যক্তিসত্তার মাঝে ক্রিয়াশীল ছিলো প্রকৃতি ও প্রাণের প্রতি অসামান্য ভালোবাসা, তাঁর ব্যক্তিত্বের ধারণক্ষমতায় প্রান্তজনের প্রতি মমত্ববোধ ছিলো। তাই উত্তর-আধুনিকতাবাদ চর্চার পূর্বসূরি হয়েও তিনি এর ব্যাখ্যার আলোকেও ব্যাখ্যাত হওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

'একেক জ্ঞানশাখায়, একেক শিল্পশাখায় পোস্টমডার্ন-এর লক্ষণ একেক রকম। যেমন কবিতায় ভাষাচিহ্নের প্রতি প্রতিনিধিত্বমূলকতা এবং আত্মাভিমুখিতাকে পোস্টমডার্ন বলা হয়েছে।'[২৪] উত্তর-আধুনিকতার এমন সংজ্ঞার আলোকে তাই সুকুমারের রচনাগুলো এক হয়ে যায়। কারণ সুকুমারের রচনাতেও তো আত্মাভিমুখিতার ছোঁয়া সর্বত্রই। এমনকি তিনি পশ্চিমা বৃহৎ আখ্যানের বাইরে এসে এদেশীয় ক্ষুদ্র আখ্যানের স্মরণ করেছেন এভাবেঃ

> ছিল এ ভারতে এমন দিন
> মানুষের মন ছিল স্বাধীন।
> [...] [...] [...]
> কালচক্রে হায় এমন দেশে
> ঘোর দুঃখ দিন আসিল শেষে
> দশদিক হতে আঁধার আসি
> ভারত আকাশ ফেলিল গ্রাসি।
> কোথা সে প্রাচীন জ্ঞানের জ্যোতি
> সত্য অন্বেষণে গভীর মতি;
> কোথা ব্রহ্মজ্ঞান সাধন ধন,
> কোথা ঋষিগণ ধ্যানে মগন;
> কোথা ব্রহ্মচারী তাপস যত,
> কোথা সে ব্রাহ্মণ সাধনা রত?

একে একে সব মিলাল কোথা,
আর নাহি শুনি প্রাচীন কথা।[২৫]

কেবল স্মরণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে করণীয় সম্পর্কে ভাবনার কথা বলেছেন এভাবে—

দিকে দিকে দেখ ঘুচিছে রাতি,
দিকে দিকে জাগে কত না জাতি;
দিকে দিকে লোক সাধনারত
জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলেছে কত।
নাহি কি তোমার জ্ঞানের খনি?
বেদান্ত-রতন মুকুটমণি?
অসারে মজে কি ভুলেছ তুমি
ধর্মে গরীয়ান ভারতভূমি?[২৬]

এই যে আত্মাভিমুখিতা এটাই পশ্চিমা বৃহদাখ্যানের(grand narrative)[২৭] ভিত্তিস্থলে আঘাত করে উদ্ভাসিত করে ক্ষুদ্র আখ্যানগুলোকে। প্রভাত চৌধুরীর ভাষায় যাকে বলে—'অধুনান্তিক কবিতা বহুরৈখিক, বহুকৌণিক, বহুত্ববাদী ও বিদিশাময়। যে কোনো ছড়িয়ে পড়ার অভিমুখ খোলা।'[২৮] আর এই বৈশিষ্ট্যের ধারকই ছিলেন সুকুমারের উত্তর-ব্যক্তিসত্তাটি এবং তাঁর রচনায় ছিলো উত্তর-আধুনিকতাবাদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। *আবোল-তাবোল* ছড়াগ্রন্থটির নামকরণ ও এর মুখবন্ধের কৈফিয়তটিই এর যুতসই সাক্ষ্য বহন করে। সুকুমারকে ও সুকুমারের সাহিত্যকে তাই মূল্যায়ন করতে পারা যায় উত্তর-আধুনিকতাবাদের আদর্শ think globally, act locally and don't worry about any ground scheme or master plan.'[২৯]-কে দিয়ে।

শেষকথা

সুকুমার রায় সময়কে অতিক্রম করা এক প্রতিভাবান সাহিত্যিক যাঁকে কেবল ননসেন্স সাহিত্যের রচয়িতা হিসেবে বিবেচনা না করে তাঁর রচনাকে বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকেও বিচার করার সময় এসেছে। কারণ বিনির্মাণের প্রাসঙ্গিকতায় সুকুমার সাহিত্যে যে প্রশ্নের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার উপাদান বিদ্যমান, তা তৎকালীন সমাজবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচনের প্রামাণ্য দলিল। ননসেন্স বা আবোল-তাবোল সাহিত্য বলে যে ক্ষুদ্র

আখ্যানগুলোকে প্রথাগত চর্চায় অপরাপর বৃহদাখ্যানের তলানিতে ফেলে রাখা হয়; উত্তর-আধুনিকতাবাদের চর্চা প্রমাণ করে দেয় সেই ক্ষুদ্র আখ্যানগুলোই বরং অনেক বেশি অনুভূতিগ্রাহ্য। তাত্ত্বিক ও সমালোচনামূলক সুকুমারীয় রচনা সাম্প্রতিককালের প্রভাবশালী উত্তর-আধুনিকতাবাদের আলোকে এজন্যই বেশ প্রাসঙ্গিক। সুকুমারীয় সাহিত্য প্রায়োগিকক্ষেত্রে আরও গভীরভাবে প্রভাবশালী হয়ে দাঁড়ায়, যখন তা সকল নির্যাতিত প্রাণ-প্রকৃতি, মনুষ্য ও অমনুষ্য পৃথিবীর এবং অশ্রুত শ্রেণির যেমন শিশুদের মুক্তি ও ক্ষমতায়নের মাধ্যম আনস্কুলিং-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার দাবি রাখে। এমনকি সাহিত্যতাত্ত্বিক আন্দোলনের বাইরে চিত্রকলা আন্দোলনের পরাবাস্তববাদী ইলাস্ট্রেশন তাঁর ননসেন্স সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. সত্যজিৎ রায় সম্পা., *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র তৃতীয় খণ্ড*(কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), পৃ. ৮৪
২. সত্যজিৎ রায় সম্পা., *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র প্রথম খণ্ড*(কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৬), ভূমিকা অংশ
৩. তদেব, পৃ. ৪৩
৪. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *কবিতার অন্তর্যামী আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: নান্দনিক, ২০১০) পৃ. ১৪৪
৫. সত্যজিৎ রায় সম্পা., *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র প্রথম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৬. সত্যজিৎ রায় সম্পা., *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র তৃতীয় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯
৭. সত্যজিৎ রায় সম্পা., *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র প্রথম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
৮. তদেব, পৃ. ২
৯. সত্যজিৎ রায় সম্পা., *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র তৃতীয় খণ্ড* পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯
১০. আনোয়ার হোসেন পিন্টু সম্পা. *সত্যজিৎ চর্চা*(ঢাকা: বাতিঘর, ২০১৭), পৃ. ১১১
১১. সত্যজিৎ রায় সম্পা., *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র প্রথম খণ্ড* পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
১২. তদেব, পৃ. ৭৩

১৩. তদেব, পৃ. ৭২

১৪. Kellie Rolstad & Kathleen Kesson, *Unschooling and Alternative Learning* 'Unschooling, Then and Now'(2013) Vol. 7 Issue 14

১৫. John Holt, Teach Your Own, (Lighthouse Books, 1997) p. 44

১৬. আনোয়ার হোসেন পিন্টু সম্পা. *সত্যজিৎ চর্চা*(ঢাকা: বাতিঘর, ২০১৭), পৃ. ২৫

১৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বিংশ শতাব্দীর শিল্প-আন্দোলন*(ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০৮), পৃ. ৯

১৮. কামাল আহমেদ, *শিল্পকলার ইতিহাস*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১২), পৃ. ১৬৪

১৯. তদেব, পৃ. ১৬

২০. বেগম আকতার কামাল সম্পা. *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*(ঢাকা: অবসর, ২০১৪), পৃ. ৫০০

২১. সত্যজিৎ রায় সম্পা., *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র প্রথম খণ্ড* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

২২. বরুণজ্যোতি চৌধুরী, *উত্তরায়ণবাদী চেতনার প্রবণতা ও বাংলার উত্তর-আধুনিক কবিকূল*(কলকাতা: একুশ শতক, ২০১২), পৃ. ২৩৬

২৩. সত্যজিৎ রায় সম্পা., *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র প্রথম খণ্ড* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

২৪. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *কবিতার অন্তর্যামী আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

২৫. তদেব, পৃ. ৮৩-৮৪

২৬. তদেব, পৃ. ৮৫

২৭. পশ্চিমা পৃথিবীর জ্ঞান, ধর্ম, শান্তি, মানবাধিকার, উন্নয়ন প্রভৃতি নিয়ে পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডের বড় বড় প্রতিশ্রুতিময়, কিন্তু ভ্রান্তিমূলক যে আখ্যান; তাকে জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওতার (Jean-Francois Lyotard) 'গ্রান্ড এপারেটাস অব লেজিটিমেশন' বা 'স্বীকৃতকরণের বৃহৎযন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

২৮. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *কবিতার অন্তর্যামী আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

২৯. Mary klages, *Literary Theory: a Guide for the Perplexed*, (Bloomsbury, 2002) p. 175. http//ebookcentral.proquest.com

সাহিত্যিকী
দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ | জুন ২০২২ | বাংলা বিভাগ
পৃষ্ঠা : ৬৯ - ৮৬ | শব্দসংখ্যা ৩৯৩৭ | ISSN: 1994-4888 | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নামহীন গোত্রহীন : মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞান

মোছাঃ আঞ্জুমানআরা বেগম*

Abstract

The glorious chapter of Bangladesh, the liberation war, is hopeful in the rise of thousands of dreams, as gray in the pain of dreaming in the life of the Bengali nation. The War of Liberation has given the free life to all Bengali people and a renewed thinking to the writers of the independent country. The War of Liberation created intense stir in the literary mind of Bengalis. Literature has been written on various events of the War of Liberation in Bangladesh after independence. Social conscious writer Hasan Azizul Huq has written illustration of life during the War of Liberation in his notable storybook named *Namheen Gotroheen*. He has also portrayed the context of the liberation war & situation of post-independence Bangladesh in his *Patale Haspatale, Amra*

* সহকারী অধ্যাপক | বাংলা বিভাগ | শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট | ই-মেইল: anjumon248@gmail.com

Opekkha korsi book. The present article focuses on the depiction of the liberation war in notable storybook named *Namheen Gotroheen.*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে যেমন হাজারও স্বপ্নের উত্থানে আশাব্যঞ্জক তেমনি স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ধূসর। মুক্তিযুদ্ধ সর্বস্তরের বাঙালিকে দিয়েছে শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন জীবন আর স্বাধীন দেশের সচেতন সাহিত্যিকদেরকে করেছে নবতর ভাবনায় ঋদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির সাহিত্যিক মানসে সৃষ্টি করেছে তীব্র আলোড়ন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী কালে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে সাহিত্যেও বিভিন্ন শাখা। সমাজ-সচেতন লেখক হাসান আজিজুল হক(জ. ১৯৩৯) তাঁর *নামহীন গোত্রহীন* গল্পগ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধকালীন জীবনের ভাষ্য রচনা করেছেন। *পাতালে হাসপাতালে, আমরা অপেক্ষা করছি*-সহ বিভিন্ন রচনায় তিনি মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে *নামহীন গোত্রহীন* গ্রন্থে প্রতিফলিত মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

সংকেত-শব্দ

মুক্তিযুদ্ধ, আত্মগ্লানি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, রাজাকার, আশাভঙ্গ, যুদ্ধফেরত, রাইফেল

মূল-প্রবন্ধ

পাকিস্তানি শোষকরা বাঙালি জাতি নির্মূলের নিমিত্তে যে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছিল তার বিপরীতে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা যেন সাহসী বাঙালির বুকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে আপন অস্তিত্বের ঘোষণা দেয়। মুক্তিযুদ্ধ যেমন বাঙালির বাঁচার স্বপ্ন ও প্রেরণা তেমনি আবার স্বপ্নভঙ্গের মর্মযন্ত্রণায়

সিক্ত। মুক্তিযুদ্ধ যেমন সমকালীন লেখক-সাহিত্যিক-সচেতন বাঙালিকে আন্দোলিত করেছিল, তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সমাজ ও কালসচেতন মননশীল সত্তাকে কোনো না কোনোভাবে আলোড়িত করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক লেখক তাই মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে সাহিত্য রচনা করেছেন। বিশিষ্ট সমালোচক আনিসুজ্জামান তাই বলেন—

> ১৯৪৭ সালের দেশভাগ বা সীমানার দু'দিকে বাস্তুত্যাগীর কাহিনি অজস্র নয়, দাঙ্গার গল্পও হয়তো সীমিত। কিন্তু ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা আছে বিস্তর, কথক অনেকে। নিভৃত সাধকের মগ্নচৈতন্যে এসব দিনের আবেগ আর ঘটনা স্থান করেছিল। তাই রূপান্তর শুধু মানচিত্রের ঘটেনি, শিল্পী সত্তাও রূপান্তরিত হয়েছিল।'[১]

এ প্রসঙ্গে আরেক সমালোচক বিশ্বজিৎ ঘোষের ভাষ্য—'শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি যেমন একটি দেশের মুক্তিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে পারে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্নাত হয়ে সে দেশের শিল্প-সাহিত্যও যুগান্তকারী নতুন সৃষ্টিতে হয় ঋদ্ধ।'[২]

সাহিত্যিকগণ সবসময়ই সমকালের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। তেমনি মুক্তিযুদ্ধকালীন এমনকি তার পরবর্তী সময়েও লেখকগণ মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত ও স্বাধীন দেশের মানুষের স্বপ্নের সূক্ষ্মরেখাগুলি অঙ্কণ করেছেন। যেন বা 'বেদনা মহিমার এই অনাস্বাদিত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাকে পাশকাটিয়ে নতুন সাহিত্য রচনা সম্ভব ছিল না।'[৩] কেননা, '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কেবল ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মদান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা, নারীর সম্ভ্রমহানির নির্মম আলেখ্য নয়, তারও অতিরিক্ত কিছু। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, আদর্শ, সমাগম, ব্যাপ্তি, গভীরতা, ধ্বংস, সৃজন—এসব কেবল মহাকাব্যের আয়োজনের সঙ্গেই তুলনীয়।'[৪] প্রখর কালসচেতন লেখক হাসান আজিজুল হকের লেখক সত্তাও তাঁর গল্পের বয়ন ও বয়ানে সেই মহাকাব্যিক আয়োজনকেই রূপায়িত করেছেন। মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে জীবন বাজি রেখে এদেশের সর্বস্তরের মানুষের যুদ্ধে যোগদান, নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, বহু প্রাণের বিনিময়ে স্বপ্ন বাস্তবায়ন; অতঃপর নতুন করে ভাগ্য নির্মাণের প্রচেষ্টা, স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় আশাহত মানুষের করুণ উদ্বেগ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের নানান

প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত তাঁর গল্পগুলো হয়ে উঠেছে সময়েরই ইতিহাস তথা মুক্তিযুদ্ধের অনবদ্য দলিল।

হাসান আজিজুল হকের উদ্দাম কৈশোর দেশভাগের মত মর্মন্তুদ ঘটনার সাক্ষী। কৈশোরের সেই স্বপ্নময় চোখ দেশত্যাগের বেদনায় হয়েছে সিক্ত। অতঃপর '৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, '৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর নির্বাচন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে যেন বজ্রের মত কঠোরতা অর্জন করেছে তাঁর ব্যক্তিসত্তা। তবে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার তাগিদ অনুভব করে তাঁর লেখকসত্তা। তাই এদেশের অস্তিত্বের স্পন্দন স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে সাহিত্য রচনার দায় অনুভব করেন তিনি। আমরা দেখি—দেশত্যাগী মানুষের মর্মাহত হাহাকার, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহসী মানুষের প্রাণের স্পন্দন, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জীর্ণ-শীর্ণ অবয়ব আর স্বপ্নাহত মানুষের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। *নামহীন গোত্রহীন*(১৯৭৪) গল্পগ্রন্থে তিনি মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বিপন্ন দেশের আশাভঙ্গের ছবি অঙ্কন করেছেন সাবলীলভাবে। কেননা, 'জীবন রূপায়ণে হাসান নিস্পৃহ, নির্মোহ।'[৫] তাঁর সুঠাম গদ্য ও মর্মস্পর্শী বর্ণনাভঙ্গি মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাকে বাস্তবঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। যুদ্ধকালীন বিধ্বস্ত জীবন, বিপর্যস্ত মানুষের হতাশা, পাকবাহিনীর অমানবিক নির্যাতন, যুদ্ধ পরবর্তী আত্মগ্লানি ও স্বপ্নস্মৃতির পথ ধরে এ গল্পগ্রন্থের অবাধ বিচরণ। এ গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে অঙ্কিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র। বিশিষ্ট সমালোচক আবু জাফর তাই বলেন—'*নামহীন গোত্রহীন* গ্রন্থটিকে ইতিহাসও বলা চলে। এ-ইতিহাস বাঙালিদের উপর পাক সরকারের বর্বরোচিত আক্রমণের ইতিহাস [...] এতে স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা আছে, আছে ব্যর্থ-স্বাধীনতার তিক্ততম উপলব্ধি—এ সবই একাত্তরের শোকাবহ ঘটনারই অন্তর্ভুক্ত।'[৬] প্রথম গল্প 'ভূষণের একদিনে'র শুরুতেই পাওয়া যায় যুদ্ধের আভাস। লেখক জানিয়ে দেন 'সেই সময়টা এপ্রিল মাস'[৭] অর্থাৎ যুদ্ধের দামামা কেবল বেজে উঠেছে। শুরু হয়েছে বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের কদর্য হত্যাযজ্ঞ। এই হত্যাযজ্ঞের শিকার যারা হয়েছে তারা অধিকাংশই তাদের অপরাধ সম্পর্কে জানে না। দারিদ্র্যকে নিত্যসঙ্গী করে চলা ভূষণও তেমনি মল্লিক বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে যুদ্ধের কথা

শুনে বিস্ময় বোধ করে। এসময় গ্রামের ছেলেরা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে। তারা ভূষণকেও আহ্বান জানায়—'দেশ নিজের করে নাও ভূষণ- স্বাধীন করে নাও। পাকিস্তান আর রাখা যাচ্ছে না।'[৮] কিন্তু 'স্বাধীনতা' আসলে কী? তা বুঝে ওঠার আগেই তার পুত্র হরিদাস ও গ্রামের হাটের অসংখ্য মানুষ নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এই বীভৎস সময়ের সাক্ষী ভূষণ মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনকারী অগণিত মানুষের প্রতিনিধি। হাটে গিয়ে সে বুঝতে পারে পাকিস্তানি সৈন্যের আক্রমণে নিরীহ বাঙালি একেবারেই ছিন্নভিন্ন। সে প্রত্যক্ষ করে—'গুঁড়ি কেটে ফেললে গাছ যেমন তাড়াহুড়া না করে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ে, মানুষও তেমনি মাটিতে পড়ছে।' হতবিহ্বল ভূষণ যেদিকে চায় সেদিকেই দেখতে পায় বস্তার ওপর বস্তার মতো মানুষের উপর মানুষ স্তূপীকৃত হচ্ছে। লেখক অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরেছেন সেই নারকীয় দৃশ্য—

> চিৎকার করতে করতে মানুষজন তীব্রবেগে দৌড়ুতে দৌড়ুতে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কেউ মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে একবার নদীর দিকে তাকায়, তারপর তলপেটে চেপে মাটিতে বসে পড়ে আর রক্ত ছোটে কলকল ঝনঝন শব্দে। শানের মতো মসৃণ সাদা পথের উপর দিয়ে রক্ত এত দ্রুত গড়িয়ে যায় যে তাতে সাদা ফেনা দেখা যায়—কোথাও ঘাস ভিজে যায়—ডগায় রক্তের বিন্দু নিয়ে লম্বা ঘাস দুলতে থাকে। একভাবে কট্ কট্ কট্ কট্ শব্দ চলতেই থাকে। এখন বস্তার উপর বস্তার মতো মানুষের উপর মানুষ স্তূপীকৃত হয়—কেউ প্রবল বেগে হাত-পা নাড়ে, কারো চোখের পাতাটি শুধু কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে যায়। [...] শাক-সবজি ভর্তি বাজারের থলে কাঁধে নিয়ে কাৎ হয়ে এক-পা গুটিয়ে কেউ পড়ে থাকে, আশি বছরের বুড়ি বুলেটে চুরমার হয়ে যাওয়া বুক অগ্রাহ্য করে কোমরে ছেঁড়া কাপড়ের কষিটা আঁটবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।[৯]

জীবন বাঁচানোর জন্য শশব্যস্ত হয়ে লুকিয়েও রক্ষা পায়নি বৃদ্ধা, নারী কিংবা শিশু। 'পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে শিশু, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, নারী, পুরুষ কেউ রেহাই পায়নি। সবাই আতঙ্কের মধ্যে ছিল।'[১০] পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে- "ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী জেহাদের মালামাল এবং নারীরা তাদের জন্য 'হালাল।"[১১] তাই জেহাদের অজুহাতে এদেশের অসংখ্য নারীকে তারা ধর্ষণ করেছে। শুধু তাই

নয়, 'বেয়নেটের আঘাতে কারও কারও যোনী ও পেট চিরে দেয়, অঙ্গপ্রতঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে কেটে ফেলে মেয়েদের স্তন।'[১২] হাসান আজিজুল হকের গল্পে পাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সেই সত্যতা। তিনি বলেন—

> শেষে রক্ত-মেশানো সাদা মগজ বাচ্চাটার ভাঙা মাথা থেকে এসে তার মায়ের হাত ভর্তি করে দিলো। মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো, বাচ্চার মুখের দিকে চাইল, পাগলের মতো ঝাঁকি দিলো কবার—তারপর অমানুষিক তীক্ষ্ম চিৎকার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাচ্চাটাকে; দুহাতে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেললো তার ময়লা ব্লাউজটাকে। তার দুধে-ভরা ফুলে-ওঠা স্তন দুটিকে দেখতে পেল ভূষণ সে সেই বুক দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মার হারামির পুত, খানকির পুত—এইখানে মার। পরমুহূর্তেই পরিপক্ব শিমুল ফলের মতো একটি স্তন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।[১৩]

'নামহীন গোত্রহীন', 'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পেও উঠে এসেছে যুদ্ধকালীন নারী ধর্ষণ ও নারী নির্যানের চিত্র। 'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জামিলের দৃষ্টিতে লেখক তুলে ধরেছেন সেই অসহনীয় পরিস্থিতি। জামিল দেখতে পায়, 'মেয়েমানুষটি মরে পড়ে রয়েছে, তার যোনী বেয়নেট দিয়ে ছিন্নভিন্ন করা। যে দীর্ঘ কেশরাশি দিয়ে সে আবরণ তৈরি করতে চেয়েছিলো, তারই ফাঁকে ফাঁকে তার বিশাল নগ্ন নিতম্বদেশ জামিল দেখতে পায়—ফুটিফাটা লাল মাংসের ফাঁকে ফাঁকে সাদা চর্বিও তার চোখে পড়ে।'[১৪] ২৫শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি বাহিনী শহরে হামলার পর গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানেও চালায় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়, হত্যা করে শিশু ও বৃদ্ধকে, ধর্ষণ করে অসংখ্য নারীকে। এসময় লজ্জা আর আত্মগ্লানিতে বিহ্বল হয়ে 'অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।'[১৫]

যুদ্ধের শুরুর দিকে—এদেশের আপামর জনতা তখন বিনাশী পাকিস্তানি চক্রের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য তাদের অবিনাশী কণ্ঠে প্রতিরোধের জয়ধ্বনি তুলেছে। লেখক সেই প্রস্তুতিপর্বের চিত্র তুলে ধরেন, যখন বাংলার দামাল ছেলেরা এদেশের মৃত্তিকাস্পর্শী চাষিদেরকে নিয়ে একসাথে জেগে উঠতে চেয়েছে—

> তোমাদেরই তো অস্ত্র ধরতে হবে। তোমরাই তো ছ কোটি মানুষ আছো এদেশে—এই তোমরা যারা চাষী—জমিজমা চাষাবাস করো। আমাদের দেশটা

শুষে খেয়ে ফেললে শালারা। ভাল ভাল অস্ত্র দিয়ে ঢাকায় খুলনায় সব জায়গায় আমাদের মেরে মেরে শেষ করে দিলে। অস্ত্র না চালালে এখানেও আসবে ব্যাটারা। লুকিয়ে বাঁচবে ভেবেছ?[১৬]

বাংলার সাহসী সন্তানেরা লুকিয়ে বাঁচতে চায় না। তারা সাহসের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করে দেশকে স্বাধীন করতে চায় গল্পের শুরুতেই লেখক তার পূর্বাভাষ দেন ভূষণের মাধ্যমে। লেখক বলেন—

ভূষণের মনে পড়লো তার বাপ মরেছিলো সাপের কামড়ে, দুঘণ্টার মধ্যে মারা গিয়েছিলো। ভূষণ তার বাঘের মতো হাতের থাবায় বৈঠা ধরে একটি নিশ্চিত আঘাতে সাপটার কোমর ভেঙে দিলো। [...] আনন্দে আর আক্রোশে ভূষণের চৌকো মুখ গারদের লোহার দরজার মতো আটকে গেলো, তার চোয়ালের পাশে মাংসপেশি কাঁপতে থাকলো, চোখে এপ্রিলের সূর্য ঝিকঝিক করতে শুরু করলো।[১৭]

লেখক প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে দেখান যে, ভূষণের বাবা সাপের কামড়ে মারা গেলেও, ভূষণ সাপের ভয়ে ভীত নয়, বরং সে-ই সাপকে মেরে ফেলে। অর্থাৎ শত্রুরা আগেও আক্রমণ করেছিল, তখন দেশবাসী জীবন দিয়েছে কিন্তু এবার তারা শত্রুদেরকেই নিশ্চিহ্ন করবে।

নামহীন গোত্রহীন গল্পে ধরা পড়েছে যুদ্ধকালীন সংকট। এদেশে যখন বাঙালি হত্যার পাশবিক উল্লাস চলছে তখন নামহীন সেই লোকটা তার নিজের শহরে ফেরার পথে বাঙালি নির্যাতনের যে দৃশ্য দেখতে পায় তা সত্যিই ভয়াবহ। তার চিরচেনা সেই শহর আজ স্তব্ধ মৃতপ্রায়; সেখানে জীবনের স্পন্দন নেই। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ছাড়া সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও নেই। জনশূন্য পথে হেঁটে ভীত সন্ত্রস্ত লোকটা তার বন্ধু অসিতকে খুঁজতে যায়। কিন্তু ভীতবিহ্বল একটা মুখ উঁকি দিয়ে জানায় যে, এ বাড়িতে অসিত নামের কাউকে তারা চেনে না। পরিচিত মুখের খোঁজ সে পায় না কিন্তু অনেক দূরে রাইফেলের আওয়াজ পায়। পথিমধ্যে সে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের দৃশ্যও দেখতে পায়—

কয়েক মিনিট পরে গলি থেকে সে দেখতে পেল সামনের একতলা বাড়ির ছাদের দিকে কালো প্যান্ট পরা লোকটা উঠে যাচ্ছে। তার মাথা মাটির দিকে। পা দুটো

> একসঙ্গে বেঁধে একতলার ছাদের লোহার রডে দড়ি আটকে কপিকলের মত দড়িতে টান দিচ্ছে কয়েকজন সৈন্য। কালো প্যান্ট পরা লোকটার মাথা মাটি থেকে ফুট পাঁচেক উঠে গেলে একটি কণ্ঠ বলে, ব্যাস রোখো। [...] পাঁচ ফুট উপর থেকে প্যান্ট-পরা লোকটার মাথা শরীরের সমস্ত ওজনসহ বাঁধানো মেঝেয় এসে ঠুকে পড়ল। ঠাস করে একটি শব্দ উঠল—প্যান্ট-পরা লোকটা তার বুকের ভিতর থেকে বলল, আঃ। কালো প্যান্ট-পরা লোকটার গলা থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হয় সেই আওয়াজটাকেই কথায় পরিণত করে সে বলে, বাঙালি তুমলোগোকো খতম করেগা—আভি ভাগ যাও বাঙাল মুল্লুকসে—কথা শেষ হবার আগেই আবার সেই মাটিতে কাঁচা মাংস থ্যাঁতলানোর আওয়াজ।[১৮]

এই নিষ্ঠুর দৃশ্য অবলোকন করে সে নিজের বাড়িতে গিয়ে মুখোমুখি হয় আরেক নির্মম বাস্তবতার। পাকিস্তানি বাহিনী তার স্ত্রী মমতা ও পুত্র শোভনকে হত্যা করে মাটির নিচে পুঁতে ফেলেছে। পরম মমতায় মোলায়েম গলায় সে স্ত্রী ও পুত্রকে ডাকে কিন্তু সাড়া দেয়ার কেউ নেই। অবশেষে রক্তভেজা মাটির ভেতর থেকে সে স্ত্রী-পুত্রের দেহাবশেষ বের করে আনে—

> সে তার শিরাবহুল পেশল হাতে কোদাল তুলে নিল। দুবার তিনবার নাক আর মুখ থেকে হ্যাঁক হ্যাঁক করে আওয়াজ বের করে উঠোনে কোপ দিল সে। তারপর হেঁট হয়ে একটি পাঁজরের হার তুলে নিল হাতে। [...] খুঁজতে খুঁজতে একটি ছোট্ট হাত পেয়ে গেল, সেটাকে তুলে আপন মনেই লোকটা বলল, শোভন, শাবাশ। তারপর উঠে এলো দীর্ঘ চুলের রাশ, কোমল কণ্ঠাস্থি, ছোট ছোট পাঁজরের হাড়, প্রশস্ত নিতম্বের হাড়—তারপর একটি করোটি। খুলিটা হাতে নিয়ে সে ওটার চোখের শূন্য গহ্বরের দিকে চেয়ে রইল।[১৯]

এ গল্পে পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের পাশেই বাঙালির দুর্বার সাহস ও স্বদেশপ্রেমকে দেখানো হয়েছে। গল্পকার 'তাঁর যুদ্ধভিত্তিক গল্পগুলোকে শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকেই লেখেননি; বরং প্রতিটি নির্যাতিত বাঙালির মাঝে নিজেকে অনুধাবন করে আত্মিক অনুভূতি এ গল্পের আয়তনে সাজিয়েছেন।'[২০] এজন্যই তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে যুদ্ধকালীন জীবনেরই প্রতিরূপ।

হাসান আজিজুল হকের লেখার একটা বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি গল্পের ভিতরে আরেকটা গল্প বলেন, বাস্তবতার ভিতরে আর এক বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন-

'নামহীন গোত্রহীন' গল্পে নারী অপহরণের আলাদা একটা খণ্ডচিত্র পাই, মুক্তিফৌজকে মারার চিত্র পাই, আবার নামহীন সেই লোকটার স্ত্রী-সন্তানের দেহাবশেষ উদ্ধারের চিত্র পাই। কিন্তু এগুলো কেবল তাঁর অঙ্কিত চিত্র-ই নয়, যেন ইতিহাসের পাঁজর খুঁড়ে বের করা নির্মম নগ্ন বাস্তবতা—যে বাস্তবতায় তিনি খুঁজে ফেরেন নিজের শেকড়কে। আর এই শেকড়ের সাথে মিশে আছে বাঙালির যাপিত জীবনের কথা। লেখক আটপৌরে বর্ণনায় যুদ্ধদৃশ্যের পাশাপাশি সে সময়ের নিত্যদিনের চিত্রও তুলে ধরেন। সে চিত্র প্রাকৃতিক নিয়মের, জীবন ও যৌনতার, সমাজসত্য ও রাষ্ট্রসত্যের। যুদ্ধকালীন সময়ের পরিস্থিতি তুলে ধরতে গিয়ে লেখক বাঙালি জীবনের স্বভাবজাত ঔৎসুক্য ও উত্তেজনার চিত্র এঁকেছেন এভাবে—

> ওরা কি বোমা ফেলবে? লোকেরা বলাবলি করতে করতে বোকার মতো রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। দোকানগুলো বন্ধ না করেই দোকানদাররা বাইরে চলে আসে। মিষ্টির দোকানের ভুঁড়িঅলা ময়রা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক বুদ্ধুর মতো চর্বিদার ভুঁড়ি চুলকোয়। বাজারের খদ্দেররাও আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। প্লেন আক্রমণের সময় কিছুতেই রাস্তায় থাকতে নেই, উপরের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে নেই, কৌতূহল বা উত্তেজনায় ছুটোছুটি করতে নেই, এসব নিয়ে জনসাধারণকে বারবার সাবধান করা হয়েছে; [...] কিন্তু লোকেরা সব ভুলে গেল, হুড় হুড় করে সব বাইরে চলে এলো।[২১]

এরই পাশাপাশি লেখক দেখিয়ে দেন মানুষের চরিত্রের বৈপরীত্য, জীবনের বিভিন্ন রূপ। যেখানে সন্তানের লাশের পাশে বসে মানুষ আহার করে, যৌন আবেগে মিলিত হতে চায়। লেখকের ভাষায়—

> ছোট মেয়েটার নাম ছিলো অরুন্ধতী। এমন সুন্দর নাম নিয়ে সে মরে গেল কোনো সাড়াশব্দ না করে। [...] অসম্ভব খিদে বোধ করলো রামশরণ। [...] সব ভাত কি এখন ফেলে দেবে ভানুমতী? তাহলে তো মরা মেয়ের পাশে তাকেও জায়গা নিতে হচ্ছে আজ। [...] কিন্তু উঠে বসলো ভানুমতী, শানকি টেনে নিয়ে ভাত বাড়লো দুজনের জন্যে। [...] রামশরণ দেরি করলো না, নিজের কাছে একটা শানকি টেনে নিয়ে আর একটা এগিয়ে দিলো ভানুমতীর দিকে। [...] কচ করে কাঁচা মরিচ দাঁতে কেটে নেয় রামশরণ, হু হু করে মুখে জল চলে আসে–কন্যাশোক ভুলে গিয়ে খুব মন দিয়ে ভাত খেয়ে যায় সে।[২২]

হাসান আজিজুল হক সাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে অসাধারণত্বকে তুলে ধরেন। তাঁর সেই অসাধারণত্ব একজন সংবেদনশীল মানুষের ব্যথিত শিল্পীহৃদয় থেকে উত্থিত। তাই তাঁর হাতের ছোঁয়ায় মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনাগুলো হয়ে উঠেছে চিত্রময়। 'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পে পাই এরূপ চিত্রময়তার দৃষ্টান্ত। সে সময় দেশের সর্বস্তরের মানুষ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় শত্রুসেনাকে ঘায়েল করতে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। 'এটি ছিল জনযুদ্ধ। সাধারণ, অতি সাধারণ কৃষক, মজুর, জেলে, কামার, কুমার, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিল্পী, ছাত্র-ছাত্রী, কন্যা, স্ত্রী এমনকি বয়স্ক নারী-পুরুষও সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন;'[২৩] 'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জামিল, কলেজছাত্র শহীদ, স্কুলছাত্র একরাম, ক্ষেতমজুর মতিয়ুর, চাষি রহমান প্রত্যেকেই হাতে হাত রেখে মিলিত হয়েছে অস্ত্র হাতে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। খেলনা বল আর কলম ধরার বদলে শক্ত মুঠিতে অস্ত্র ধরেছে স্কুলছাত্র একরাম। হয়তো স্বাধীনতা কী জিনিস এটাই সে জানে না! তবুও অবুঝ বালক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ—কেউই রক্ষা পায়নি সেসময়। স্বাভাবিক মৃত্যুও জোটেনি তাদের ভাগ্যে। পাকিস্তানি পিশাচরা হত্যা করেছে আর দাফনের বদলে শকুনরা তাদেরকে গলাধঃকরণ করেছে। জামিল তার পিতার মৃত্যুদৃশ্যের এমনই এক বীভৎস বর্ণনা দিয়েছে—

> আমি নিজের চোখে দেখেছি, জামিল বলে, আমার বাবার লাশ তিনটে শকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে। একটা বসেছিল তাঁর পেটের ওপর। পেটের গর্তের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে সাপের মতন ঘাড় নাড়িয়ে নাড়িয়ে নাড়িভুঁড়ি টেনে টেনে বের করছিলো। আর একটা মাটিতে বসে চোখ উপড়ে খাচ্ছে। তিন নম্বরটা মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো বুকের খাঁচায়। আশেপাশে অনেকগুলো চ্যাঁচাচ্ছিলো তখন।[২৪]

কেউ কেউ আবার স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে জীবনের ভার বহন করতে না পেরে বীভৎসতা থেকে রক্ষা পেতে মৃত্যু কামনা করেছে—'মতিয়ুর তার উপর ঝুঁকে বললো, কি চাও ও জ্যাটা, কি চাও? তেমনিই পলকহীন চেয়ে রইল সে। [...] জামিল তার মুখে কান নিয়ে এক অমানুষিক কণ্ঠ শুনতে পায়, আমারে মারে ফ্যালাও বাবারা। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবে।'[২৫] এমন অসংখ্য ঘটনা দেখেও এই তেজোদীপ্ত প্রাণগুলো অটুট ও অপরাজেয় মনোবল নিয়ে জীবনের গান গেয়ে যায়—যে গান মুক্তির আর স্বাধীনতার। তাই কখনো কখনো তাদের বক্তব্যে ফুটে ওঠে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা

আর সীমাহীন ক্রোধ। রহমানের ভাষায়—'মওতের জন্য মুক্তিযুদ্ধে আইছি, বাঁচবার জন্য না। আমি মানি না যে বাঁচা লাগবই। থু মারি মোর জীবনে।'[২৬] যেখানে জীবিত থেকেও মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় প্রতিনিয়ত, সে জীবন চায় না রহমান। সে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যে, হয় সে মৃত্যুকে গ্রহণ করবে নতুবা দেশকে স্বাধীন করবে। তবে কখনো কখনো তারা আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। 'মতিয়ুর একমনে থালাভর্তি গরম ফ্যান-মাখানো ভাতের স্বপ্ন দেখতে থাকে। গত জন্মের সুখস্মৃতির মতো মনে হয়।'[২৭] কিন্তু তারা বিবেকের কাছে বন্দী। তাই আবেগের বেগকে নিয়ন্ত্রণ করে আবারও পরম উৎসাহে জেগে ওঠে ক্ষুধার্ত, জীর্ণ দেহ নিয়েও। কেননা তারা তখন কেবলমাত্র লড়াকু যোদ্ধা। তাদের কাছে লড়ে যাওয়া মানে—'সবসময় লড়ে যাওয়া—বন্দুক যখন চালাচ্ছি এবং যখন চালাচ্ছি না তখনো লড়ে যাওয়া— যখন হাঁটছি, ঘুমোচ্ছি বা কথা বলছি, তখনও, তখনও—একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়া।'[২৮] তারা চেয়েছিল শত্রুসেনাদের হাত থেকে রক্ষা করে এদেশকে তুলে দিবে গণমানুষের হাতে। আর এজন্য তারা যেমন পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তেমনি তাদের সাহায্যকারী রাজাকারদেরকেও নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে।

'আটক' গল্পে পাই এসব রাজাকারের সন্ধান। 'রাজাকাররা থ্রি নট থ্রি রাইফেল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাচ্ছে প্লেন লক্ষ করে।'[২৯] ভারতের সহায়তায় যুদ্ধবিমান যখন পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে আক্রমণ করে তখন দেশি রাজাকারেরা এসব যুদ্ধবিমানকে পাল্টা আক্রমণ করে। 'আটক' গল্পে উঠে এসেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিন আগের ঘটনা। এসময় ভারতের সহায়তায় যুদ্ধবিমান পাকসৈন্যদেরকে আক্রমণ করায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে, পালাবার পথ খুঁজে পায় না। যারা একসময় ছিল পাশবিক শক্তিতে নিষ্ঠুরতা আর নির্মমতার প্রতীক, তাদের চেহারা হয়ে পড়েছে মেরুদণ্ডহীন কেঁচোর মতই। লেখকের ভাষায়—

> কিন্তু সেই সব মুখে নেই ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধির ছাপ। অত্যন্ত স্থূল নির্বুদ্ধিতা সেই ঝকমকে চেহারায় সেঁটে আছে আর রয়েছে এক ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা। এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলতে বাধ্য হতে হয় যে এই মুখে রয়েছে এমন এক পাশবিকতার দেয়াল যেখানে মহত্তম মানবিক প্রবৃত্তি, করুণতম আবেদন বা যন্ত্রণার চূড়ান্ত স্তরের আর্ত চিৎকার মাথা কুটে মরলেও কোনো চিড় ধরাতে পারবে না।[৩০]

একসময় যারা নির্বিচারে বাঙালিদেরকে হত্যা করেছে তাদের 'কেউ কেউ বন্দুক মাটিতে নামিয়ে রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে। কিছু ইতস্তত ঘুরছে মুরগি যেমন আঁস্তাকুড়ের মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়ায় ঠিক তেমনি করে। [...] সৈন্যরা বিষণ্ন আর সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছে। ভারি ভারি চেহারার অফিসাররা বিব্রত ও হতভম্ব।'[৩১] এখানে পাকিস্তানিরা যেমন আটক হয়েছে সময় ও পরিস্থিতির হাতে, তেমনি দুই দেয়ালের মাঝে আটকে পড়া যুবকের মতো এই রাষ্ট্রও যেন আটকে পড়েছে। সেই যুবকের বন্দিদশা যেন বিধ্বস্ত দেশেরই চিৎকার। যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাধারণ মানুষ, জীবনের নিকট যেন তারাও আটক।

যুদ্ধের সেই অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে অবশেষে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বাঙালির এই বিজয় একইসাথে আনন্দ আর বেদনা নিয়ে আসে। জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি গ্রন্থে* উঠে এসেছে সেই বেদনামিশ্রিত আনন্দের চিত্র। 'সারা ঢাকার লোক একই সঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে। স্বাধীনতার জন্য হাসি। কিন্তু হাসিটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। এত বেশি রক্তে দাম দিতে হয়েছে যে কান্নার স্রোতে হাসি ডুবে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে।'[৩২] তথাপি অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা বাঙালির দু'চোখে বুনেছিল সোনালি স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে যায় অচিরেই। যুদ্ধপরবর্তী স্বদেশে এক শোষকের উৎখাত ঘটলেও হাজারও নতুন শোষকের জন্ম হতে থাকে। স্বাধীনতা এক শ্রেণির জন্য বিত্তের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা নিয়ে এলেও সাধারণ মানুষ যারা যুদ্ধে সর্ববৃহৎ ভূমিকা রেখেছিল তাদেরই ঘটে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিরোধ। হাসান আজিজুল হক সেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ঢেলে দিয়েছেন তাঁর 'ঘরগেরস্থি' গল্পে। স্বাধীন দেশে ফিরে এসে আবারো সুখের সংসার সাজানোর পরিকল্পনা ছিল ভানুমতীর। লেখকের ভাষায়—'বাংলাদেশের বউ ভানুমতী, কতোদিন ধরে সংসার করছে—কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার! সে কি জানে না কেমন হতে হয় সুখের সংসার? গোয়াল, গাই-গরু, হাল-বলদ, জমি-জমা, পুকুরভর্তি মাছ আর গোলাভরা ধান দূরস্থিত স্বপ্নের মতো ভানুমতীকে প্রচণ্ড আকর্ষণে টানে।'[৩৩] কিন্তু ফিরে এসে যখন তারা আপন ভিটের ভগ্নাবশেষটুকুও খুঁজে পাচ্ছিল না তখনই বেদনায় দীর্ণ হয়ে যায় তাদের স্বপ্নদেখা চোখ দুটো। স্বাধীনতা তাদের কাছে পরিণত হয় অর্থহীন বুলি, পরিহাস ও বঞ্চনার ইতিহাসে।

একটা নতুন স্বাধীন দেশের প্রতীক্ষায় তারা বুক বেঁধেছিল কিন্তু আজ সেই স্বাধীন দেশের অবয়ব যেন তাদের মনে ঘৃণা তৈরি করেছে—'স্বাধীন হইছি আমরা—ঘৃণায় আর রাগে রামশরণের গলার আওয়াজ চিড় খেয়ে গেল, স্বাধীন হইছি তাতে আমার বাপের কী? আমি তো এই দেহি, গত বছর পরানের ভয়ে পালালাম ইন্ডেয়—নটা মাস শ্যাল কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার।'[৩৪] এটা শুধু রামশরণেরই যাতনা নয়, অসংখ্য বাঙালির মর্মযাতনার প্রতিধ্বনি। এ প্রসঙ্গে আজহার ইসলাম বলেন—'রামশরণের এই বেদনাবিদ্ধ স্বর কত অসহায়ের স্বরের সাথে যুক্ত হয়েছে কে তার খবর রাখে?'[৩৫] এই অসহায় মানুষগুলো যুদ্ধের সময় সবকিছু ছেড়ে কেবল প্রাণ নিয়ে ভারতে চলে যায়। মৃত সন্তানের সৎকারের পরিবর্তে শেয়াল-কুকুরের কাছে রেখে আসে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তাদের দুর্দশার অবসান হয় না। ছোটকন্যা অরুন্ধতীর লাশকে পাশে রেখেও তারা স্বাভাবিক জীবন চালাতে বাধ্য হয়। রামশরণ ও ভানুমতীর মতো অনেক পরিবারই সে সময় ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছিল এবং যুদ্ধ শেষে দেশে এসে দু'মুঠো অন্ন, বস্ত্র এমনকি ভিটেমাটিও খুঁজে পায় না। তখন তাদের মনে প্রশ্ন জাগে—'স্বাধীন হইছি না কি হইছি আমি বোঝবো কেমন করে? আগে এট্টা ভিটে ছিলো, এখন তাও নেই। আমি স্বাধীনটা কিসি?'[৩৬] স্বাধীন দেশেও সাধারণ জনগণ এই নির্মমতা পেরিয়ে সত্যিকারের মুক্তি পায়নি। তার কারণ, আমরা জানি ১৯৭১ সালের যুদ্ধের বিভীষিকা কেবল এদেশের লক্ষ লক্ষ প্রাণ কেড়ে নেয়নি; এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, প্রশাসনিক অবকাঠামোসহ দেশের মূল চালিকাশক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। 'কলকারখানা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি, রাস্তা-ঘাট, সড়ক-সেতু ও রেলসেতুসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, শিক্ষা, উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থা সবই কমবেশি অচল হয়ে পড়েছিল।'[৩৭] আর তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা দেয় তীব্র সংকট। হাসান আজিজুল হকের এ গল্পে উঠে এসেছে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতির ভঙ্গুর অবস্থা ও বিপন্ন মানুষের জীবন বাস্তবতার চিত্র। যে আশা নিয়ে স্বাধীনতাকামী মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, সেই আশাভঙ্গ হওয়ায় তাদের মনে তীব্র ক্ষোভ জন্ম নেয়—'স্বাধীনটা কি, আঁ? আমি খাতি পারলাম না—ছোওয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনটা কোঁয়ানে? রিলিফের লাইনে দাঁড়াও ফহিরের মতো—ভিক্ষে করো লোকের বাড়ি বাড়ি।'[৩৮] একইভাবে স্বাধীনতার অর্থ খোঁজে 'কেউ আসেনি' গল্পের যুদ্ধফেরত আসফ আলি—

দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে সাহস আর শক্তির সাথে সাথে যে কি না আপন দেহের অংশ এমনকি শেষ পর্যন্ত জীবনটাই দিয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে গফুরের সঙ্গে তার অন্তিম কথোপকথন—

> দ্যাশ স্বাধীন হলি কি হয়? আসফ আলি বোকার মতো জিগ্যেস করে। এতদিন ধরে শুনতিছো না কি হয়? না জানলি যুদ্ধে গিইলে ক্যানো? কই, কেউ তো এসে আমারে কলো না যে দ্যাশ স্বাধীন হইছে। কেউ তো কলো না এখন কি হবে?[৩৯]

যুদ্ধফেরত গফুর জীবিকা নির্বাহের উপায় নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে। 'সব হবে' বলে সে নিজের চিন্তাকে প্রসারিত করলেও বাস্তবে কিছুই হয় না। 'যুদ্ধের আগে সে কামলা খাটতো। এখন সে বাড়ি গিয়ে কি করবে। দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেল! [...] সে কি আবার গিয়ে কামলা খাটবে রাইফেল খাকি-টাকি সব ফেরত দিয়ে? নাকি অন্য ব্যবস্থা কিছু হবে?'[৪০] এই প্রশ্ন তৎকালীন হাজারো যুদ্ধফেরত বাঙালির।

'ফেরা' গল্পের আলেফ যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তার মায়ের মনে স্বপ্ন তৈরি হয় ছেলে এবার জমিজমা, গাইগরু আর বলদ কিনবে। যুদ্ধফেরত আলেফকে সরকার নিশ্চয়ই ডাকবে। আলেফের বউয়ের কাছেও দেশ স্বাধীন হওয়া মানে 'আমাদের দুঃখু কষ্ট আর থাকবে না।'[৪১] কিন্তু স্বাধীন দেশে কর্মহীন বেকার আলেফের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অন্নের সংস্থান করতে পারবে কিনা এ নিয়ে তার মনে সংশয় জাগে। 'কয়েকদিনের মধ্যেই আলেফ বুঝতে পারে রাইফেল নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর কোনো মানে নেই। ইতিমধ্যে তার মতো অনেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে রাইফেল ঘাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'[৪২] একদিন খবর প্রচারিত হয় 'তিনদিনের মধ্যে যার যেখানে যত রাইফেল বা যুদ্ধের অন্য অস্ত্র আছে সরকারের কাছে জমা দিতে হবে।'[৪৩] কিন্তু আলেফ বুঝতে পারে দেশগড়ার কাজ তখনও শেষ হয়নি। দেশ তখনো পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয়নি। অভ্যন্তরীণ অশুভ শক্তি, পাকিস্তানিদের দালাল, রাজাকারদের ঘৃণ্য তৎপরতা থেকে দেশ তখনও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তথাপি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সদ্য স্বাধীন দেশকে আপন শক্তিতে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করেনি বরং বাধাগ্রস্ত করেছে বিভিন্নভাবে। আর তাই বীর মুক্তিযোদ্ধা আলেফ আলি বন্দুকটা জমা না দিয়ে নিজের কাছেই রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে—যেন বা যুদ্ধ শেষ হয়নি। দেশ গড়ার যুদ্ধে অচিরেই অবতীর্ণ হতে হবে তাকে। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক গল্পের শেষদিকে আশ্চর্য শিল্পকুশলতায় তুলে ধরেন সে দৃশ্য— 'আলেফ রাইফেল হাতে বাড়ির পিছনে ডোবার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর গায়ে

যত জোর আছে সব দিয়ে রাইফেলটা ডোবার মাঝখানে ছুঁড়ে দেয়। বাড়ির দিকে ফিরে আসতে আসতে আলেফ ভাবে, ডোবাটা ছোটো—রাইফেলটা খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হবে না।'[৪৪] সদ্য স্বাধীন দেশকে নতুনভাবে গড়তে এভাবে খণ্ড খণ্ড আন্দোলন গড়ে ওঠে। সাহিত্যিকরাও সেই আন্দোলনে শামিল হন তাঁদের সাহিত্য নিয়ে। কেননা, 'যুদ্ধোত্তর সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, সর্বব্যাপী হতাশা, নৈরাজ্য এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পীমানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্য সদর্থক ও আলোকোজ্জ্বল এক মানস-ভূমি।'[৪৫] যুদ্ধকালীন সময়ে কিংবা স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর এদেশের মানুষ আপন সত্তা দিয়ে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা অনুভব করেছে তার প্রভাব সাহিত্য ও সাহিত্যিক মানসেও প্রতিফলিত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি *নামহীন গোত্রহীনের* মতো অসংখ্য গ্রন্থ যা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধেরই দলিল।

'স্বাধীনতার জন্য প্রাণের আবেগ যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীর যত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেই আবেগের কাছে তা তুচ্ছ হয়ে যায়।'[৪৬] ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতিকে সংগ্রামী ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছে। তাদের চেতনার জগতে সংযুক্ত করে দিয়েছে নতুন ভাবনা, তাদের জাতীয়তাবোধকে করেছে শানিত, তাদের সাহসী সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। 'স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত নবলব্ধ-চেতনা এবং বাঙালির সংগ্রামী চেতনার মিলিত প্রবাহ এদেশের সাহিত্যজগতেও যোগ করেছে নতুনতর মাত্রা। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ এক অনিবার্য উপাদান।'[৪৭] হাসান আজিজুল হক এই অনিবার্য উপাদানকে বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জাতি বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অমানবিক নির্যাতন, পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়, অত্যাচার-নির্যাতন আর শোষণ থেকে বাঁচার জন্য, সর্বোপরি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতিকে নির্মূল করার যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল তার বিপরীতে এক শক্তিশালী স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর 'নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিকূলতার আবর্তে বাংলাদেশের মানুষের জীবন কয়েক বছরের মধ্যেই আবার দ্বন্দ্ব-সংকুল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন মূল্যবোধের সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর মূল্যবোধের বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। আবার হতাশায় আক্রান্ত হয় সমাজজীবন।'[৪৮]

সমাজমনস্ক লেখক হাসান আজিজুল হক স্বাধীন বাংলাদেশের এই ভগ্নরূপ ও জনজীবনের দীর্ণ অবস্থা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর *পাতালে হাসপাতালে*(১৯৮১) গল্পগ্রন্থে। '*পাতালে হাসপাতালে* গল্পগ্রন্থে সদ্য-স্বাধীন দেশে নৈরাজ্যকর বিশৃঙ্খলা, সীমাহীন দারিদ্র্য, সামাজিক- রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক সরকারের স্থলাভিষিক্ত সামরিক সরকারের প্রহসনমূলক মেকি-জনকল্যাণকর কর্মসূচি প্রণয়ন প্রভৃতি অনুষঙ্গ বিধৃত হয়েছে।"[৪৯] এছাড়াও তাঁর *আমরা অপেক্ষা করছি*(১৯৮৯) গ্রন্থেও স্বাধীন দেশে শোষণহীন সমাজ গঠনের ব্যর্থ প্রচেষ্টার চালচিত্র ফুটে উঠেছে। '১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা–শরণার্থী সমস্যা, মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সেনা ও তার দোসর বাহিনীর নারকীয় যজ্ঞ ও অমানুষিক বর্বরতা, দুর্ভিক্ষ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিজনিত হতাশা [...] মনোবিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয় তাঁর গল্পে নিপুণভাবে চিত্রিত।'[৫০] এভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সামগ্রিক চিত্র পাই আবুজাফর শামসুদ্দীনের(১৯১১-১৯৮৮) *ল্যাংড়ী*(১৯৮৪), আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের(১৯৪৩-১৯৯৭) *খোঁয়ারি*(১৯৮২), শওকত ওসমানের(১৯১৭-১৯৯৮) *জন্ম যদি তব বঙ্গে*(১৯৭৫), *তিন মির্জা*(১৯৮৬), আলাউদ্দিন আল আজাদের(১৯৩২-২০০৯) *জীবনজমিন*(১৯৮৮), সেলিনা হোসেন(জ. ১৯৪৭)-এর *পরজন্ম*(১৯৮৬) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে।

হাসান আজিজুল হক মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাসকে বিষয় করে তাঁর *নামহীন গোত্রহীন* গল্পগন্থে যেন বাঙালি জাতির জীবনের মহাকাব্যিক আখ্যান রচনা করেছেন। তাঁর গভীরতর জীবনদৃষ্টি ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোর প্রতিচ্ছবি। তাঁর প্রজ্ঞাশাসিত মনন আবেগের আতিশয্য থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধিদীপ্ত বিবেক দিয়ে জীবনকে চিত্রায়িত করেছে। যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়াবহতার মাঝেও উঠে এসেছে মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক, জীবনের নানামাত্রিক সংকট, বিবেকবান মানুষের আত্মোপলব্ধি-অন্তর্যাতনা, যুদ্ধফেরত মর্মাহত মানুষের দেশ গঠনের তাগিদ ও স্বপ্নভঙ্গের যাতনা। লেখক নিজের প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই গল্পগুলো রচনা করেছেন। এগুলোতে তাই প্রতিফলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সংকট-সম্ভাবনা ও স্বাধীনতা পরবর্তী স্বাদেশিক রূপ।

তথ্যনির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, *মুক্তিযুদ্ধের গল্প*, আবুল হাসনাত সম্পা.(ঢাকাঃ সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৯৫), ভূমিকা
২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের উপন্যাসঃ মুক্তিযুদ্ধের বর্ণমালা', সালমা ইসলাম সম্পা., সাহিত্য সাময়িকী, *যুগান্তর*, ঢাকা, ২০ মার্চ ২০০৯, পৃ. ১৭
৩. আয়েশা বেগম, 'পঁচিশ বছরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য', *একুশের প্রবন্ধ-৯৬*(ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ১৫৯
৪. মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা, 'হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসঃ মানবিকতা ও সামগ্রিকতার শিল্পভাষ্য', সিদ্দিকা মাহমুদা সম্পা., *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৫০, সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৬৩
৫. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*(ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ১৮৫
৬. আবু জাফর, *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*(ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৯১
৭. হাসান আজিজুল হক, *নামহীন গোত্রহীন*(ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ০৯
৮. তদেব, পৃ. ১১
৯. তদেব, পৃ. ১৬-১৭
১০. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*(ঢাকাঃ বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৯), পৃ. ৬৭
১১. গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপরঃ একটি নির্দলীয় ইতিহাস*(ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ৮৪
১২. এম এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী*(ঢাকাঃ তাম্রলিপি, ২০০৮), পৃ. ৩০
১৩. হাসান আজিজুল হক, *নামহীন গোত্রহীন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
১৪. তদেব, পৃ. ৪১
১৫. কামরুদ্দিন আহমদ, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও অতঃপর*(ঢাকাঃ ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ২০০৯), পৃ. ১১৮
১৬. হাসান আজিজুল হক, *নামহীন গোত্রহীন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
১৭. তদেব, পৃ. ১৪
১৮. তদেব, পৃ. ২৬-২৭
১৯. তদেব, পৃ. ২৮
২০. জীনাত শারমিন, *হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পঃ বিষয় ও শিল্পরূপ*(ঢাকাঃ আজকাল প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ১০৪
২১. হাসান আজিজুল হক, *নামহীন গোত্রহীন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
২২. মতিউর রহমান, প্রকাশক, *একাত্তরের চিঠি*(ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় সং. মে ২০১৯), সবিনয় নিবেদন

২৩ হাসান আজিজুল হক, *নামহীন গোত্রহীন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
২৪ তদেব, পৃ. ৪২
২৫. তদেব, পৃ. ৩৯
২৬. তদেব, পৃ. ৪৪
২৭. তদেব, পৃ. ৪৫
২৮. তদেব, পৃ. ৫৭
২৯. তদেব, পৃ. ৫৫
৩০. তদেব, পৃ. ৫৬
৩১. জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*(ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী, উনত্রিংশ মুদ্রণ ২০১২), পৃ. ২৭০
৩২ তদেব, পৃ. ৬৬
৩৩. তদেব, পৃ. ৭১
৩৪ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৩৭০
৩৫. হাসান আজিজুল হক, *নামহীন গোত্রহীন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৩৬. গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩
৩৭. হাসান আজিজুল হক, *নামহীন গোত্রহীন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৩৮. তদেব, পৃ. ৮০
৩৯. তদেব, পৃ. ৭৭
৪০. তদেব, পৃ. ৯১
৪১. তদেব, পৃ. ৯২
৪২. তদেব, পৃ. ৯৩
৪৩. তদেব, পৃ. ৯৪
৪৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*(ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১২৪
৪৫. মতিউর রহমান, প্রকাশক, *একাত্তরের চিঠি*, পূর্বোক্ত, সবিনয় নিবেদন
৪৬. রিষিণ পরিমল, 'সুফিয়া কামালের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ', প্রফেসর মোঃ হারুন-অর-রশীদ সম্পা., *সাহিত্যিকী*, ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, পৃ. ১০২
৪৭. শাহীদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ২০৩
৪৮. মাখন চন্দ্র রায়, 'বাংলাদেশের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ(১৯৮১-১৯৯০): অভিঘাত ও উত্তরাধিকার', Professor Dr. Syed Mohammad Kamrul Ahsan (Editor), *The Jahangirnagar Review*, Part-C, Vol- XXIV, June 2013, P. 110
৪৯. সরিফা সালোয়া ডিনা, *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প: বিষয় ও প্রকরণ*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০), পৃ. ৩৬

সাহিত্যিকী
দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ | জুন ২০২২ | বাংলা বিভাগ
পৃষ্ঠা : ৮৭- ১০৮ | শব্দসংখ্যা ৪৫৬১ | ISSN: 1994-4888 | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা উপন্যাসে 'আধুনিকতা' ও শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি*

সঞ্জয় বিক্রম*

Abstract

Doubts about the definition of 'modernity' are very old. In many cases, however, it has been adopted in parallel with 'innovation'. Nevertheless, 'modernism' has a special ideology. The 'modernity' of history and literature has taken place at different times. But the beginnings of 'modernity' in the subcontinent, in history and literature, occur simultaneously. In Bengali novels, 'modernity' again refers to the creation after a particular period and with special features. Although Shawkat Osman is considered a 'modern' writer, his slave's humorous

* সহকারী অধ্যাপক | বাংলা বিভাগ | শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
ই-মেইল: sanjoybikrom@gmail.com

novel cannot be called a 'modern novel' in terms of conventional 'modernity'. Needless to say, the use of symbol-metaphor has to be accepted as the main criterion of 'modernity'. Otherwise, the smile of a slave has to be accepted as a new addition to 'modernity' in Bengali novels.

সারসংক্ষেপ

'আধুনিকতা'র সংজ্ঞার্থ নিয়ে দ্বিধা বহু পুরনো। তবে এটি অনেক ক্ষেত্রেই 'নতুনত্বে'র সমান্তরালে গৃহীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও 'আধুনিকতাবাদ' একটি বিশেষ আদর্শ ধারণ করে আছে। ইতিহাস ও সাহিত্যের 'আধুনিকতা' ভিন্ন কালে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু উপমহাদেশে 'আধুনিকতা'র সূচনা, ইতিহাস ও সাহিত্যে, সমকালে সংঘটিত হয়। বাংলা উপন্যাসে 'আধুনিকতা' আবার এক বিশেষ কালপর্বের পরবর্তী এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৃষ্টিকর্মকে নির্দেশ করে। শওকত ওসমানকে 'আধুনিক' লেখক হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, তাঁর *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসকে প্রচলিত 'আধুনিকতা'র মানদণ্ডে ঠিক 'আধুনিক উপন্যাস' বলা যায় না। যদি বলতেই হয়, তাহলে প্রতীক-রূপকের ব্যবহার-নৈপুণ্যকে 'আধুনিকতা'র প্রধান মাপকাঠি হিসেবে মেনে নিতে হয়। নতুবা বাংলা উপন্যাসে 'আধুনিকতা'র এক নব সংযোজন হিসেবে *ক্রীতদাসের হাসিকে* গ্রহণ করে নিতে হবে।

সংকেত-শব্দ

আধুনিকতা, রেনেসাঁস, বুদ্ধির মুক্তি, আইয়ুব খান, মেহেরজান, ঝাড়ুদার গ্রন্থকার

মূল-প্রবন্ধ

'আধুনিকতা' একটি প্রপঞ্চ। সুনির্দিষ্ট কোনো বোধে এটি আবদ্ধ নয়। ভিন্ন কালে ভিন্ন মনীষার কাছে এটি নতুন নতুন তাৎপর্যে গৃহীত হয়েছে। ইতিহাসের 'আধুনিকতা' আর সাহিত্যের 'আধুনিকতা'র মধ্যে কালগত ব্যবধান রয়েছে। রয়েছে গুণগত ফারাকও। এই দুই 'আধুনিকতা'কে গুলিয়ে ফেললে এ-নিয়ে দ্বিধা আরও প্রকট হয়। তবে বাংলা অঞ্চলে ইতিহাস এবং সাহিত্যে

আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল সমকালে। এ অঞ্চলে এই 'আধুনিকতা' আবার ভিন্নভাবে হাজির হয়েছে—ঐতিহাসিক কিংবা সাহিত্যিক দুই ক্ষেত্রেই। বাংলায় রেনেসাঁস ঘটেছিল উনিশ শতকে। আবার এই উনিশ শতকের সূচনায় বাংলা সাহিত্যের 'আধুনিক যুগ' শুরু হয়েছিল বলে প্রচলিত মত মিথে পরিণত হয়েছে। প্রচলিত মতে, বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চাকে এক্ষেত্রে নিয়ামক ধরা হয় এবং এ-অনুসারে প্রথম সার্থক উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) লিখতে বাঙালির আরও অর্ধশতাধিক কাল লেগে যায়। উপন্যাসই তো 'আধুনিক' সৃষ্টি। তাহলে 'আধুনিক উপন্যাস' আবার কী? তার স্বরূপ লক্ষণই-বা কী? আর এই প্রেক্ষাপটে শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি*(১৯৬২) উপন্যাস কোনো অর্থে কতটা 'আধুনিক', এই প্রবন্ধে তারই তত্ত্ব-তালাশ করা হয়েছে।

এক

Modern বা 'আধুনিক' অভিধাটি 'নতুনত্বে'র সাথে খণ্ডিত অর্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অভিধাটির পূর্ণ সংজ্ঞার্থ দেয়া সম্ভব নয়, কেননা এটি নিয়ত পরিবর্তনশীল। এথেন্সের কবিতা ও নাটক নিয়ে আলোচনা করার সময় অ্যারিস্টেটল এগুলোকে 'আধুনিক' বলে অভিহিত করেছিলেন। ইতালিতে ঐতিহাসিক রেনেসাঁস(Renaissannce) বা নবজাগরণ ঘটেছিল পনের শতকের শুরুর দিকে। এটিকেই আধুনিক যুগের সূচনা বলে মনে করা হয়। ধর্মের পরিবর্তে মানবতাবাদের উত্থান এ-যুগের প্রথম শর্ত। এর আগের শতকের কবি পেত্রার্কের(Francesco Petrarca: ১৩০৪-১৩৭৪) কবিতায় মানবতাবাদের উচ্চারণ ছিল বলে, তাঁকে মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। সে অর্থে তিনি রেনেসাঁ তথা 'আধুনিকতা'রও আদি পুরুষ বটে। ক্লাসিক্যাল গ্রিক ও রোমান সভ্যতার প্রতি অনুরাগ এবং নতুন করে ঐতিহ্যকে বিচার করার প্রবণতা, অদৃশ্য ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষের প্রাধান্য, রেনেসাঁসের মৌল ভিত্তি ছিল। অন্যভাবে বললে এটি ছিল মূলত 'বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলন'। উক্ত শিরোনামে সংগঠিত হয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ঢাকাকেন্দ্রিক একদল তরুণ যুবক বাঙালি মুসলমানদের নতুন করে জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। ইতালি হয়ে রেনেসাঁ বাংলাদেশে আসতে সময় নিয়েছে পাঁচশ বছর।

ইতালির রেনেসাঁসের যৌবন অতিক্রান্ত হওয়ার পর, ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপে রেনেসাঁসের জোয়ার আসে। ১৮৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার এর পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছিল। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উৎকর্ষের ফলে তাঁদের কাছে নবমূল্যায়ন গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নের চেয়ে তাঁদের কাছে মানবতাবাদ, দেশপ্রেম ও চিন্তার মুক্তি প্রাধান্য পেয়েছিল। মানবতাবাদ এ সময়ে কতটা বিস্তার লাভ করেছিল, Sir Thomas More(১৪৭৮-১৫৩৫)-এর *Utopia*(১৫১৬) ও Francis Bacon(1561-1626)-এর *Novum Organum*(1620) তার বড় প্রমাণ। *Utopia*-তে এমন একটি দ্বীপের কল্পনা করা হয়েছে, যেখানের সমস্ত মানুষ আদর্শ চরিত্রের অধিকারী, সাম্যবাদী, যুদ্ধ-বিমুখ, সকল ধর্মে সহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগে বিশ্বাসী। এই ধারাই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল কথা। তবে ধর্মের চেয়ে দেশপ্রেমকে বড় করে দেখার প্রতি তাঁদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এই 'দেশাত্মপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরাজ নাবিকেরা পৃথিবীর নূতন নূতন অংশ আবিষ্কারে বেরিয়েছিলেন।'[১] বিশ্বব্যাপী উপনিবেশায়ন এই বোধেরই পরিবর্তিত রূপ, যা তাঁদের কাছে দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। ইতালির রেনেসাঁস থেকে এভাবেই ইংল্যান্ডীয় রেনেসাঁস আলাদা চেহারা ধারণ করে। সাহিত্যে মানবতার কথা বলা হল, আর দেশপ্রেমের জন্য তাকে ভোলাও গেল। নিজ দেশকে সমৃদ্ধ করতে অন্য সকল দেশকে শাসন ও শোষণ করার মানসিকতা তৈরি হল। ফলে ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর রানি ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে ভারতে বাণিজ্যের অনুমতি পাওয়া বণিক দলটির নজর বাণিজ্য ছাড়িয়ে মসনদের দিকে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। শুধু সেটা দখল করতে বাংলাদেশে আসতে হয়েছে বলে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ-অঞ্চলে পরবর্তীকালের ইংরেজ-চরিত্র দেখলে তাঁদের রেনেসাঁসের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ হবে (অর্থনীতিকভাবে তো বটেই, জগতের কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সকল উপনিবেশকে Other করে রেখেছেন এবং সে সকল উপনিবেশায়িত অঞ্চলের মানুষের মগজে ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদের হীনত্ব প্রথিত করে দিতে সকল ব্যবস্থাই সম্পন্ন করেছিলেন)।

ইতিহাসের রেনেসাঁর এই ভিন্নমুখিতার বিপরীতে ইংল্যান্ডে কোনো নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন তো দেখাই যায় না, বরং উল্টো মানবতাবাদ আর ব্যক্তি-মনের বিলাস-কল্পনা নিয়ে রোমান্টিসিজমের আগমন ঘটে। এবারও নতুন কথা, নতুন প্রকাশভঙ্গি, নতুন আদর্শ। এ-অর্থে তাঁরা 'আধুনিক'। রেনেসাঁসের মতো প্রভাব বিস্তারী এই

আন্দোলন আঠারো শতকের মধ্যভাগে উদ্ভূত হলেও শতকের শেষ প্রান্তে এসে তা প্রবল হয়। ১৭৯৮ সালে প্রকাশ পায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের *Lyrical Ballads*। এটিকে রোমান্টিক আন্দোলনের মেনিফেস্টো বলা হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল এই ধারার সাহিত্যের কাল। রোমান্টিক সাহিত্যিকেরা রাজনীতিক মতাদর্শে অভিন্ন না হলেও কবিতায় তাঁরা প্রকৃতিকে, কল্পনাকে ও ব্যক্তির আত্মগত অনুভূতিকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে অভিন্ন ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, কেবল যুক্তি দিয়ে বিশ্বের সকল রহস্যের উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। কল্পনাই সেক্ষেত্রে প্রধান ভরসা। তাঁদের কাছে 'কবিতা দর্শনের বাহন নয়, কবিতাই দর্শন, জীবনের গূঢ়তম তত্ত্বের ব্যঞ্জনা।'[২] স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কবিতা ছিল গীতিধর্মী।

অনেকটা রোমান্টিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট পরবর্তীকালের যে শিল্প-সাহিত্যিক আন্দোলন ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল, তা-ই Modernism বা 'আধুনিকতাবাদ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে একদিকে বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রসর ও শিল্পবিপ্লবের ফলে ক্রমান্বয়ে মানুষের মূলবোধের অবক্ষয়, অন্যদিকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসের রাজনীতিক দর্শন, ফ্রয়েডের মনোঃসমীক্ষণ তত্ত্ব, জাঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রভৃতি মনীষীর নতুন নতুন উদ্ভাবন মানুষের প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে ভেঙে দিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে Rudyard Kipling(1865-1936) ও W.E. Henly(1849-1903)-এর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবও 'আধুনিকতাবাদ' উদ্ভাবনের জন্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাজ করেছিল। এঁদের বিরোধিতা করা কবিগোষ্ঠী Decadent বা অবক্ষয়বাদী বলে অভিহিত হন।

> অবক্ষয়বাদী কবিরা কলাসর্বস্বতায় বিশ্বাসী। জীবনকে সাধারণভাবে এঁরা গ্রহণ করতে পারতেন না; সূক্ষ্ম আনন্দ ভোগের দিকে ছিল এঁদের দৃষ্টি। যা অস্বাভাবিক, অপ্রাকৃতিক, দুর্লভ এবং দুর্জেয় তার প্রতি ছিল এঁদের একটা দুর্বার আকর্ষণ।[৩]

অবক্ষয়বাদীদের মধ্যে একদল কবিগোষ্ঠী 'নৈরাশ্যবাদী' বলে পরিচিত হন। তাঁদের কবিতায় অবসাদ, বিষণ্নতা আর ক্লান্তির সুরই মুখ্য। 'আধুনিকতাবাদী' কবিতায় এসব বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তবে নাগরিক জীবনের ক্লেদ, হতাশা, গ্লানি, যন্ত্রণা, অনিকেত চেতনা প্রভৃতিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে এসেছে। কোনো কল্পনার জগৎ নয়, ব্যক্তি মনের ক্ষণিক অনুভূতির মহোত্তম প্রকাশও নয়, 'আধুনিকতাবাদী' সাহিত্যিকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাস্তবের রূপায়ণ; যুগের জটিলতা, নির্মমতা আর যন্ত্রণার রূপায়ণ। এক্ষেত্রে নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯২২ সালে টি. এস. এলিয়টের

The Waste Land প্রকাশিত হওয়ার পর 'আধুনিকতাবাদী' আন্দোলন জনপ্রিয়তা পায়। বিশ্বব্যাপী 'আধুনিকতাবাদী' কাব্যাদর্শ গৃহীত হতে শুরু করে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই 'আধুনিকতা'র ধারা সমান্তরাল ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকের ঔপন্যাসিক, ফরাসি লেখক ফ্লোবের ও জোলার প্রভাবান্বিত, Thomas Hardy(1840-1928) নৈরাশ্যবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ নিয়তির দাস। George Gissing(1857-1903)-ও নৈরাশ্যবাদী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস লন্ডনের দরিদ্র জীবনাশ্রয়ী। Robert Louis Stevenson(1850-1894)-এর মধ্যে নিরাশা নেই। জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করা ও উপভোগ করায় তাঁর আগ্রহ। তবে Rudyard Kipling ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। তাঁর মতে, দুর্বলকে শাসন ও প্রতিপালন করার অধিকার ও দায়িত্ব সবলের আছে। এটিকে বিধাতার নিয়ম হিসেবে তিনি অভিহিত করতে চান। জাতির শ্রেষ্ঠত্বেও তাঁর আস্থা ছিল। তাঁর মতে, অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাঁর এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত মনোভাব বিংশ শতাব্দীতে জোড়ালো হয়ে ওঠে। E. M. Forster(1879-1970)-এর *A passage to India*(1924) এক্ষেত্রে ভালো দৃষ্টান্ত।

> তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে হৃদয়ের সত্যিকার সংযোগ স্থাপন করতে পারলে সমস্ত সামাজিক বিরোধের অবসান ঘটানো সম্ভব। মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের কারণ অনুভূতির কার্পণ্য, হৃদয়াবেগের অভাব। মানুষ যদি হৃদয়ের অনুভূতিগুলিকে যথার্থ মর্যাদা দিতে প্রস্তুত থাকে তাহলে বিরোধের কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। A passage to India তে বিশেষ করে তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় এবং ইংরেজ সমাজের মধ্যে যে বিরোধ তার মূলে রয়েছে পরস্পরের মনে পরস্পর সম্পর্কে কতকগুলি মিথ্যা ধারণা। মানুষ হিসাবে তারা কখনই এক মঞ্চে উঠে আসতে পারে নি।[৪]

অবক্ষয়ের চিত্র Oscar Wilde(1854-1900)-এর *Picture oF Dorian Gray*(1897) উপন্যাসে পরিলক্ষিত হলেও যুগযন্ত্রণার প্রকৃত বাস্তবতা নিয়ে 'আধুনিক' উপন্যাসের পথচলা শুরু হয় 'আধুনিক' কাব্যের সমকালেই, অর্থাৎ ১৯২২ সালে James Joycei(1882-1941)-এর *Ulysses* প্রকাশের পর থেকে। নতুন চিন্তা, নতুন বাণী আর নতুন প্রকাশভঙ্গির এ-ধারার অন্যান্য উপন্যাসিকদের মধ্যে D.H. Lawrence(1885-1930), Virginia Woolf(1882-1941), Aldous Huxley (1894-1963) অন্যতম। সময়ের সংকটকে রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা প্রচলিত

প্রকাশভঙ্গি পরিহার করে নতুনের আশ্রয় নিয়েছেন। James Joyce আর Virginia Woolf-এর রচনায় সে কারণেই Stream of consciousness বা চেতনাপ্রবাহরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। আখ্যানের ধারাবাহিক বর্ণনার পরিবর্তে মানব-মনের জটিলতা উদঘাটনে বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যা প্রাধান্য পেয়েছে। *Ulysses* উপন্যাসে মাত্র একদিনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক Bloom প্রতি মুহূর্তে যা কিছু চিন্তা করছে, তার অবচেতন মনে যে-সকল চিন্তা উঁকি দিচ্ছে, তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে উপন্যাসে। স্বভাবতই এই বর্ণনায় ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণের প্রভাব পড়েছে। প্রসঙ্গত কারণেই উপন্যাসটি সহজপাঠ্য থাকে নি। উপন্যাসের ভাষা ও রচনাশৈলী নিয়ে James Joyce-এর সহযাত্রী ছিলেন Samuel Beckett(1906-1989)। Samuel Beckett একাধারে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। অস্তিত্ববাদী জীবনাদর্শের অন্যতম আর একজন লেখক হলেন Albert Camue(1913-1960)। এঁরা ফ্রয়েড আর সার্ত্রের দর্শনকে উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। এঁদের হাতেই পরবর্তীতে Absurd শিল্পধারা সূচিত হয়। D.H. Lawrence-এর লেখায় মার্কস ও ফ্রয়েড মিলেমিশে আছে। যদিও এই দুই তাত্ত্বিকের দর্শনে সাদৃশ্য নেই। লরেন্সের লেখায় উচ্চবিত্তদের প্রতি একটি ক্ষোভ ও বিদ্রোহের সুর বর্তমান। আবার মানুষের যৌনানুভূতিকে সর্বপ্রধান শক্তি হিসেবে উপন্যাসে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর Sons And Lovers(1913), Women in Love(1920), Lady Chatterley's lover(1928) উপন্যাসগুলোতে মূলত এই প্রবলতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। Aldous Huxley উপন্যাসে ভিন্ন ধারার আনায়ন করেন। তিনি তাঁর লেখায় সময়ের প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের ঘটনা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে প্রবহমান থাকে। উত্তরকালে জাদুবাস্তবতাবাদে এই প্রবণতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের ধারার পরবর্তীকালে আরও নতুন নতুন চিন্তা এসে যুক্ত হয়েছে। এসেছে নতুন নতুন মতবাদ। তার সবগুলোই সমকালে 'আধুনিক' ছিল। কালের ধারায় নতুনত্ব এসে সে জায়গা দখল করে নিয়েছে। অর্থাৎ 'আধুনিক' শব্দটির মানে নিয়ত পরিবর্তনশীল। তবে 'আধুনিকতাবাদ' এ-অঞ্চলে যে বিশেষ চরিত্র ধারণ করেছে আর বাংলা উপন্যাসে তার স্বরূপ যেমন দাঁড়িয়েছে, তার একটি মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়। সে প্রসঙ্গে আলোচনায় আসা যাক।

দুই

বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরু হয় উনিশ শতক থেকে।[৫] বাংলা গদ্যের এই প্রবর্তনকে মানদণ্ড ধরেই এখান থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা বলে মনে করা হয়। বাংলার রেনেসাঁসও ঘটে এই উনিশ শতকেই। রাজা রামমোহন রায়(১৭৭২-১৮৩৩) এর পুরোধা বলে বিবেচিত হন। এরপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর(১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত(১৮২০-১৮৮৬), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ ব্যক্তির মনীষা ও সাধনায় এই রেনেসাঁ পূর্ণতা পায়। কিন্তু বাংলার রেনেসাঁর চরিত্র ইতালির রেনেসাঁর সমান্তরাল নয়। ইতালিতে ধর্মের পরিবর্তে মানবতাকে, ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকে প্রাধান্য দেয়া এবং অতীত ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন রেনেসাঁসের মৌল প্রবণতা ছিল। বাংলায় অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ রেনেসাঁর কালে ঘটেনি, ঘটেছিল ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের কালে। ধর্মীয় কুসংস্কারের অপসারণ, ইংরেজ-নির্দেশিত কালচার ও জ্ঞানের পথে এদেশীয়দের আগ্রহ জাগানো—মোটাদাগে, ইংরেজি শিক্ষাকেই এই উপমহাদেশে রেনেসাঁস বলে চালানো হয়েছে। এখানের নবজাগরণের মানে দাঁড়িয়েছিল, লন্ডন-সচেতনতা ও মুগ্ধতা। তাই বাংলার রেনেসাঁ একধরনের চাপানো 'আধুনিকতা' ছাড়া আর কিছু নয়।

উনিশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যের 'আধুনিক যুগে'র সূচনার কথা বলা হল। গদ্যের প্রচলনকে তার মানদণ্ড ধরা হল। তার মানে গদ্যই 'আধুনিক'। আবার এই গদ্যে লেখা উপন্যাস 'আধুনিক' অভিধায় অভিহিত হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৬১–১৯৪১) *চোখের বালি*(১৯০৩) উপন্যাসকে প্রথম বাংলা 'আধুনিক' উপন্যাস হিসেবে ধরা হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *দুর্গেশনন্দিনী*(১৮৬৫) বলে দাবি করা হয়।[৬] 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ইংরেজিশিক্ষিত নতুন যুবকদের ভালো লেগেছিল কাহিনীর গুণে, সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষিত প্রবীণ পাঠকদের ভালো লেগেছিল ভাষার সংস্কৃত নির্ভরতার গুণে।'[৭] তবে উপন্যাসে মূলত ঘটনা কিংবা কাহিনির বিবরণ পাওয়া যায় বলে, সামাজিক নীতির প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দেয়া হয় বলে এবং উপন্যাসের একমাত্র কণ্ঠস্বর হিসেবে কেবল লেখকের কথাই শোনা যায় বলে, তাঁর উপন্যাসকে 'আধুনিক' বলে মান্য করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের(১৮৬১–১৯৪১) *চোখের বালিতে* প্রথম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নমুনা পাওয়া যায়। বিনোদিনীকে তিনি কামনা-বাসনা-ঈর্ষা-আকাঙ্ক্ষাসহ প্রকাশ করেছেন। গল্প বলার

দায় লেখক চরিত্রের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। একই সাথে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর দ্বন্দ্ব সামন্ত-গণতন্ত্রের দ্বন্দ্বরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্বতন উপন্যাস থেকে উপন্যাসখানি যে আলাদা, উপন্যাসের ভূমিকা অংশে লেখক তা স্পষ্ট করতে বলেন–

> আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করলে ধরা পড়বে যে, 'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। [...] শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলঙ্কারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব নষ্ট হয়। [...] যেন পশুশালার দরজা খুঁলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল 'চোখের বালি'তে।[৮]

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসের 'আধুনিকতা' বলতে যা বুঝতেন, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। 'সাহিত্যের নবপর্যায়'কেই তিনি 'আধুনিক' বলেছেন। আর সেই 'আধুনিকতা'র বৈশিষ্ট্য, যা তিনি উল্লেখ করেছেন, তার যথাযথ উপস্থাপন তিনি উপন্যাসে ঘটাতে পারেননি। বিনোদিনী প্রচলিত গণ্ডি থেকে মুক্তি পেতে পেতেও সমাজ-সংস্কারের দেয়ালে আটকা পড়ে গেল। তাই—

> বাসনা-আবিষ্ট বিনোদিনীর প্রেম উত্তীর্ণ হয়ে গেল পূজায়। শুধু তাই নয়, বিহারী বিয়ে করতে চাইলে, যে-বিনোদিনীর শিরায় শিরায় আগুন জ্বলত, চোখে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হত, যে ছিল কামনার উন্মাদনায় তপ্ত, সেই বিনোদিনী বলল—'আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হতেই পারে না'।[৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চতুরঙ্গ*(১৯১৬) কিংবা *ঘরে বাইরে*(১৯১৬) উপন্যাসের 'আধুনিকতা'ও এই একইভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। 'আধুনিক' উপন্যাসের স্বরূপলক্ষণের প্রভূত সম্ভাবনা দেখা দিয়েও শেষ পর্যন্ত তা রাবীন্দ্রিক আদর্শে স্থিত থেকেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৭৬–১৯৩৮) তাঁর উপন্যাসে চরিত্রসমূহের 'হৃদয়াবৃত্তি এবং বহিরঙ্গ ঘটনার সংঘাতের উপর বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর উৎসাহ ছিল চরিত্রের মনস্তত্ত্ব পরিস্ফুটিত করার দিকে, চরিত্রের আচরণের পেছনে তাদের মানসক্রিয়া দেখানোর দিকে।'[১০] নারীচরিত্রচিত্রণের দরদি লেখক হয়েও তিনি নারীর মুক্তির পথ

দেখাতে পারেননি।[১১] কেবল শেষ বয়সে এসে *শেষ প্রশ্ন*(১৯৩১) উপন্যাসে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব হিসেবেই যেন কমলকে সর্বসংস্কারমুক্ত করে উপস্থাপনের প্রয়াস করেছেন। পরবর্তী কালে 'কল্লোল যুগে'র কথাসাহিত্যিকেরা পূর্বজদের প্রভাবমুক্ত হয়ে নতুন ধারা আনয়ন করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁরা রেনেসাঁসীয় মানবিকতার পরিবর্তে যুগের বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিলেন। তবে তাঁদের রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল স্পষ্টভাবে। সচেতনভাবেই তাঁরা বিশ্বসাহিত্য থেকে ঋণ নিয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত(১৯০৩–১৯৭৬)-এর *বেদে*(১৯২৮) উপন্যাসের নায়কের মুখে তাই শোনা যায়—

> বাঙলার কোণে বসে বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই, টলস্টয় মেঝের উপর পা ছড়িয়ে বসে—ডস্টয়েভস্কি কাঁধের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর করে হাসে, রাতের খাবারটুকু গোর্কির সঙ্গে একত্র খাই ; হামসুন হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে বন্ধুর মতো গল্প করে যায়—জ্বরো কপালে বোয়ার তার কোমল হাতখানি বুলিয়ে দেয় নীল সাগরের কল্লোলিত মায়া তার চোখে, ফ্রান্স কতদিন আমার এই ঘরে বসে জিরিয়ে গেছে।[১২]

কল্লোলীয় কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত(১৮৮৬–১৯৫৭) ছিলেন অন্যতম। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মানবিকতার বিপরীতে নিস্পৃহ উপলব্ধির প্রকাশ করেছেন তাঁর লেখায়। 'মানুষের সংসারে তিনি দেখেছিলেন নৃশংস অ-মানবিকতা, মনুষ্যত্বহীনতা।'[১৩] নৈরাশ্য, তিক্ততা ও রুক্ষতা তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিয়তির কাছে মানুষ অসহায়–এই ছিল তাঁর জীবনবোধ। কল্লোলীয় সাহিত্যিকদের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অশ্রুকুমার সিকদারের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হল—

> বাস্তবতার সীমাকে প্রসারিত করার জন্য সমাজের অবজ্ঞাত অংশকে সাহিত্যে তুলে ধরার চেষ্টা 'কল্লোলে'র সব কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখি। অচিন্ত্যকুমার *বেদে* উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন অকৃতার্থ মানুষের জীবনের ছবি। 'আবার কলকাতা। সকালে কুয়াশা, দুপুরে ধুলো, বিকালে ধোঁয়া। বস্তি না আস্তাকুড়! সমাজের তলানিদের অতল সমুদ্র। —ভিড়ে গেছি। সমস্তই সস্তা এখানে—প্রেম আনন্দ মৃত্যু।' *পাঁক* উপন্যাস রচনার ইতিহাস প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই বিবৃত করেছেন। 'স্কুলে যেতে লম্বা একটা আঁকাবাঁকা গলি পেরুতে হতো। সেই গলির একটা বাঁকের পাশে মস্ত একটা নোংরা পুকুর। চারপাশে বেশির ভাগ নারকেল পাতা আর দু-একটা ভাঙা খোলার ছাওয়া গরিবদের বস্তি।'[১৪]

কল্লোলীয় যুগের ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের জগত বস্তির অলিগলি পেরিয়ে নর্দমা-ড্রেন-ছেঁড়াকাঁথা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায়। ক্লেদাক্ত জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা উঠে আসে তাঁদের লেখায়। যুগের জাগতিক এবং মানসিক—উভয় দিকের দ্বিধাহীন উপস্থাপনই তাঁদের সাহিত্যিক জগতকে পূর্বজদের থেকে আলাদা করেছে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপন্যাস লেখায় ব্রতী হয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯০৮–১৯৫৬)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮–১৯৭১) ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪–১৯৫০) ভিন্ন অভিজ্ঞতা যুক্ত করেছিলেন বাংলা উপন্যাসে। এছাড়া সতীনাথ ভাদুড়ী(১৯০৬–১৯৬৫), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়(১৮৯৪–১৯৬১), অমিয়ভূষণ মজুমদার(১৯ ১৮–২০০১), কমলকুমার মজুমদার(১৯১৪–১৯৭৯), সমরেশ বসু(১৯২৪–১৯৮৮) প্রমুখ সাহিত্যিক তাঁদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য দ্বারা বাংলা উপন্যাসের 'আধুনিকতা'র যাত্রাকে প্রবহমান রেখেছেন।

তিন

এবার আসা যাক বাংলাদেশের প্রসঙ্গে। সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ১৯৭১ সালে হলেও 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলতে সাধারণভাবে এ-অঞ্চলের সমগ্র সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে ধরতে হয়। বর্তমান বাংলাদেশে প্রথম রেনেসাঁসের ছোঁয়া লাগে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'কে কেন্দ্র করে, কাজী আবদুল ওদুদ(১৮৯৪–১৯৭০), আবুল হুসেন(১৮৯৭-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেন(১৮৯৭-১৯৮১), মোতাহের হোসেন চৌধুরী(১৯০৩–১৯৫৬), আবুল ফজল(১৯০৩–১৯৮৩), আবদুল কাদির(১৯০৬–১৯৮৪) প্রমুখ কতিপয় তরুণ জ্ঞানের জগতে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশি মুসলমানদের নতুন আলোর সন্ধান দিতে চাইলেন। 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামে তাঁরা সংগঠিত হয়ে *শিখা*(১৯২৭) পত্রিকাকে মুখপত্র করে 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' শ্লোগান নিয়ে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে এদেরকেই মূল ধারার 'আধুনিকতাবাদী' বলে বিবেচনা করা হয়েছে। 'বাংলা ভাষার দেশে হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বিত সাধনা দ্বারা উন্নত জাতি গঠন ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের মূল লক্ষ।'[১৫] পদে পদে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা প্রতিহত হয়েছেন।[১৬] উত্তরকালে এই ধারা নিরবচ্ছিন্ন না হওয়ার কারণে বাংলাদেশের সামাজিক কিংবা সাহিত্যিক কোনো ক্ষেত্রেই নবজাগরণের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সমন্বিত জাতিসত্তার ধারণার পরিবর্তে

একদল বুদ্ধিজীবী তথা সাহিত্যিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য ও মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। সময়ে সময়ে তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থাকায় বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতিতে পূর্বোক্ত ধারার রেনেসাঁস কিংবা আধুনিক চিন্তার প্রসার বাধাগ্রস্ত হয়। ১৯৪০-এর দশকে দেশভাগের আগে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' নামে তাঁরা একত্র হন।

> রেনেসাঁ সোসাইটির চিন্তক ও কর্মীরা পাকিস্তানবাদী হলেও মোল্লাতন্ত্রের অনুকূল ছিলেন না। তবে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের স্পিরিটকে তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। তাঁরাও রেনেসাঁসেরই সাধক ছিলেন, তবে তাঁরা নিজেদের জন্য রেনেসাঁসের একটা স্বতন্ত্র, হিন্দুয়ানিমুক্ত, পাকিস্তানি চারিত্র্য কামনা করতেন।[১৭]

প্রাসঙ্গিক কারণেই দেশভাগের অব্যবহিত পরেই চিন্তার জগতে দ্বিমেরুকরণ ঘটে। দুই ধারার বুদ্ধিজীবীরাই নিজেদের আদর্শকে আধুনিক ও যুগোপযোগী মনে করলেন। রাজনীতিক উত্থান-পতনের কারণে কোনো ধারাই সমৃদ্ধ হতে পারেনি তখন। শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্রও বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে থাকে কলকাতা, অন্যদিকে ঢাকা।

> দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যে-সময়টাতে ঢাকা থেকে প্রচারিত হচ্ছিল 'বুদ্ধির মুক্তিবাদ', সেই সময়ে ও তার পরে *কল্লোল*, *কবিতা* প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যক্ষেত্রে কলকাতা থেকে প্রচারিত হচ্ছিল 'আধুনিকতাবাদ' (modernism)। আধুনিকতাবাদীরা শিল্প-সাহিত্যের রূপ-রীতির দিক দিয়ে নতুনত্ব ও উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন: তবে তাঁদের জীবন-জগৎদৃষ্টি ছিল নেতিবাদী-নৈরাশ্যবাদী। তাঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রম করে নতুন সৃষ্টির উপায় সন্ধান করেছিলেন এবং তাতে তাঁদের সাফল্য আছে। ইউরোপের রেনেসাঁস, উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ এবং বিশ শতকের বাংলার গণজাগরণের প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল অপ্রসন্ন। রাজনীতির প্রতি তাঁরা তাকিয়েছিলেন বিরূপ দৃষ্টিতে। বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁরা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। ধর্মেও তাদের আস্থা ছিল না। ব্যর্থতা, পরাজয়, বিকার-বিকৃতি ও রুগ্‌ণতাকে (morbidity) বিষয়বস্তু করে তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন;[১৮]

বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনের পরে বাংলাদেশে এই ধারার 'আধুনিকতা' জাতীয়তাবাদে জারিত হয়ে প্রধান ধারার রূপ নেয়। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে স্বৈরশাসকের অবরুদ্ধ পরিবেশে দ্বিতীয় ধারাটি (পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী) রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় প্রথম ধারাটি (বাঙালি জাতীয়তাবাদী) নানা ধরনের নিগ্রহের

শিকার হয়। বুদ্ধিজীবীদের বাধ্য করা হয় রাষ্ট্রীয় আদেশ মেনে চলতে, আইউব খানের মর্জি মতো পাকিস্তানি শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করতে। সমন্বিত উদার জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী লেখককূল কখনো কখনো বাধ্য হয়েছিলেন এই কাজ করতে। যেমন, মুনীর চৌধুরী(১৯২৫-১৯৭১) লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন *রক্তাক্ত প্রান্তর*(১৯৬২) নাটক। কিন্তু নাটকটিতে তিনি 'পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে'(১৭৬১) মুসলমানদের বিজয়ের পরিবর্তে মানবিক মূলবোধকেই বড় করে দেখিয়েছেন। সূক্ষ্মভাবে তিনি শাসকশ্রেণিকে বোকা বানিয়েছেন। সরাসরি যখন কথা বলার সুযোগ না থাকে, তখনই সৃষ্টিশীল মানুষকে বেছে নিতে হয় আড়াল। অভিনব না হলেও 'আধুনিকতা'র এ-ও এক ধরনের কাঠামো। আর এক্ষেত্রে শওকত ওসমানের(১৯১৭-১৯৯৮) *ক্রীতদাসের হাসি*(১৯৬২) উপন্যাসের সাফল্য তুলনাহীন। উপন্যাসে আলোচনায় আসার আগে লেখকের সমকালে এসে 'আধুনিকতা' যে স্বরূপ গ্রহণ করেছে, তার একটি সারমর্ম করা আবশ্যক। পূর্বোক্ত আলোচনায় 'আধুনিকতা'র ধারাক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৬০-এর দশকের বাংলাদেশের কবিকূল ত্রিশোত্তর 'আধুনিকতাবাদী' কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ত্রিশের দশকের কবিদের কবিতার সাধারণ লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে দীপ্তি ত্রিপাঠী বারোটি লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো—

১. নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত।
২. বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ।
৩. আত্মবিরোধ ও অনিকেত মনোভাব।
৪. বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে সচেতনা গ্রহণ।
৫. ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসম্বদ্ধতা।
৬. ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক, ও প্ল্যাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব।
৭. মার্ক্সীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার, প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা।
৮. মননধর্মিতা—অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভারে দুরূহতার সৃষ্টি।
৯. বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে(যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম) সংশয় এবং তৎজাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ।
১০. দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা।

১১ ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস

১২. রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথসন্ধান।[১৯]

১৯৬০-এর দশকে এসে বাংলা উপন্যাসে 'আধুনিকতা' যে রূপ গ্রহণ করেছে, তা সে-সময়ের কবিতার 'আধুনিকতা'র সমান্তরাল ছিল। 'আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিশ্বাস প্রভৃতি নিয়ে মানবজীবনের যে স্বতন্ত্র মূল্য-মহিমা আছে, তা-ই আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠল: জীবনের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা রূপলাভ করল।'[২০] সুবোধ চৌধুরীও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের বারোটি প্রধান লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন।[২১] কথাসাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসে লেখকের কণ্ঠস্বরের বদলে চরিত্রসমূহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল; সামাজিক শৃঙ্খলের বদলে ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির প্রকাশকে গুরুত্ব দেয়া হল; পুরুষতান্ত্রিক সমাজনীতির বিপরীতে নারীর জাগতিক সুখ-দুঃখ সচেতনতা, বিদ্রোহ তথা অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালো হয়ে উঠল; কাল্পনিক দুনিয়ার পরিবর্তে ধুলোবালির ধূসর পৃথিবী অর্থাৎ জাগতিক বাস্তবতার রূপায়ণ প্রাধান্য পেল; যুগের প্রভাবে নিঃসঙ্গতা, নির্বেদ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ধরা দিল। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্ব গৃহীত হল।

চার

এখন কথা ওঠে এই ধারার 'আধুনিকতা'র দৃষ্টিতে শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি*কে কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে। যেহেতু 'আধুনিকতা'র নির্দিষ্ট কোনো ছকবাঁধা মানদণ্ড থাকার প্রশ্নই ওঠে না, সে কারণে কোনো নির্দিষ্ট 'আধুনিকতা'র মানদণ্ডে *ক্রীতদাসের হাসি*কে মূল্যায়ন করারও প্রয়োজন দেখা দেয় না। 'আধুনিকতা'র যে ধারাক্রম উপর্যুক্ত আলোচনায় উঠে এসেছে, *ক্রীতদাসের হাসি*কে সে ধারায় এক সংযোজন বলা যেতে পারে। এই সংযোজন যে একেবারেই অভিনব, সে দাবি করা যাবে না। কেননা, 'আধুনিক উপন্যাসে ব্যঙ্গে-শ্লেষে, উইটে-হিউমারে কৌতুক-কটাক্ষে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আরেকটি ধারা রচনা করেছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৬৩–১৯৪৯), রাজশেখর বসু(১৮৮০-১৯৬০), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়(১৮৯৯–১৯৮৮) প্রমুখ।'[২২] তবে লেখকের নিজস্ব ঢঙের কারণে তা নতুনত্বের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

শওকত ওসমান সংলাপনির্ভর নাট্যিক বয়ানধর্মিতাকে বেছে নিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। আর কাহিনির সংস্থাপন করেছেন অষ্টম শতাব্দীর বাগদাদে, হারুন-অর-

রশীদের শাসনামলে। উপন্যাসটিতে তিনি ইতিহাসের পাটাতনে সমকালীন সময়ের সংক্ষোভকে ধারণ করেছেন। 'তিনি ঘোরতরভাবে সমকাল সচেতন। সমসাময়িক কালের মানুষ, রাজনীতি, নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনা, আন্দোলন, সংগ্রাম, সংঘাত, যুদ্ধ, আপোস, প্রভৃতি নিয়ে তাঁর ক্রমবর্ধমান সচেতনতা তাঁকে ক্রমে স্পর্শকাতর করে তুলছে।'[২৩] বেগম আকতার কামালও শওকত ওসমানের চিন্তার পরিধি ও স্বরূপ নিয়ে অনুরূপ পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর কাছে, 'মার্কসীয় প্রগতিচেতনা, জীবনের আশাবাদ ও ইতিবাচকতা, সমাজ ও সময়ের দ্বান্দ্বিক ন্যায় শওকত ওসমানের চিন্তার মূল কেন্দ্র'[২৪] বলে মনে হয়েছে। তবে *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসে লেখক রাষ্ট্র, সমাজ কিংবা জীবন নিয়ে কোনো জটিল মীমাংসার দিকে অগ্রসর হননি। সে কারণেই তাতারীকে নিয়ে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক উত্তরণের দিকে তিনি অগ্রসর হন না। বাদশা কর্তৃক সুখভোগ ও কর্তৃত্ব খাটানোর সুযোগ তৈরি হলেও সে সুযোগ তাতারীকে কাজে লাগাতে দেখা যায় না।

> অন্য কোনো ক্রীতদাস বা বাগান রক্ষককে সে বাদশার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে না। দুই পক্ষের সম্মুখ সমরে জয়-পরাজয় নির্ধারণ এই সরল সমীকরণে ঔপন্যাসিক আস্থা রাখেননি বলেই একটি বিশেষ চেতনার প্রতীক হওয়ার পরও তাতারীকে শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে দাঁড় করাতে নানা সংঘাত দ্বন্দ্বে তিনি এনেছেন চেতনার ধারাবাহিক উত্তরণ।[২৫]

এক্ষেত্রে অবশ্য মার্কসীয় জীবনদৃষ্টির পরিবর্তে 'ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের মূলে রয়েছে মানুষের ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন স্বীকৃতি।'[২৬] আর তাতারী লেখকের মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল বলে আবু রুশ্‌দ্‌(১৯১৯-২০১০)-এর অভিযোগের ক্ষেত্রগুলো তৈরি হয়েছিল।[২৭] তিনি মূলত উনিশ শতকের ষাটের দশকের শিল্প-সংস্কৃতির বদ্ধ পরিবেশে থেকে, প্রতিবাদকে রূপক-প্রতীকের আড়ালে উপস্থাপন করার দিকেই মনোযোগ দিয়েছিলেন। 'শিল্প-সাহিত্যে রূপক স্বভাবতই অল্প-বিস্তর ব্যবহৃত হয়। কারণ শিল্প-সাহিত্য বাস্তব নয়। বাস্তবের একধরনের রূপকই বটে।'[২৮] তা সত্ত্বেও কোনো বিশেষ বিশেষ রচনা রূপক-প্রতীকধর্মী হিসেবে মর্যাদা পায়। শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* তো অবশ্যই।

পূর্ববঙ্গে সামরিক শাসন কায়েম হওয়ার পর, বি.এন.আর, প্রেস ট্রাস্ট, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড(পূর্বাঞ্চল শাখা) ইত্যাদি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, 'বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের শৃঙ্খলিত ও বেতনদাসে পরিণত করার প্রচেষ্টায় পাকিস্তানি সামরিক

সরকার অনেকটা সাফল্য অর্জন করে।'[২৯] এক সাক্ষাৎকারে লেখক নিজে এ বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। বলেছেন—

> এ সময়ে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এতো কড়াকড়ি ছিলো যে, সরাসরি কাউকে কিছু বলা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্রও শব্দ করা যেত না। ঐ কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থান মধ্যে দিনযাপন করেও আমি *ক্রীতদাসের হাসি* লিখেছি। ঐ সময় স্বৈরাচার চরম পর্যায়ে পৌছেছিলো। একজন শিল্পী তো আর বসে থাকতে পারে না। তাই ঐ স্বৈরাচারী সরকারের শঠের সঙ্গে আমিও শঠ করলাম। [...] তাই বাধ্য হয়ে ঐসব উপন্যাসে রূপকের আশ্রয় নিয়েছিলাম।[৩০]

স্বাভাবিক কারণেই বেশিরভাগ সমালোচকের কাছে '*ক্রীতদাসের হাসি* হচ্ছে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতীক। তাতারী বাঙালির মুক্তচেতনার প্রতীক।'[৩১] 'মেহেরজান হচ্ছে বাংলার স্বাধীনতার প্রতীক; যে-স্বাধীনতা হাতফেরি হয়েছে কখনো তুর্কি-মোগল-পাঠানের, কখনো ইংরেজদের, কখনো পাকিস্তানিদের।[৩২] উপন্যাসটিকে প্রায় সকল সমালোচকই একবাক্যে 'রূপক-প্রতীকধর্মী' বলে মেনে নিয়েছেন। কেউ কেউ চরিত্র ধরে ধরেও প্রতীকধর্মিতাকে প্রমাণ করেছেন। যেমন—

> বাদশা হারুনঃ একনায়ক সামরিক শাসক আইয়ুব খান, বন্ধু সেনাপতি মশরুর : আইয়ুব খানের বাধ্য সৈন্যবাহিনী, বেগম জুবাইদাঃ পাকিস্তানের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, আলেম আবদুর কুদ্দুস, জল্লাদ ও পারিষদবর্গঃ ইসলামের ধ্বজাধারী শাসকের স্বার্থরক্ষাকারী ধর্মব্যবসায়ী ও তাদের অনুচর-সমর্থক, তাতারীঃ পূর্ব-পাকিস্তানের মেহনতী-শ্রমজীবী মানুষ, মেহেরজানঃ বাংলার স্বাধীনতা—যা তুর্কি, মোগল, ব্রিটিশ, পাকিস্তানিদের কাছে বার বার হাত বদল হয়েছে, কবি নওয়াস ইসহাকঃ বাংলার কবি, শিল্পী, সংস্কৃতিবান মানুষের প্রতিনিধি।[৩৩]

এই উপন্যাসে যেহেতু শওকত ওসমানের চেতনার মূল কেন্দ্র ছিল সমকালকে ধারণ করা, সমকালীন রাজনীতিক বাস্তবতায় যা রূপক-প্রতীকের অন্তরাল ছাড়া সম্ভব ছিল না, সেহেতু অনিবার্যভাবে উপন্যাসটি রূপক-প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছে। আর 'তিনিই সার্থক ঔপন্যাসিক, সময় ও সমাজ-ধারণায় যিনি বিজ্ঞানমনস্ক, গতিচঞ্চল কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ।'[৩৪] নিজেকে 'ঝাড়ুদার গ্রন্থকার'[৩৫] অভিধায় অভিহিত করা এই লেখকের কাছে সামাজিক দায়বদ্ধতাই বড় হয়ে ধরা দিয়েছে *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসে। তবে কালের প্রয়োজনে তিনি যেমন '*স্বকাল-সমকাল থেকে পলাতক*'[৩৬] থেকেছেন, তেমনি প্রচলিত 'আধুনিকতা'র জটিল জীবনবোধের দিকেও বিমুখ ছিলেন। তাতারী লেখকের

মনোযোগের কেন্দ্রে থাকার পরও তাকে বিংশ শতাব্দীর 'আধুনিক' মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। আবার অষ্টম শতাব্দীর একজন সাধারণ ক্রীতদাসের মধ্যেও তাতারী সীমাবদ্ধ নয়। কেনা গোলাম তাতারীর মধ্যে যে প্রেমানুভূতি আরোপ করা হয়েছে, তা সাম্প্রতিক কালের। আবার বাদশার দেয়া সুযোগ-সুবিধাকে অবজ্ঞা করা, চারিত্রিক অনমনীয়তা কিংবা বাদশার বিরুদ্ধে তার নীরব প্রতিবাদ মধ্যযুগীয় নয়, 'আধুনিক'। তা সত্ত্বেও মননে 'আধুনিক' তাতারীর পরিপূর্ণ প্রকাশ পাওয়া যাবে না উপন্যাসটিতে। একরৈখিক ভালো চরিত্র হিসেবে তাতারীকে মধ্যযুগীয় বলেই মনে হয়। কোনো কালিমাই তাকে স্পর্শ করে না, কোনোকিছুই তাকে টলাতে পারে না। কোনোধরনের মানসিক টানাপোড়েনও তার মধ্যে দেখা যাবে না। অথচ বাদশার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ(মূলত লেখকেই প্রতিবাদ সমকালীন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে) একেবারেই 'আধুনিক'।

আবার এই ক্রীতদাসের হাসি নিয়েই যত সংকট তৈরি হয়েছে উপন্যাসে। যে হাসি শুনে বাদশা মোহিত হয়েছিল, তা ছিল দুই মানব-মানবীর সুখ-ডগমগ হৃদয়-উৎসারিত। তার মধ্যে একজন, মানে মেহেরজানকে তো সে আয়ত্ত করতে পেরেছিল। এমনকি উপন্যাসে দেখা যায়, মেহেরজান তাতারীকে বিস্মৃত হয়ে যায়। তাহলে দিরহাম-দৌলত দিয়ে ক্রীতদাসের হাসি কেনা না-যাওয়াকে লেখক যদি দেখাতে চান, তাহলে মেহেরজান চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং প্রতিবাদকে দেখানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। উপন্যাসে তেমন কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। আবার রূপক-প্রতীক উপন্যাস হিসেবে *ক্রীতদাসের হাসি*কে 'স্বাধীনতার' প্রতীক বলা হয়েছে। লেখকের ভাষায় যা কিনা টাকা-পয়সা কিংবা জবরদস্তি করে কেনা যায় না। ক্রীতদাস অবস্থাতেই তো তাতারী মেহেরজানকে নিয়ে সুখে হেসেছিল। তাহলে ক্রীতদাস হাসে না, এটা কীভাবে হয়! মেহেরজানও তো ক্রীতদাসই। তাকে বাদ দিয়ে, মোহাফেজকে বাদ দিয়ে, কেবল তাতারী সমগ্র ক্রীতদাসের প্রতিনিধি হিসেবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। আরও এক জরুরি প্রশ্ন ওঠে এখানে—*ক্রীতদাসের হাসি*তে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, দুজন নরনারী একত্রে ক্রীতদাস থেকেও সুখে হাসতে পারে, জীবনকে উপভোগ করতে পারে, যদি তাদের দুজনের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা অটুট থাকে। এই ধারণা তো সামন্ততান্ত্রিক। কোনোমতেই 'আধুনিক' মানুষের জীবনবোধ এমন হতে পারে না। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই তো 'আধুনিক' চিন্তার ফল। 'আধুনিক' মানুষের কাছে জীবন নিয়ত চঞ্চল। যা আছে, তা

নিয়ে তৃপ্ত থাকাও 'আধুনিক' মানুষের লক্ষণ নয়। এই বোধ তো পৃথিবীর অগ্রযাত্রারও বিপরীত। এসব কথা মাথায় রেখে তাতারীকে স্বাধীনতাপ্রত্যাশী অবরুদ্ধ বাঙালির প্রতিনিধি মানা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার, পরাধীনতাই যদি হাসির অভাবের কারণ হয়, আর এই পরাধীনতা যদি কেবল বাহ্যিক হয়, তাহলে লেখক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের যে মিথ্যা বিশ্বাসযোগ্য গল্প ফেঁদেছেন, সেখানের রউফন নেসার সুখহীনতার কারণ কী? লেখক জানাচ্ছেন—

> বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের আর এক সেরা ছাত্র তাকে দাগা দিয়ে গিয়েছিল, তার খুঁটিনাটি হদিস আমার জানা আছে। ডিগ্রির উচ্চতা দিয়ে কত মেয়ে যে প্রতারিত হয়, তার উদাহরণ রউফন। ছাত্রটা পরে এক ঠিকাদারের মেয়েকে বিয়ে করেছিল আট আনা রাজত্বসহ।[৩৭]

রউফনের জীবনের এমন পরিণতির মার্কসীয় ব্যাখ্যায় না গিয়ে তিনি একেবারে সাধারণীকরণ করে ফেলেছেন। আবার জাফর বার্মেকী ও আব্বাসার প্রসঙ্গে লেখক ফ্রয়েডীয় মনঃস্তত্ত্বের জটিল বিশ্লেষণের ইঙ্গিত দিয়েও সেদিকে গেলেন না। কেবল বাদশা হারুনের মুখে এতটুকু বলিয়ে ছেড়ে দিলেন—'আব্বাসা আমার সঙ্গ ছাড়বে? না-না। ঘরের মধ্যে জ্যান্ত, কবরে দাফন হলো তার। সোজা কথায় পুঁতে ফেল্‌লাম। কতটুকু তার অপরাধ? জাফরের প্রতি মহব্বৎ—কিন্তু আমি কি?'[৩৮] অথচ বেগম জুবায়দা, মেহেরজান, তাতারী, বুসায়না প্রসঙ্গে 'আধুনিক' জটিল জীবনবীক্ষার একটি সম্ভাবনা ছিল। নারীবাদী দৃষ্টিকোণে উপন্যাসটিকে 'আধুনিক' বলে মানা যাবে না। মেহেরজান, বুসায়না কিংবা জুবাইদা—কাউকেই এই উপন্যাসে তাদের মতো করে উপস্থাপন করা হয়নি। দীর্ঘ সময় মেহেরজানের অনুপস্থিতি এমনকি শেষ দৃশ্যে কারাগারে মেহেরজানের প্রবেশের যে বর্ণনা লেখক হাজির করেছেন, তা নারীর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ন করেছে বৈকি। তাতারীর করুণ পরিণতির মুহূর্তে মেহেরজানের প্রবেশ লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে— 'মেহেরজানের প্রবেশ। পরনে রেশমি লেবাস। যৌবন সর্বাঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থীর মতো লুটাইয়া পড়িতেছে। চোখে মুখে হাসির ঝিলিক ছাপাইয়া ওঠে। আপ্ত রমণীর মতো চলাফেরা।'[৩৯] উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলো অষ্টম শতাব্দীর নারীই। কোনো ভাবেই তা 'আধুনিক' কালের নয়। নাগরিক জীবনের ক্লেদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যক্তি চরিত্রের প্রাধান্য, বর্ণনার কাঠিন্য প্রভৃতি আধুনিক কথাসাহিত্যের জনপ্রিয় অনুষঙ্গগুলো এই উপন্যাসে ক্রিয়াশীল নয়। বাংলাদেশের সাহিত্যে 'আধুনিকতা'র আনয়নকারীদের মধ্যে আনিসুজ্জামান শওকত ওসমানের

নাম উল্লেখ করেছেন।[৪০] শওকত ওসমানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসে, প্রচলিত ধারায় নয়, লেখকের আধুনিকমনস্কতার পরিচয় খুঁজতে হবে তাঁর প্রতীকধর্মিতার ব্যবহারের মধ্যে, সমকালকে উপস্থাপনে শাসকশ্রেণিকে বোকা বানানোর কৌশলের মধ্যে। আর এই দুই ক্ষেত্রেই লেখক বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

শাসকশ্রেণিকে বোকা বানানোর সাফল্য হিসেবে পেয়েছিলেন 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার'। উপন্যাসের মূল অংশে প্রবেশের আগে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের যে মিথ্যা গল্প ফেঁদেছিলেন, তা সে সময়ে এতটাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল যে, আবু রুশ্‌দ্‌-এর মতো সাহিত্যিকেরাও অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন এটি বুঝতে—*ক্রীতদাসের হাসি* 'আলেফ লায়লা'র গল্প নাকি লেখকের সৃষ্ট। সে কারণেই হারুন-অর-রশীদ ও তাঁর সমকালীন বাগদাদ নগরীর মালিন্যপূর্ণ উপস্থাপনে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।[৪১] পরিস্থিতির কারণেই লেখককে '*ক্রীতদাসের হাসি*– বই কল্পনা'[৪২] বলে জবানবন্দি দিতে হয়েছিল। আর রূপক-প্রতীকধর্মী উপন্যাস হিসেবে প্রায় সমালোচকই উপন্যাসটির সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো, আনিসুজ্জামান যে তিনজন কথাসাহিত্যিককে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে 'আধুনিকতা'র আনয়ন করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যে আবু রুশ্‌দ্‌ ধর্মীয় ঐতিহ্যপূর্ণ নতুন ধারার 'আধুনিকতা'য় বিশ্বাস করতেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্(১৯২২-১৯৭১) ছিলেন মূল ধারার লেখক। আর শওকত ওসমানকে মূল ধারার বলা হলেও তা এই কারণে যে, তিনি ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ 'আধুনিকতা'য় বিশ্বাস করতেন না। হাসান আজিজুল হকের মতে 'সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, নাস্তিকতার কাছ-ঘেঁষা মানবতন্ত্রী তিনি।'[৪৩] বাস্তবে তাঁর *ক্রীতদাসের হাসি*কে এর কোনো ধারার মধ্যে ফেলা যাবে না। ষাটের দশকের রাজনৈতিক-বন্ধ্যা পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষপর্বে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে যে জোয়ার আসে, অনুরূপভাবে কথাসাহিত্যেও জাতীয়তাবাদ প্রাধান্য বিস্তার করে। *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসের 'আধুনিকতা'র লক্ষণ এই প্রবণতার মধ্যেই নিহিত।

পাঁচ

'আধুনিকতা' বিষয়টিকে এই প্রবন্ধে নতুনত্বের গোত্রভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই ধারায় বাংলা কথাসাহিত্য যেভাবে নতুন নতুন চিন্তাচেতনায় ঋদ্ধ

হয়েছে, তার একটি ধারাক্রম উল্লেখ করে বাংলাদেশের উপন্যাসে তাঁর স্বরূপ যেমনটা দাঁড়াল, তা দেখানো হয়েছে। আর শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* সেই ধারাক্রমের সাথে 'আধুনিকতা'র প্রশ্নে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। বাংলাদেশি বাঙালির জাতীয়তাবোধের উন্মেষপর্বের সৃষ্টিকর্ম হিসেবে *ক্রীতদাসের হাসি*র মূল্যায়ন করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। অবশ্যিকভাবেই সমকালসম্পৃক্ততা অনিবার্য হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। রূপক-প্রতীকের আড়ালও সফল ছিল। তা সত্ত্বেও একজন পুরোদস্তুর 'আধুনিক' মানুষ হিসেবে শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি*তে আরও বেশি আধুনিকমনস্কতার পরিচয় প্রত্যাশিত ছিল।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস*(ঢাকা: ফ্রেন্ডস বুক কর্ণার, ২০০৩ , তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ৪১
২. তদেব, পৃ. ১৩৭
৩. তদেব, পৃ. ১৮৭
৪. তদেব, পৃ. ৩১৯
৫. ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় যে বাংলা গদ্যের সূচনা হয় উনিশ শতকে, বাংলা ভাষায় এখন পর্যন্ত সেটিই মূল ধারা। যদিও সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', আনিসুজ্জামান 'পুরোনো বাংলা গদ্যে', মোহাম্মদ আজম 'বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, অন্ততপক্ষে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়।
৬. এই অভিধাও ইংরেজমানসিকতাপুষ্ট। কেননা পাশ্চাত্য আদর্শায়িত উপন্যাসের কাঠামোকে এক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। প্রাচ্যের নিজস্ব ধারার প্রতি আগ্রহহীনতাই এর মূল কারণ। দেবেশ রায় তাঁর *উপন্যাস নিয়ে* গ্রন্থের 'বাংলা উপন্যাস' অধ্যায়ে দেখিয়েছেন যে, প্যারীচাঁদ মিত্রের(১৮১৪–১৮৮৩) *আলালের ঘরের দুলাল*(১৮৫৮) কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহের(১৮৪০–১৮৭০) *হুতোম প্যাঁচার নকশা*(১৮৬১-৬২) গ্রন্থেই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান আছে। উপন্যাস যেহেতু নির্দিষ্ট সীমারেখায় কিংবা সংজ্ঞায়নের মধ্যে আবদ্ধ কোনো শিল্প-আঙ্গিক নয়, সুতরাং এ-ধারায়ও নির্মিত হতে পারতো বাংলা উপন্যাসের কাঠামো।
৭. দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে*(কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩), পৃ. ২০

৮. অশ্রুকুমার সিকদার. *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*(কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী. ১৯৯৩ ,দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২
৯. তদেব, পৃ. ৫
১০. তদেব, পৃ. ৩৭
১১. তদেব, পৃ. ৪৫-৪৮
১২. তদেব, পৃ. ৫২
১৩. তদেব, পৃ. ৯৩
১৪. তদেব, পৃ. ৫৭
১৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল*(ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৬ ,দ্বিতীয় প্রকাশ), পৃ. ১২
১৬. এ-ব্যাপারে আবুল হুসেনের নিগ্রহের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। আবুল কাসেম ফজলুল হকের *বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল* গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য।
১৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল*(ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৬ ,দ্বিতীয় প্রকাশ), পৃ. ৩৯
১৮. তদেব, পৃ. ৩৮
১৯. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*(কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ২-৩
২০. সুবোধ চৌধুরী, *সাহিত্যিকা*(কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯৯৬), পৃ. ১৩৫
২১. লক্ষণগুলো হলো–১) মানবতাবাদ ২) যুক্তিবাদ ৩) সমাজ সচেতনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ৪) প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ৫) স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম ৬) নবধর্ম আন্দোলন ও সংস্কার প্রবণতা ৭) হৃদয়ধর্মের প্রতিষ্ঠা– রোমান্টিক চেতনার বিকাশ ৮) প্রাচীন ঐতিহ্য উদ্ধারের মাধ্যমে ক্লাসিক চেতনার বিকাশ ৯) গদ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ১০) আঙ্গিক সচেতনতা– বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্য ও কাব্য নির্মিতির প্রয়াস ১১) আত্মধর্মিতা ও মন্ময়তা ১২) নাট্যসৃষ্টির প্রয়াস। (সুবোধ, ১৯৯৬ : ১৩৬)
২২. শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. চৌদ্দ
২৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি', *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পা.(ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭), পৃ. ১৪৯
২৪. বেগম আকতার কামাল, 'শওকত ওসমানের সংস্কৃতিচিন্তা: একটি পাঠ-সমীক্ষা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১
২৫. সৌমিত্র শেখর, '*ক্রীতদাসের হাসির* প্রতীকধর্ম ও শিল্প-কুশলতা', *শওকত ওসমান ও ক্রীতদাসের হাসি: অনুসঙ্গ-প্রসঙ্গ*, বোরহান বুলবুল, অনুপম হাসান ও শামস্ আল্‌দীন সম্পা.(ঢাকা: রাবেয়া বুকস্, ২০১৫), পৃ. ১৩৫
২৬. পীযুস মণ্ডল, 'ক্রীতদাসের হাসি: শওকত ওসমান', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

২৭. উপন্যাসটি নিয়ে আবু রুশ্‌দ্ যে যে অসংগতির কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে মেহেরজান বেগম হওয়ার পরে জুবায়দার মুখোমুখি না হওয়া, বারবণিতার সামনে তাতারীর অটল ও অবিচল চারিত্রিক স্থিতি এবং বুসায়নার আকস্মিক আত্মহত্যার যৌক্তিকতা, মেহেরজানের তুলনামূলক কম উপস্থিতি ইত্যাদি প্রধান। (আবু রুশ্‌দ্, ২০১২: ৩৪-৩৮)

২৮. কুদরত-ই-হুদা, *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার*(ঢাকা: আদর্শ, ২০১৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৯৫

২৯. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৯৭

৩০. সৌমিত্র শেখর, '*ক্রীতদাসের হাসি*র প্রতীকধর্ম ও শিল্প-কুশলতা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

৩১. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, *শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও আবু ইসহাকের উপন্যাসে সামাজিক মূল্যবোধ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ১৬৩

৩২. গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*(ঢাকা: ভাষাপ্রকাশ, ২০১৯), পৃ. ১৪৪

৩৩. সৌমিত্র শেখর, '*ক্রীতদাসের হাসি*র প্রতীকধর্ম ও শিল্প-কুশলতা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

৩৪. গিয়াস শামীম, *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*(ঢাকা: প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫), পৃ. ১

৩৫. এক সাক্ষাৎকারে লেখক বলেছেন, 'আমি তো সমাজের মুর্দাফরাস। ঝাড়ু হাতে না নিয়ে কলম তুলে নিয়েছি।' (হুমায়ুন আজাদ, ২০১২: ৭১)

৩৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*(ঢাকা: আজকাল, ২০০৯), পৃ. ১১১

৩৭. শওকত ওসমান, *ক্রীতদাসের হাসি*(ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৭, দশম মুদ্রণ), পৃ. ৭

৩৮. তদেব, পৃ. ১৭

৩৯. তদেব, পৃ. ৭৪

৪০. আনিসুজ্জামান, 'শওকত ওসমান' *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পা. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৪১. আবু রুশ্‌দ্, *শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস*(ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন, ২০১২, দ্বিতীয় প্রকাশ), পৃ. ৩৩-৩৪

৪২. শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৫০

৪৩. শান্তনু কায়সার, *শওকত ওসমান*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৩), ৬৩।

সাহিত্যিকী
দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ | জুন ২০২২ | বাংলা বিভাগ
পৃষ্ঠা : ১০৯- ১২৮ | শব্দসংখ্যা ৩৯৩৭ | ISSN: 1994-4888 | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সিকদার আমিনুল হকের কবিতা : যাপিত জীবনের ক্লেদ ও জঙ্গমতা

শামীমা আক্তার*

Abstract

Shikder Aminul Haque(1942-2003) is an inimitably self-accomplished poet. In his poem, the uniform gamut of life and art is prevalent. He made his debut in Bengali literature by crafting '*Durer Karnish*' (1975). His poems usually bear graphic images of decayed time and spaces. This is because his poetry was sprouting in an environment tethered with colonial chaos and military rule. That is why his poetry embodies the crises of gradual disappearance of organic individuals in the rapid emanation of urbanization and modern civic life. The poet's mind has been suppressed with the tension of time and the experiences of a degraded society. Therefore, reflection of

* প্রভাষক | বাংলা বিভাগ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ | ই-মেইল: shamimaakter.ku@gmail.com

mutilated mentality is found in his poems. That is to say, the potential of his thought is triggered by the catastrophic experience of day to day battles. However, the signs of life are still found in his works where life's desire, vitality and motivation is active while the inner spontaneity is immensely disrupted. Thus, the fatigue of life and its spirit are embodied as the essence of his poetry. This article attempts to analyze how his works offer a complex texture of aesthetics amid the context of everyday struggles.

সারসংক্ষেপ

সিকদার আমিনুল হক আত্মস্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কবি। তাঁর কবিতায় জীবন ও শিল্পের অভিন্ন স্বরগ্রাম পরিলক্ষিত হয়। *দূরের কার্নিশ*(১৯৭৫) রচনার মাধ্যমে বাংলা কাব্যভুবনে তিনি প্রবেশ করেন তাঁর কবিতায় পরিব্যাপ্ত হয় ক্লেদযুক্ত সময় ও সমাজের চিত্র কারণ উপনিবেশশাসিত সমাজব্যবস্থা ও সামরিক শাসন অন্বিষ্ট প্রতিবেশে তাঁর কবিসত্তার বিকাশ ঘটে। সেইসূত্রেই, ক্রমবর্ধিষ্ণু নগরসভ্যতা ও নাগরিক জীবনের চোরাস্রোতে ব্যক্তিমানুষের ক্রমাগত বিলীন হওয়ার সংকট মূর্ত হয় কবিতায়। অবক্ষয়িত সমাজ সংসার, সময় ও জীবনএষণার টানাপোড়েনে কবির মানসপ্রবাহের অবদমন ঘটে এবং কবিতায় পড়ে বিকারজাত মানসিকতার প্রতিফলন। অর্থাৎ তাঁর চিন্তার জঙ্গমতা সক্রিয় হয় জীবনের ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের পারম্পর্যে। সকল ধরনের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট সমাজজীবনের ক্লেদাক্ত পরিস্থিতির ভেতরেও চলমান জীবনের চিহ্ন কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। এতে জীবনের সকল স্পৃহা, কর্মতৎপরতা ও প্রণোদনা সক্রিয় থাকলেও অন্তরস্থ স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাহত হয়। ফলে কাব্যবোধের সারাৎসার হিসেবে মূর্ত হয় জীবনের ক্লেদ ও তার জঙ্গমতার স্বরূপ। যাপিত জীবন-অভিজ্ঞানের সংশ্লেষে তাঁর কবিতা কীভাবে হয়ে ওঠে নন্দনবীক্ষার জটিলভাষ্য, এ নিবন্ধ তারই বিশ্লেষণপ্রয়াস।

সংকেত-শব্দ

অনিকেতচেতনা, আত্মতাড়িত, বুর্জোয়াবিলাসী, নৈরাশ্যবাদী, এ্যারিস্টটল, নার্সিসিজম

মূল-প্রবন্ধ

সিকদার আমিনুল হক((১৯৪২-২০০৩)-এর কবিতায় যে জীবনের রূপায়ণ ঘটে তা বহুভঙ্গিম ও নানাবিধ জটিলতায় আকীর্ণ। কেননা ব্যক্তি-অস্তিত্ব-অভীপ্সায় সমাজ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করলেও সমাজ সর্বদা ব্যক্তির আত্মবিকাশের দ্বার উন্মোচন করতে সমর্থ হয় না, বরং সমাজ দ্বারা ব্যক্তিসত্তা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত হয়। সংবেদনশীল ব্যক্তিসত্তা তাঁর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত অভিক্ষেপ দ্বারা আত্মচিহ্নিত হওয়ার প্রয়াসে ক্রমাগত সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। সমাজসংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি হয়ে ওঠে সমাজনির্বাসিত। সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি, মূল্যবোধশাসিত প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিলোক দ্বারা কবির স্বেচ্ছাচারী মানসপ্রবাহ যেমন দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ হয় তেমনি সমাজের অস্বাভাবিক বিকাশ, অস্থিতিশীলতা, আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অভিনিবেশের ক্রমাবনমন তাঁর মানসে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সমাজশাসিত জীবরূপে তাঁকে অভিনিবেশিত হতে হয় বিরূপ প্রতিবেশে এবং ব্যক্তিমনন ও তার অন্তর্চাপে অভ্যস্ত হতে হয় কীটতুল্য জীবনপরিক্রমণে। ফলে যাপিত জীবনের প্রবাহে তাঁর মধ্যে অভিব্যাপ্ত হয় একাকীত্ববোধ, বিচ্ছিন্নতাসহ অনিকেতচেতনায় উন্মূল মানসিকতা, বিমর্ষতা, ব্যর্থতা, আতঙ্ক, পতন, পচন, হতাশা-নৈরাশ্য, যন্ত্রণা অসুস্থতা, আত্মশ্লাঘা, ক্লীবতা, কুটিলতা, অতৃপ্ত যৌনবাসনা, ধর্ষকাম প্রবণতা, ক্রন্দন, আর্তহাহাকার ও বিষাদ। সভ্যতা, সমাজ ও বিশ্বজগৎ থেকে আহরিত জীবনাভিজ্ঞতা তাঁর চেতনায় প্রতিফলিত হয় এবং তাঁর চিন্তার ক্রমরূপান্তর ঘটে। তাঁর দৃষ্টিলোকে সমাজ সংসারের যে বাস্তবতা প্রজ্বলিত হয় সেখানে ক্লেদযুক্ত, কালিমালিপ্ত জীবনের অভিঘাত সুস্পষ্ট। জীবনের ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান তাঁর চিন্তার জঙ্গমতাকে সক্রিয় করে। তবে এ ক্লেদলিপ্ত জীবনের জঙ্গমতা তাঁর ভেতরে সহজাতভাবে নিহিত থাকে না। কবির ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সময় ও সময়স্পৃষ্ট ঘটনা দ্বারা ক্রমসংঘর্ষমুখরতার ফলে তাঁর মানসপ্রবাহ নির্দিষ্টভাবে বাক্‌মণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় যে ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতার রূপকল্প নির্মিত হয় তা ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সময়, সমাজ ও বৈশ্বিক পরিসরে অন্বিত থাকে।

২

সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় প্রতিফলিত ক্লেদলিপ্ত অভিজ্ঞান ও চিন্তার জঙ্গমতার ধারাবাহিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যে পঙ্কিল বাস্তবের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়, কবিতায় তার রূপকল্প যেমন নির্মিত হয় তেমনি সে বাস্তবতা হতে অর্জিত অভিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা কবিমানসে প্রতিফলিত হয়ে কবিতায় বৌদ্ধিক সংশ্লেষ বৃদ্ধি করে। কবিতার ক্লেদময় জীবনচিত্রের নেপথ্যে দায়ী বৈশ্বিক প্রভাবসঞ্জাত জীবনবীক্ষা থেকে ব্যক্তির একান্ত অন্তর্চারী ভুবনের টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্বসংঘাত। ব্যক্তিমানসের বিশ্বপথিক হয়ে ওঠার যন্ত্রণাক্ষুব্ধ দৃষ্টিপ্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য(জ. ১৯৪৯)-এর মন্তব্য :

> প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে সংশয় যত বেড়েছে, আত্মবিরোধের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে আরো। নিষ্ঠুর ও নিষ্ফল বেদনায় যত রিক্ত বলে প্রতিভাত হয়েছে যত্নে গড়া সভ্যতা, জটিল অন্তর্মুখিনতায় আরক্ত হয়ে উঠেছে জীবনের সমস্ত দিগন্ত। ব্যক্তি হৃদয়ের সঙ্গে যুগমানসের এমন তীব্র বিরোধ দেখা দিয়েছে আধুনিকের কাছে যা সমাধানের অতীত। বাস্তবের অন্তঃস্থিত অন্য এক নিগূঢ় জগতের কল্পনা অনিবার্য হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে; একই সঙ্গে শব্দের নিহিত সীমা অতিক্রম করে অন্তর্বর্তী কোনো নৈঃশব্দ্যের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে সমকালীন মন। সত্য-অন্বেষণের তাগিদে অতি-অভ্যস্ত ভূগোল-নিয়ন্ত্রিত-সাংস্কৃতিক পরিধিকে পেরিয়ে যেতে চেয়েছে মানুষ বিশ্বপথিক হয়েই প্রতিটি দেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন করতে চেয়েছে।[১]

সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন কিংবা কবির অভিজ্ঞতার আধার পূর্ণ করার প্রত্যয়ে অথবা উভয় প্রয়োজনেই সিকদার আমিনুল হকের বিশ্বপথিক হয়ে ওঠার যন্ত্রণা তীব্র। বহির্পৃথিবীর অগণন ভ্রান্তিতে দগ্ধ হয়ে তিনি আহত হয়ে ওঠেন, কবিতায় করুণসুর বেজে ওঠে, যেখানে বঞ্চিত মানুষের আর্তস্বর, পৃথিবীব্যাপী মানুষের প্রতি অবমাননা-অনাচার অস্ত্রের ঝনঝনানি, শোষকের নিষ্ঠুরতা আর সত্য-সুন্দর-কল্যাণকে অবদমিত করে রাখার চিত্রকল্প নির্মিত হয় কবিতায়। নানা দ্বন্দ্বক্ষোভের অভিক্ষেপের রক্তক্ষরণে তাঁকে ক্রমশ আত্মতাড়িত ও স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে উঠতে হয়। পারিপার্শ্বিক জগতের ক্লেদ ও অবক্ষয় কবিতায় চিত্রিত হয় :

> নিজের জীবনের ইতিহাসই সবচেয়ে সঙ্গীতময় ও সুন্দর অথচ দীর্ঘ। [...] অন্য শতাব্দীর ইতিহাস ঘন শৈবালে ঢাকা, ক্রুদ্ধ অশ্বারোহীর, পদে পদে নিষ্ঠুরতা আর অগণন ভ্রান্তিতে ভরা-রাত্রির ধর্ষণে তার অনেকটাই ভীতিময়–! আর কত কলঙ্কিত করবো এই ছন্দ? যা খুব বেশি দিনেরও নয়; যদিও জনশ্রুতি নির্জন ও নিস্তব্ধতার। [...] কিছুটা হাওয়ার আর দীর্ঘশ্বাস জড়ানো পবিত্র পৃথিবীর [...]
>
> ('কবিতার শেষ কথাগুলি [...]' : *সতত ডানার মানুষ*) [২]

বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষে বিশ্বসভ্যতার ক্রমোন্নয়ন ঘটে; আধুনিক মানুষ পৃথিবীর বাইরে সৌরজগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখে অথচ পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের সত্যতা বিষয়ে তাকে অজ্ঞ থাকতে হয়। এ অজ্ঞতা ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত অবহেলা নয়, সভ্যতার বিকৃত প্রভাবে সত্য অবদমিত থাকে অর্থাৎ সভ্যতার তিমিরাচ্ছন্নতা এখনো পৃথিবীতে সর্বতোভাবে বিস্তৃত। পৃথিবীর মানুষের চিন্তা, মনন, অভিজ্ঞান এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি হাত ধরে চলতে থাকে পাশবিকতা, পৈশাচিকতা, বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতা। প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করার অভিপ্রায়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তার আবিষ্কৃত শক্তি এখন বিশ্বসভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার, পারমাণবিক বোমা যার গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। স্বৈরশাসনের রোষানলে পতিত একেকটি সভ্যতার অনিবার্য পতন ঘটে; তার পতনের নেপথ্যে কোনো সুস্পষ্ট কারণ কিংবা অভিযোগ উন্মোচিত হয় না। মানবসভ্যতা ধ্বংসের, সত্য-সুন্দরকে বিসর্জনের ঘটনাগুলোর চারপাশে শৈবালের আবরণ গড়ে ওঠে ফলে তা অপ্রকাশিতই রয়ে যায়। 'ক্রুদ্ধ অশ্বারোহী, পদে পদে নিষ্ঠুরতা, অগণন ভ্রান্তি আর/রাত্রির ধর্ষণ' সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষের জন্য ভয়ঙ্কর নেতিবাচক শব্দগুচ্ছ, যার ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভীষিকাময় রূপ উন্মোচিত হয়। ক্রুদ্ধ অশ্বারোহী দ্বারা পৃথিবীর ভয়ঙ্কর স্বৈরশাসকের চিত্র মূর্ত হয় যার মনুষ্যত্ববর্জিত নৃশংসতার নিকট পৃথিবীর মানবতা অসহায়, ক্লিষ্ট। ফলে বিশ্বায়নের কল্যাণে পৃথিবী অবাধ সঞ্চরণশীল গ্রহ হলেও ব্যক্তি সেখানে নির্বাসিত। স্বগোত্র বা স্বদেশ পেরিয়ে অন্যজাতি বা ভূখণ্ড সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হওয়ার যন্ত্রণা সীমাহীন কারণ সমগ্র পৃথিবীর গল্পই যুদ্ধোন্মত্ত গোষ্ঠীর নৃশংসতার গল্প আর তার ফলে উদ্ভূত হয় মেকিত্ব, অন্তঃসারশূন্যতা, সভ্যতার নিস্ফলতা, বাহ্যিক আড়ম্বর, আর বিবমিষার ঘনঘটা :

> একটা ট্যাঙ্কের নিচে শুয়ে থেকে মানুষটি আজ
> ছবি হয়ে গেলো। কত মূল্যবান এই স্থির ছবি
> পশ্চিমা সংবাদের খাদ্য। ছবি ওঠে ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক
> শাদাদের ক্যামেরায় : রাত্রে যাবে আলজাজিরায়।
> ('পৃথিবী এখন আজ' : *অপ্রকাশিত অগ্রন্থিত কবিতা*) [৩]

পৃথিবীর ওপর ঘটে যাওয়া নৃশংসতায় অভিমানক্ষুব্ধ কবি পৃথিবীকে শ্লেষ করেন : 'পৃথিবী এখন, আজ, বেড়ালের মতো ধড়িবাজ!' মানবিকতা, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবর্তে 'সাঁজোয়া বহর, মর্টার, গ্রেনেড, ক্রুজ, বিস্ফোরকের ছড়াছড়ি, পণ্য হিসেবে ব্যাপক আমদানি রপ্তানি চলে রণতরি, গ্যাসমাস্ক আর পৃথিবীর গন্তব্যপথ—অসংখ্য মৃত্যুধ্বংস আর লাশের বহরের ওপর দিয়ে শোষকগোষ্ঠীর শ্যাম্পেন নিদ্রা। এ অমানবিকতাকে বাধা দেবার মতো সম্মিলিত শক্তি পৃথিবীতে গড়ে ওঠে না। বরং ট্যাঙ্কের নিচে পড়ে থাকা লাশ নিয়ে প্রচার মাধ্যমের শুরু হয় নতুন বাণিজ্যিক কলাকৌশল। প্রচারমাধ্যম এক নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বড়ো বড়ো সংকট, গণহত্যার মতো ঘটনাগুলোকে যথাযথরূপে তুলে আনতে পারাটা কিংবা সমস্যার সমাধানে সুচারুপদক্ষেপ গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা একটি লাশের স্থিরচিত্রের মাধ্যমে পেশাগত সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। মানবিকতার নামে চলে অমানবিকতা আর স্বেচ্ছাচারিতার বহর। যুদ্ধসঙ্কুল ভয়ঙ্কর পৃথিবী কবিতায় নেতিবাচকতাকে বাক্‌মণ্ডিত করে; গৃহযুদ্ধের(Civil War) ভয়াবহতা তথা মানবসভ্যতার নেতিবাচকতা চিত্রিত হয় :

> গৃহযুদ্ধের দেশগুলি—তাদের নরক আর দিনের বাস্তবতার কথা ভাবলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে। পথে পথে হাঁটছি অথচ তাদের বারান্দায় কোনো তরুণীর ওড়নার অহংকার অথবা স্তনভার পোশাকের জেল্লা নেই। রক্তাক্ত আর্তনাদ তাদের পোর্টিকোর নিচে জড়ো হয়ে কেবলই পুরোনো সিঁড়িটাকেই পিচ্ছিল করে।
>
> ('সেই চিঠি মধ্য সমুদ্রের [...]' : *সতত ডানার মানুষ*) [৪]

গৃহযুদ্ধ আধুনিক সময়ের পরিচিত অনুষঙ্গ—ক্ষমতার দৌরাত্ম্যে যেখানে নারকীয় প্রতিবেশের অনুবর্তন ঘটে বছরের পর বছর। জীবনযাপনের স্বাভাবিক স্থৈর্য ও সম্ভব প্রতিনিয়ত আরক্ত হয়। মানুষকে ক্রমাগত অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম

করতে হয়। অসংখ্য মৃত্যু আর অজস্র রক্ত পুরানো সিঁড়িটাকে আরো পিচ্ছিল করে। আদিম বর্বরতা, পৈশাচিকতা ও প্রতিহিংসা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। সিকদার আমিনুল হক বিশ্বসভ্যতার তীব্র বাস্তবতার দায় এড়াতে পারেন না। তাঁর কবিতায় মূর্ত হয় পৃথিবীর অন্তঃসারশূন্যতা, ধনতন্ত্রের জৌলুস, ক্ষমতার বাগাড়ম্বরের বিকৃত চিত্র কারণ তিনি এ সময়, সমাজ ও পৃথিবী তাঁর চেতনাকে শাসন করে। হাসান আজিজুল হক(জ. ১৯৩৯) 'জীবনের জঙ্গমতা : লেখকের দায়' প্রবন্ধে সাহিত্যিকের সচেতনতার দায় প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন :

> লেখককে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হতেই হবে। টানটান করে ছিলা পরানো ধনুক যেমন স্থাণু অবস্থাতেও প্রচণ্ড শক্তি নিজের মধ্যে সংহত করে রাখে, লেখকের সচেতনতাও তেমনি। তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সদা প্রস্তুত। যখন লেখার কাজ করেন তখন, এবং যখন করেন না তখনো। তাঁর নিজের এই চেতনাই ছড়িয়ে পড়ে তার বিকাশ বিবর্তন, সংঘাত, প্রবহমান ব্যক্তিজীবন ও সংঘজীবন, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি সবই লেখকের চেতনার আওতায় আসবে এবং লেখক তার লেখার মধ্যে এই সবকিছুরই নতুন নতুন মাত্রা আমাদের দেখিয়ে দেবেন। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতাকে নিয়ে যাবেন জনজীবনের তলদেশ পর্যন্ত এবং সেই আয়াসলব্ধ অভিজ্ঞতাকে বাস্তব জীবনপ্রবাহের মতোই সৃষ্টিশীলভাবে তাঁর রচনায় বিন্যস্ত করবেন।[৫]

সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় নগর চেতনার সন্নিবেশ ঘটে। শহরের বিপন্নরূপ, মলিন পরিস্থিতি, তার অন্তর্গত নাগরিক জীবনযাপন, তাদের বিকাশবিবর্তন, সংঘাতসৃষ্ট জীবনের বিচিত্র জটিলতার অবক্ষিপ্ন রূপের স্ফূরণ ঘটে তাঁর কবিতায়। নাগরিক জীবন বহুবিভঙ্গে আরক্তিম। নগর প্রতিবেশে তাদের জীবনপ্রবাহকে চৈতন্যে লালন করতে গিয়ে কবি রক্তাক্ত হন। কবিতায় শহরের রূপকল্প নির্মিত হয় :

> শহর বিষণ্ন থাকে নানাভাবে। তার এই জ্বর
> অক্লান্ত চেষ্টার ফল চতুর্দিকে বিতর্কিত বাতি,
> পেট্রোল, রোদের তাপ, ডাস্টবিন, রেস্তরাঁর গান,
> ক্লিনিকের ভেজা তুলো, অর্থহীন দোকানের সারি,
> শহরে থাকে না আজ আর লোক! জীবিকারা রাতে
> হয়তো ঘুমায় আজও, যতক্ষণ অস্থি খুলে পড়ে।
> ('এ শহর কোনো শিল্প নয়': *শ্রেষ্ঠ কবিতা*)[৬]

বোদলেয়ারীয় দৃষ্টিলোকে শহর কবির দৃষ্টিনিয়নদীপে প্রতিভাত হয়। বোদলেয়ার যেমন প্যারিস শহরের নর্দমা থেকে আরম্ভ করে সমাজের পাপীতাপী, বিকারগ্রস্ত অধঃপতিত চৈতন্যকে কবিতায় তুলে আনেন সিকদার আমিনুল হকও জীবনের যাবতীয় বিবমিষাকে পর্যবেক্ষণ করেন গভীর প্রজ্ঞায় এবং তা কবিতায় ব্যঞ্জনা পায়। বোদলেয়ার সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু(১৯০৮-১৯৭৪)-এর মন্তব্য :

> বোদলেয়ারে এমন কেউ নেই—খুনে, মাতাল, লম্পট কিংবা অভাজন, কেউ নেই যে চৈতন্যের দ্বারা আক্রান্ত ও পীড়িত হয়, ভাবনা যার অন্ত্রে-তন্ত্রে দংশন করেনি, কিংবা যার বিবেক ভার প্রতিভূ-কবি বহন করছেন না। মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী; মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী, মানুষ রুগ্‌ণ, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্‌ণ; মানুষ মুমূর্ষু, এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু; মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী: বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে, [...] এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। সকলে জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবে না? কিন্তু কবিরা জানুন।[৭]

কবিকে পৃথিবীর প্রকৃত সত্যের স্বরূপকে চৈতন্যে লালন করার প্রত্যয়ে দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ হতে হয়। শহরের জৌলুস চাকচিক্যময়তার পাশাপাশি কবির দৃষ্টিলোকে জ্ঞাত হয় তার বিষণ্ন রূপ, যা জীবনের বিবমিষারূপে প্রতিরূপ, রোদের তীক্ষ্ণ তাপ, পেট্রোল, অসংখ্য বাতি, রেস্তরাঁর কোলাহল, দোকানপাট, জীবিকার অনুসন্ধান আর হাসপাতালের রুগ্‌ণতা, বিপন্নতার সাক্ষ্যবাহী ভেজাতুলোর ভয়াবহ উপস্থিতিতে জনজীবন রুদ্ধ। যেখানে শহরভর্তি জীবনের চারপাশে এত ব্যস্ততার ঘনঘটা সেখানে জীবন কোথায়? জীবন তার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে শহরের চাপে। তাই কবির দৃষ্টিতে শহর অভিব্যঞ্জনা পায় :

> উত্তর থেকে দক্ষিণ
> পূর্ব থেকে পশ্চিম
> এই শহরটা ইদানীং মেয়েদের ব্রার হুকের মতো
> জং-ধরা এক করুণ আক্র।
> যেখান থেকে শুরু করো মাপজোক, নিশ্চিতই
> ফল হবে
> বিষণ্নতা। প্রগাঢ়ও নয়, জং-ধরা এক বিষণ্নতা! [...]
> ('স্কিৎসোফ্রেনিয়া' : *ঈশিতার অন্ধকার শুয়ে আছে*)[৮]

শহরের বিষণ্নতা, শহরজীবনের অপূর্ণতা ক্ষোভ এবং নাগরিকের দুর্ভোগের নেপথ্যে প্রথাপদ্ধতি, মূল্যবোধ, রীতিনীতি দায়ী। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেমন প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি, চিন্তাচেতনা, মূল্যবোধের বিবর্তন ঘটায় তেমনি ব্যক্তিমানুষের অবক্ষয়, বিবেকহীনতা, স্বার্থপরতাও সমাজের অবক্ষয়ের কারণ। সামাজিক পদ্ধতিও অনেকাংশে দায়ী সমাজের স্বেচ্ছাচারিতায়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এ সংকট আরো তীব্র। বুর্জোয়াদের স্বার্থান্বেষী মানসিক সমাজে নৈতিকতার মানদণ্ড(moral development) বদলে যায়। একইসঙ্গে রাজনৈতিক অভিসন্ধিতা একই কাজ করে। সমাজজীবনের ক্লেদাক্ত রূপ কবিতায় ব্যঞ্জিত হয় :

> এখানে প্রাজ্ঞরা নেই, বুর্জোয়ার শুধু হাততালি
> আর লোভ মুখ্য কাজ। খেতাবের মৌন সম্মতিতে
> দাসত্বের তোষামোদ। রাজনীতিতে তো বটে, এমন
> যে পণ্ডিত, যদি বলো, তারাও ভালুক—
> নাচ নাচে শহরের কেন্দ্রস্থলে, অলিতে গলিতে।
> ('আছি বার্ধক্যের আশায়' : *পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল*) [৯]

রাজনৈতিক সুবিধাকাঙ্ক্ষী ও বুর্জোয়াবিলাসীদের নিয়ন্ত্রণে সমাজের সকলকিছু। সমাজের নিয়ন্ত্রক তারা। লাভ ও লোভের দুনির্বার আকাঙ্ক্ষায় মত্ত সুবিধাভোগীদের শোষণের যাতাকলে পিষ্ট সমাজের সাধারণ মানুষ। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের ন্যূনতম সুযোগটুকু মেলে না সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর। এমন প্রতিবেশে কবি হয়ে বেঁচে থাকা আর প্রতিদিন অস্তিত্বরক্ষার্থে লড়াই করে যাওয়া কঠিন কাজ। বিত্তের প্রভায় ঝলমলে মানুষের নিকট অন্যান্যরা হেয় প্রতিপন্ন হয় :

> তোমাদের সব আছে, আগ্রহের হাততালি,
> নিজস্ব পত্রিকা, নিয়মিত ভেট, রঙিন বেলুন
> উড়ছে সতত পৃষ্ঠপোষকদের হাত থেকে।
> আছে মিছিলের স্বাগত ব্যান্ড,
> প্যাণ্ডেল সাজানো ফুল পাতা;
> আছে উঁচু নীলিমা-ওঠার মজবুত সিঁড়ি, আছে
> সুখী মোটাসোটা খাটে বা ডিভানে ঝলমলে করা
> অর্থকুমিরের
> শোচনীয় উপেক্ষিতা বেগমের ভক্ত টেলিফোন।
> ('কবিতা তোমার দুর্ভোগ' : *পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল*) [১০]

সমাজের সম্পদ কুক্ষিগত করে যারা বিলাসিতার বহর তৈরির মাধ্যমে অপরিমেয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বিজয়ীর হাসি নিয়ে বিচরণ করে, কবিতায় তাদের প্রতি কটাক্ষপাত প্রকাশ পায়। কবির অভিমানক্ষুব্ধ স্বরের আর্তহাহাকার ধ্বনিত হয় এ কবিতায়। সমাজের অবক্ষয় কবির মানসে বিরূপ প্রভাব রাখে। সমাজব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা থেকে কবির নিরাপত্তার অভাব প্রগাঢ় হয় এবং তাঁর অবক্ষিণ্ন মানস প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে ব্যক্তিমনে জমে সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মনোভাব, জীবনের প্রতি বিরূপতাসহ ক্লেদাক্ত অনুভূতি। তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় :

> সমস্ত রকম মূল্যবোধ ও মৌল মানবিক প্রত্যয় আধুনিক মানুষের কাছে নিশ্চিহ্ন কেননা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি আত্মবিলাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত। আধুনিকের অস্তিত্ব সংকট এজন্যেই তীব্রতর যে, যে যুক্তিবাদ মানুষের সভ্যতার মেরুদণ্ড— তার জন্যে তা-ই অভিশাপ। যে দ্বন্দ্ববোধ সমাধানের অতীত, তার মুখোমুখি হয়ে যন্ত্রণার পরিধি প্রসারিত হয়েছে।[১১]

বৈশ্বিক প্রতিবেশ ও সমাজস্থিত পরিবর্তিত আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির ক্রিয়ায় সিকদার আমিনুল হকের ব্যক্তিক্লেদ কবিতায় নির্মিত হয় বিচ্ছিন্নতা, সম্ভোগতাড়িত মানসিকতা, রিরংসাপ্রিয় দেহজ প্রেম, ক্লান্তি ও নির্বেদের সমাবেশে। তাঁর কবিতায় বিচ্ছিন্নতার বেদনা বারবার ব্যক্ত হয়। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্পর্ক, জীবন ও জীবিকা সকল ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত ও সঙ্কটের টানাপোড়েনে ব্যক্তি মানসে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে। কবিতায় বিচ্ছিন্নতার অনুভব থেকে জন্ম নেয় নানা ধরনের অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা। সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি আরোপিত নয়, তা সময় ও সত্তার অভিঘাতে সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে জন্মলাভ করে। বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> [...] মানবসভ্যতার বিকাশের ধারায় জীবনের জটিলতা থেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় সমাজে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব ঘটেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক নানান অভিঘাতে মানবমনে উপ্ত হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। যুগের পরিবর্তনে মানুষের জীবন যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি বিচ্ছিন্নতার ধারণায়ও ঘটেছে রূপান্তর। [...] প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীব্যাপী সামূহিক বৈনাশিকতার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট অবক্ষয় মানুষকে

> বিচ্ছিন্নতার বেদনায় জর্জরিত করেছে। এছাড়া পুঁজিবাদের উৎকট শোষণ মানুষকে বহুবিধ সমস্যা-সঙ্কটে নিমজ্জিত করে বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত করেছে।[১২]

সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি কাব্যবিষয়রূপে অন্বিত হয়। কবির বিচ্ছিন্ন সত্তা সকল সম্পর্ককে অতিক্রান্ত করে দেশে দেশে, কালে কালে বিচরণ করে। তিনি পৃথিবীর পরিব্রাজক কিন্তু কোথাও তাঁর হার্দিক সম্পর্ক স্থাপন হয় না। দ্রষ্টার দৃষ্টি নিয়ে বিশ্ববীক্ষণ করা এবং সবকিছু থেকে দূরে অবস্থান তাঁর স্বভাবজাত। বিচ্ছিন্নতা বিবমিষা তাঁর ভেতর বিভ্রমের জন্ম দেয় :

[...] আমি সেই লোক, বন্দরের
নীল জলে দেখতাম বহু সন্ধ্যা। ঘন কালো চুলে
চিরুনি বুলিয়ে, শেষে নামতাম টায়ার বা গ্রিসে:
বসন্তের রাত্রি খুব জব্দ করা : মদ-মাংসই নয়,
কামুক ডাইনি লাগে নাবিকের। [...] সময়ের পাপ
গর্তে ঢোকে কাঁকড়ার মতো। আমি ভয়ঙ্কর গন্ধ—
কিছুতেই আর নেই। ঝুলিতে রয়েছে তাজা স্মৃতি
ওকগাছ আর গুহা। মেক্সিকোর উৎকট মদিরা—
হাঙর মাছের ঝোল। [...] রেস্তরাঁয় টিপস ছুড়ে দিয়ে
দামেস্কের পাখি আর বিড়ালের বাজার চষেছি
নিতান্ত শখের বশে। [...] কিন্তু তারপর, এই মর্গ!
দেখি, অজগর নয়, পেটে নিচ্ছে কাফকার জামা!
('কাফকার জামা' : *কাফকার জামা*) [১৩]

বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে কবির মানসভ্রমণ চলে বন্দরের নীল জলে, গ্রিক সভ্যতা, মেক্সিকো, রেস্তোরা, পাখি, বিড়াল অজগর তাঁর কবিতার চিত্ররূপে বস্তুময়তায় বিন্যাসিত হলেও এগুলো বাস্তব জগতের অবভাস নির্মাণ করে। বিশ্বপরিব্রাজকরূপে পরিপার্শ্ব অবলোকনের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে কবি অস্মিতার স্বরূপ সন্ধান করেন। মদমাংসের সচেতন জগৎ থেকে কবি প্রবেশ করেন অচেতন স্তরে। কবিতায় 'কাঁকড়া' লিবিডোরূপে(libido) উপস্থিত হয় যা সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সময়ের হাত ধরেই কবির অচেতন জগৎ পাপের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাস্তবের অবদমিত স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা কল্পনার জগতে স্বপ্নবিলাসী এবং সম্ভোগলিপ্সু হয়ে

ওঠে। সেখানে পাওয়া যায় জীবনলিপ্সায় অধীত একজন সৌখিন ব্যক্তিসত্তাকে কিন্তু জাগরণপর্বেই কবি পতিত হন মর্গসদৃশ পৃথিবীতে যেখানে তাঁর অসহায়দীর্ণ আত্মার ক্ষরণ স্ফূরিত হয়।

আত্মবিচ্ছিন্নতা, সমাজের প্রতি বিবমিষা, ব্যক্তিসত্তার নিপীড়ন থেকে ব্যক্তির মধ্যে জন্ম নেয় নৈরাশ্যবোধ। শোষণ, বঞ্চনা, হতাশা হাত ধরাধরি করে ব্যক্তিমানসকে নৈরাশ্যবাদী করে তোলে এবং কবি আত্মক্লেদ জর্জরিত হন। কবিতায় সিকদার আমিনুল হকের নৈরাশ্যবাদী অনুভবের প্রকাশ :

> এখন হাতটি তার সবচেয়ে অন্ধকার রাত।
> আঙুলের ডগা নীল, নখে নেই রৌদ্রোজ্জ্বল দ্যুতি;
> করতল রেখাচ্ছন্ন, তার মানে ভবিষ্যৎ নেই;
> কোনো পরিষ্কার ভাগ্য! মানুষের হাতই আগে জানে
> জীবনের পরিণাম, তাই তাতে হতাশার ছায়া
> এমন করুণ আর স্পষ্ট। শিরা-উপশিরা সব
> থেমে থেমে চলে; অন্তঃপুর খুব জরাজীর্ণ, রক্ত
> ওঠে-নামে প্রস্তুতির পর্ব ছাড়া। বড়ো একা লাগে
> শীতের সম্পূর্ণ মাস।
> ('কবির শীতার্ত হাত' : *ঈশিতার অন্ধকার শুয়ে আছে*) [১৪]

জীবনযাপনের প্রবাহে কবির নিয়তিতে যুক্ত হয় না সৌভাগ্যের কররেখা। করুণ হতাশা আর কষ্ট নিয়ে তার সকল শিরা উপশিরা বয়ে চলে। বিষণ্নতা আর বিপন্নতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাঁর জীবন। জীবনের সামূহিক নৈরাশ্য আর ব্যর্থতা বিস্মৃত হতে কবি স্থিত হন নারীসংস্পর্শে। তাঁর নারীপ্রেম ভোগসঞ্জাত। অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার ধারায় কবি যে নাগরিক প্রেমবাসনাকে কবিতায় মূর্ত করেন তা কামবাসনা জর্জর। ষাটের কবিতায় সম্ভোগজাত প্রেমবাসনার যে চিত্র বায়তুল্লাহ কাদেরী মূর্ত করেন সিকদার আমিনুল হকের সম্ভোগজাত প্রেমচেতনা সম্পর্কে তা প্রাসঙ্গিক:

> ষাটের দশকের কবিতায় শরীরী-উত্তাপের টানে প্রেম ভোগেরই নামান্তর। নারীদেহের উত্তেজক বাঁক ও সৌন্দর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁদের নিঃসঙ্কোচ যৌনচেতনা কার্যকর। কখনো কখনো কবিদের নারীসঙ্গ ঘটে গণিকা-সংস্পর্শে। তাই উদ্যানে, ল্যাম্পপোস্টে ঠাণ্ডা, জড় ও মুহূর্তের বাণিজ্যিকী উপায়েই তাঁদের

> রিরংসা নিবৃত্তি ঘটে। অসুস্থ, নষ্ট ও অভিশপ্ত নগরে নারীও যেন প্রেমহীন নিরাবেগ এক শরীরী বাসনার মধ্যে চিত্রিত। তাঁদের চিত্রিত নারীও কোনো আবেগ-অনুভূতিসম্পন্ন আকার নয়, বরং পুরুষবাদী মানসিকতায়, ভোগ ও বস্তুতুল্য ক্রীড়নক বিশেষ। প্রখর ব্যক্তিত্বপ্রবণ, সৃষ্টিশীল সম্ভাবনা ও সভ্যতার প্রাগ্রসরমানতার সঙ্গিনী হিসেবে নারীকে তাঁরা গ্রহণ করেননি। নারীর শরীরী রূপ (প্রকৃতির সৌন্দর্যবস্তুর সারাৎসার হিসেবে যেহেতু অন্যান্য নিসর্গ-বর্ণনা ষাটের কবিদের মধ্যে খুব একটা নেই), যৌবন ও কামপ্রতপ্ত সত্তাটিকেই তাঁরা বর্ণনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। শরীরের প্রয়োজনেই তাঁরা তাৎক্ষণিক কামনা করেছেন নারী সান্নিধ্যে।[১৫]

সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় নারীপ্রেমও ব্যতিক্রম নয়। কবির নারীপ্রেমকল্প 'সুলতা'। এক নারী থেকে বহু নারীর মধ্যে তিনি সুলতাকে খুঁজে পান। সুলতা কোনো নির্দিষ্ট নয়। কাব্যের বিভিন্ন স্থানে সুলতার অবয়বগত এবং মানসগত তারতম্য দেখা যায়। সুলতা কখনো পরস্ত্রী, কখনো গণিকা, কখনো নার্স, কখনো দাসী, কখনো বেদেনি আবার কখনোবা তারকা। তাঁর মানসের দ্বন্দ্ববিক্ষোভে তাদের সঙ্গে কবির সম্পর্কেরও টানাপোড়েন ঘটে। প্রেম চৈতন্য থেকে সম্ভোগে আর সম্ভোগ থেকে চৈতন্যে দোলাচল করে। নাগরিক জীবনের অভ্যন্তরে তিনি সুলতাদের প্রত্যক্ষ করেন। অচেনা গৃহিণীর যান্ত্রিক আচরণ, তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, অলস তন্দ্রাময় বিশ্রাম কবিকে রিরংসাগ্রস্ত করে তোলে। নগরের নারীদের সাজসজ্জা আর আচার আচরণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কবির সম্ভোগ জাত দৃষ্টিলোক জীবন্ত হয়ে ওঠে :

> […] অপরূপ
> কামিজের জলে-ভরা শীর্ষদেশ; শাড়ি যেন নদী
> সুগোল নিতম্বে গিয়ে আর শান্ত নয়! বিকেলের
> স্নানে, শ্যাম্পু-চুল আফ্রিকার জঙ্গলের মতো বুনো;
> নখের নক্ষত্র-আলো শিকারিকে ডাকে! কারো চোখ
> ঘিয়ে রং, কালো দিঘি,—দূর থেকে সবাই গভীর
> ('মহিলাদের যখন দেখি পার্টিতে' : *সুপ্রভাত হে বারান্দা*) [১৬]

পার্টিতে অবস্থানরত সুসজ্জিত' নারীর সঙ্গে কবির শিকার-শিকারীর সম্পর্ক। কামপ্রতপ্ত কবির দৃষ্টিলোক তাঁর বিকারগ্রস্ত মানসকে উন্মোচন করে।

৩

সময়ের অভিগমনে কবির মানসরেখায় অভিজ্ঞতাপুঞ্জ জড়ো হয়। অধীত বিদ্যা, অভিজ্ঞান, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির দৃষ্টিলোক বিভিন্ন সময়ে কবির স্বাভাবিক চিন্তাচেতনার ওপর প্রভাব রাখে, ফলে তাঁর চিন্তারেখায় গতিশীলতার পারম্পর্য লক্ষিত হয়। অর্জিত শিক্ষা, অধীত জ্ঞানের সঙ্গে যখন বাস্তব পৃথিবীর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় তখন তিনি দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ হন, হতাশা-নৈরাশ্য তাঁকে আঁকশির মতো চেপে ধরে; আবার আত্মক্লেদের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত থাকতে থাকতেই তিনি আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন। সমস্ত তমসাচ্ছন্নতার ভেতরেই তিনি অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পরিপার্শ্বের যাবতীয় বৈপরীত্যকে কণ্ঠলগ্ন করেই তিনি কবিতায় বেঁচে থাকার চিহ্ন অঙ্কন করেন এবং তাঁর নিকট তুচ্ছ হয়ে ওঠে না বস্তুবাদী পৃথিবী। সমালোচকের ভাষায় :

> গতিশীল জীবনপ্রবাহে কবি তাঁর সত্তাকে নিঃসঙ্গ উপলব্ধি করেছেন, তবুও জীবনের দায়িত্ব মেনে নিয়ে, সকল অভিজ্ঞতা দিয়ে কবি অনুভব করেছেন অর্থহীন উচ্চাশাই তাঁর এই পরিণতির জন্যে দায়ী। অস্তিত্বের এই তীব্র সংকটকে তিনি অলীক হিসেবে চিহ্নিত না করে তাকে বাস্তবজ্ঞান পর্যালোচনার পক্ষপাতী, তাই তিনি লেখেন : 'আমি জানি ছায়া নয়, আমার বিষয় আমি নিজে।'[১৭]

সমালোচকের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হলেও তিনি সিকদার আমিনুল হকের উপলব্ধির নিঃসঙ্গতার জন্য তাঁর অর্থহীন উচ্চাশাকে দায়ী করেন যা সমালোচনাযোগ্য। সিকদার আমিনুল হক সমকালীন সময় ও প্রতিবেশের বৈরী প্রভাবে বিপন্ন থাকেন যার চিহ্ন তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে উপস্থিত। পৃথিবীব্যাপী অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা, ধনতন্ত্রের আগ্রাসন, মানবজীবনের অনিশ্চয়তা আতঙ্ক, সংবিধান প্রণীত নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তার অধিকার কার্যকরে ব্যর্থতা, মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতার অবলুপ্তি তাঁকে বিষণ্নতায় নিমজ্জিত করে এবং তিনি আত্মক্লেদে মগ্ন হন। রাষ্ট্র, সংবিধান ও নাগরিকতা সম্পর্কে এ্যারিস্টটল নাগরিকদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেন এবং সংবিধান নাগরিকদের সংগঠিত করার জন্য প্রণয়নের চিন্তা করেন। 'নাগরিকের সংজ্ঞা : নাগরিকতার প্রশ্ন' অধ্যায়ে এ্যারিস্টটলের মতামত :

> সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষকে সংগঠিত করার ব্যবস্থা বিশেষ। যে কোন সমগ্রের ক্ষেত্রে যা সত্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তা সত্য : রাষ্ট্রকে আমাদের তার অংশসমূহে বিশ্লেষণ করতে হবে। এবং নাগরিকের বিষয়ই আমাদের প্রথম বিবেচনা করতে হবে কারণ রাষ্ট্র হচ্ছে নাগরিকদেরই সমষ্টি। [...] এককথায় বলতে গেলে আইনগত, রাজনৈতিক এবং শাসনগত ক্ষমতার অধিকারই হচ্ছে নাগরিকদেরই বৈশিষ্ট্য। [...] নাগরিক হচ্ছে তারা যারা ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে।[১৮]

কেবল এ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তা নয়, বাংলাদেশের সংবিধানেও নাগরিকের মৌলিক অধিকারসহ অন্যান্য অধিকারের নিশ্চয়তার কথা উল্লেখিত থাকলেও আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিকসহ অন্যান্য প্রতিবেশের সীমাবদ্ধতায় বাংলাদেশের নাগরিকবৃন্দের জীবনবাস্তবতায় সেসব অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নাগরিকবৃন্দের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুললে লক্ষিত হয় প্রতিনিধিত্ব রাষ্ট্রসমূহের আগ্রাসনে দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ অর্থাৎ উন্নয়নশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহ বিপর্যস্ত। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ ভূমিকা রাখতে প্রয়াসী হলেও তা কার্যকরভাবে ব্যর্থ।

সিকদার আমিনুল হক ব্যর্থ সংগঠন, ব্যর্থ রাষ্ট্র এবং দুঃসময়ের সন্তান। প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও অবমূল্যায়ন এবং সমাজের নিকট থেকে প্রাপ্ত অবজ্ঞা তাঁর অনুভূতিকে পীড়িত করে। তাঁর ভেতরে জন্ম নেয় আত্মক্লেদ, বাস্তবতা ছেড়ে স্বপ্নকল্পনায় বিচরণ করেন তিনি :

> রং বসে গ্যালে
> রুমাল খুলতে খুব কষ্ট হয়। আড়চোখে দেখে
> অনেকেই বুঝে যায়, কোন এলাকায় আমি থাকি।
> অথবা গাড়িটি কোন মডেলের? ডাইভোর্সি? নাকি
> লিভ টুগেদারের বাবু? [...] এসবই রুমাল বলে দ্যায়।
> ফলে যত রাত হয়, পার্থক্যের কথা ভুলে যাই
> আসলে কবির প্রিয় কারা আজ, স্বপ্ন না বাস্তব?
> ('স্বপ্ন না বাস্তব' : *রুমারের আলো ও অন্যান্য কবিতা*) [১৯]

স্বপ্ন ও বাস্তবের সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণকারী কবির চেতনা পীড়িত দীনতা, অবজ্ঞা আর অবহেলার ভারে। যে শব্দাবলিকে তিনি কবিতায় তুলে এনে সাজান, সেগুলো কবির গভীর যন্ত্রণা এবং হতাশাসূচক চিন্তাচেতনার প্রতীক। ক্ষোভ এবং বিষাদের অন্বয়ে তারা ভাষিক জগতে পরিবর্তিত হয়। সমাজের কুটিল দৃষ্টিলোক, সংসারের যাবতীয় অসঙ্গতির ভারে কবিসত্তা দীর্ণ, পীড়িত। এ প্রসঙ্গে ফ্রানৎস কাফকার চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে কবির চিন্তাজগতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কবিও কাফকার মতো সময়ের ভারে পীড়িত। তিনি হয়তো কাফকার পৃথিবীর মতো নির্মমতার শেকলে আবদ্ধ হতে চান না, কিন্তু সময়ের ভারে তাঁকে প্রবেশ করতে হয় জটিল জগতে :

> হঠাৎ পরিয়ে দিলো মর্গে এসে কাফকার জামা
> ডোমদের দীর্ঘ হাত। এত খসখসে! কালো রং [...]
> আর কী বিকট গন্ধ!
> ('কাফকার জামা' : *কাফকার জামা*) [২০]

পৃথিবীর অশুভ, অমঙ্গল, ক্লেদ, বীভৎসতার ছায়ায় আবৃত হয় কবিসত্তা। জীবনের যাবতীয় কলুষ তাঁকে বিষণ্ন করে, বিমর্ষ করে রাখে। সমকালীন রাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় ফেদেরিকো গার্সিয়া লোর্কা প্রসঙ্গ। লাভ-লোভের নৃশংস বশবর্তীতে শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ(১৯৩৬-১৯৩৯) যার নির্মম বলি হতে হয় লোর্কাকে। ফ্যাসিস্ট একনায়ক হিটলারের মদদপুষ্ট জেনারেল ফ্র্যাংকোর আগ্রাসনে গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র এবং সাম্যবাদের করুণ পরিণতির মুহূর্তেও তিনি তাঁর কবিতা, গানের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে শক্তিসঞ্চার করেন। সমকালীনতার মধ্যে বসেও তিনি সর্বজনীন হয়ে ওঠেন তাঁর ব্যক্তিনিরপেক্ষতা, কবিতায় কাঠামোগত ঐক্যের সঙ্গে ধ্রুপদী সুরের বিন্যাস আর কাব্যভাষার সাযুজ্যে। সিকদার আমিনুল হকও সমকালীন দুঃসময়ের গহ্বরে অবস্থান করেও ধীরে ধীরে অস্তিত্ববান এবং প্রত্যয়দীপ্ত হয়ে ওঠেন। বিজয়ীর দৃপ্ত ভঙ্গিতে তিনি বলেন :

> স্বদেশের অন্ধকারেও আমি বেঁচে থাকবো। যেদিন আমার মৃত্যু হবে, উজ্জ্বল আরো সুখী হবে ছোটদের নরম গালিচয়। এবং বিষণ্ন হবে পানীয়!
>
> ('সেদিন রাতে' : *বাতাসের সঙ্গে আলাপ*) [২১]

কবিতায় তাঁর অস্থিরতা ও অস্থিতিশীল মানসের পরিবর্তে অন্বিত হয় দীপ্র প্রত্যয় আর বৌদ্ধিক বিন্যাস। তিনি প্রাচ্যসভ্যতার মনীষীবৃন্দ এবং দর্শনের স্মরণ নেন তাঁর কবিতায়। শৃঙ্খলিত হতে চান পৃথিবীর মহামানবদের মতো :

> শৃঙ্খলার ইচ্ছা আমার অনন্ত; ঠিক সেই সব মানুষের মতো, যারা অন্ধকে রাস্তা পার করে দ্যায় স্বেচ্ছায়। তারাই বস্তুত এখনো ঈশ্বরকে ভয়ঙ্কর মনে করে, যারা নিজেরা জড়োসড়ো হয়ে বাসের হাতল ধরা মানুষকে ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দ্যায়।
>
> হাসপাতালের বারান্দায় পায়ের শব্দ না করা সাবধানী মানুষ, তোমার জন্যেই তো পৃথিবীটা গোলাপের নতুন পাপড়ির মতো জীবন্ত ও গৌরবময়। যারা অনাত্মীয় মহিলাকে চুম্বনের পরে তার অনিবার্য ক্রন্দনের সময়টুকু পর্যন্ত নীরবে অপেক্ষা করে, তারাই বস্তুত অভিজাত। পদকের যোগ্য।
>
> ('প্রতিভা এক বিশাল বৃত্ত' : *সতত ডানার মানুষ*) [২২]

কবির অন্তর্জগতের দহন, আত্মক্লেদ, রিরংসা, নার্সিসিজম মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হয়। চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে কবিতায় তিনি পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠেন। যাদের পদঝংকারে পৃথিবী পায় গৌরবের বর্ণচ্ছটা। কবির চিন্তা-চেতনার পরিভ্রমণ ঘটে। ক্রমেই তিনি অভিজ্ঞাত হন শুধু বেঁচে থাকাটাই পৃথিবীতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। চেষ্টা, শ্রম আর সংগ্রামের মাধ্যমে প্রাত্যহিক পৃথিবীতে নিজের পদচিহ্ন অঙ্কন করে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠা ও গুরুত্বপূর্ণ: 'স্বদেশের অন্ধকারেও আমি বেঁচে থাকবো' ('বেঁচে থাকার জন্য' : *সতত ডানার মানুষ*) কিন্তু এ পর্যায়ে তাঁর চিন্তার বিবর্তনের নেপথ্যে সক্রিয় থাকে অর্জিত অভিজ্ঞতা। সেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গিয়ে কবিকে রক্তাক্ত হতে হয়। অভিজ্ঞতার বৃত্ত পূর্ণ করতে করতেই তো মানুষের ক্রমাগ্রসর হওয়া। সম্পূর্ণরূপে মানুষ হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন অজস্র অভিজ্ঞতা :

> আমাদের অভিজ্ঞতা হাঙরের কামড় খাওয়া জেলের
> মতো। জলের ওপর আমাদের নৌকা ততদিন
> ভাসবে, যতদিন না পৃথিবী নামে একটি গ্রহে
> নতুন ঋতুর তটরেখা স্পষ্ট হয়।
> ('হাওয়ার একটি সন্ধ্যা' : *সতত ডানার মানুষ*) [২৩]

প্রথম পর্যায়ে কবির একাকিত্বের সম্পর্ক পৃথিবীর সমস্ত অপ্রাপ্তি, হতাশা, বঞ্চনার সঙ্গে নিহিত থাকে যা তাঁকে ক্ষোভাতুর করে তোলে। এ পর্যায়েও তিনি একাকীত্বের স্বাদ গ্রহণ করেন তবে তীব্র অসহায়ত্বের ভেতর থেকে নয়, তাঁর বিজনবাসের মানসিকতা থেকে। তিনি কবিতায় উল্লেখ করেন বৌদ্ধ লামাদের, শ্রমণদের যারা নির্বাণের মাধ্যমে মুক্তি প্রত্যাশী। পার্থিব নৈরাশ্য হতাশাক্ষুব্ধ না হয়ে তাঁকে উপেক্ষা করার মন্ত্র লাভ করেন তিনি প্রাচ্যদর্শন থেকে, হতে চান দীপঙ্করের[২৪] মতোই শান্ত এবং অটুট :

নীরবে অটুট থাকো; যেমন ছিলেন দীপঙ্কর
তিব্বতের উঁচু পথে; যখন থামতেন সন্ধ্যাবেলা–
একাই থাকতেন চুপ! অন্যেরা তখন মহামগ্ন
বাণিজ্যের গালগল্পে। শীত নামতো, সঙ্গে নির্জনতা।
('স্থির বিশ্বাসের দিকে' : *কাফকার জামা*) [২৫]

গীতার[২৬] দর্শন কবিকে জীবনের শূন্যতা ও অর্থহীনতা সম্পর্কে ভাবনা প্রকট করে তোলে। কবিতায় তিনি উদ্ধৃত করেন গীতার বাণী :

শোনো খুকি, গীতা পড়ো নাই বুঝি?
আমরা করবো কাজ, ফল আছে ঈশ্বরের হাতে!
('সুপ্রভাত হে বারান্দা' : *সুপ্রভাত হে বারান্দা*) [২৭]

কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে কবি জীবনকে দার্শনিক দৃষ্টিলোক থেকে অন্বেষণ করেন। কবিতায় তাই বারবার তাঁর চিন্তাচেতনার রূপান্তর লক্ষ করা যায়। তবে অস্তিত্বশীল হওয়ার সাধনায় তাঁর মানসসত্তার এই রূপান্তর :

> বর্তমান সময়ে কবি যে সমাজব্যবস্থায় বসবাস করেন—সে সমাজ ব্যবস্থার কারণেই কবির মানসসংগঠনে তাঁর অস্তিত্বের বিষয়টি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যেহেতু জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েই তার সত্তাকে উপলব্ধি করে, কাজেই যখন এই বস্তুজগতে তার সত্তার স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হয় তখনই তার ভেতর অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। কবি যেহেতু অনুভূতিপ্রবণ, তাই তাঁর চেতনার অভ্যন্তরীণ জগৎ ও বহির্জগত, যে-কোন জগতের সংকট থেকেই অস্তিত্ব সংবেদ উপনীত হতে পারেন। সিকদার আমিনুল হকের কবিতাতেও সেই অস্তিত্বচেতনা প্রবলভাবে উপস্থিত।[২৮]

অস্তিত্বসংকটে নিমজ্জিত হয়ে এবং বিভিন্ন সময়ে বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমে সিকদার আমিনুল হকের চিন্তার গতিশীলতা সঞ্চারমান থাকে।

৪

ব্যক্তিঅস্তিত্ব অভীপ্সায় আত্মবিকাশের দ্বারোন্মচন করার প্রয়াসে পার্থিব বাধাবিঘ্ন দ্বারা সিকদার আমিনুল হকের কবিসত্তা আহত হয় এবং কবিতায় উঠে আসে সমাজের নানবিধ ক্লেদময়তা, বৈশ্বিক অনাচার থেকে সৃষ্ট কবির আত্মক্লেদ। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে কবির বৌদ্ধিক প্রয়াসের সংশ্লেষ দ্বারা কবিতায় তিনি চিরপরিব্রাজক রূপে আবির্ভূত হন। জীবনের যাবতীয় নেতিবাচকতাকে আশ্রয় করে তিনি অগ্রসর হন জীবনের পথে।

তথ্যনির্দেশ

১. তপোধীর ভট্টাচার্য ও স্বপ্না ভট্টাচার্য, *জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব*(কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৭), পৃ. ২৩

২. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র-১*(ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৩২৭

৩. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র-২*(ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৩৬৯

৪. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র ১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬

৫. হাসান আজিজুল হক, *অপ্রকাশের ভার*(ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৭), পৃ. ৫৭

৬. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র-২*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

৭. বুদ্ধদেব বসু, *শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা*(কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১২), পৃ. ৩১

৮. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র-২*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪

৯. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র ১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

১০. তদেব, পৃ. ২৫০-২৫১

১১. তপোধীর ভট্টাচার্য ও স্বপ্না ভট্টাচার্য, *জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

১২. এম. আবদুল আলীম, *রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণ*(ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ১৭

১৩ মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০

১৪. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র* ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫

১৫. বায়তুল্লাহ কাদেরী, *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতাঃ বিষয় ও প্রকরণ*(ঢাকা : নবযুগ, ২০০৯), পৃ. ১১৮

১৬. মিনার মনসুর(সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

১৭. মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*(ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ১৪৬

১৮ সরদার ফজলুল করিম, *এ্যারিস্টটল-এর পলিটিক্স*(ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩) পৃ. ১০৯-১১০

১৯. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র* ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

২০. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র* ১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯

২১ মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র-২*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

২২. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র* ১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

২৩. তদেব, পৃ. ৩২৩

২৪. অতীশ দীপঙ্কর আচার্য এবং বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তিনি ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য বাংলার বাইরেও তিনি সমাদৃত হয়েছিলেন।

২৫. মিনার মনসুর সম্পা., *সিকদার আমিনুল হক রচনাসমগ্র* ১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪

২৬. সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারতের একটি অংশ গীতা। গীতার সারকথারূপে বিবেচনা করা যায়, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম পালন করা। সকল ধরনের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্থিতধী হয়ে ওঠার জন্য বলা হয়েছে গীতায়।

২৭. তদেব, পৃ. ৩৩১

২৮. মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

সাহিত্যিকী
দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ | জুন ২০২২ | বাংলা বিভাগ
পৃষ্ঠা : ১২৯- ১৫০ | শব্দসংখ্যা ৫৪১৬ | ISSN: 1994-4888 | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় নারী-শিল্পীর অবস্থান

মুসলিমা হাফিজ চৌধুরাণী*

Abstract

Art is widespread in the world today. It is not possible to determine its boundaries in modern fine arts. The huge fine arts world has created a continuum of the origin of art in the work flow based on the needs of the human race. The whole world today is home to thousands of nations based on different languages and religions. Class inequality has developed among mankind due to the domination and economic influence of the ruling class. And all these factors together have led to the development of various perspectives, various opinions, and above all, various life philosophies in human society. Fine arts, culture-development in Bangladesh took place after partition. However, although

* সহকারী অধ্যাপক | অঙ্কন ও চিত্রায়ন বিভাগ | রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয় | রাজশাহী, বাংলাদেশ

not at the very beginning, the weakness towards drawing women in Bangladesh can be noticed long ago. Evidence from history shows that human civilization developed in prehistoric times through the combined efforts of men and women. Finally, in the middle of the nineteenth century, the beleagured women of Bengal bravely tried to come out with their rights. In this regard, many women artists of Undivided Bengal played a leading role in the practice of modern art in the early twentieth century. Now that the artificial social barriers of developed countries have been somewhat removed, girls have been able to showcase their talents in progress. In Bangladesh, various women's organizations, women's movements, women a re seen ta king strong steps on different women's days. As a result, a strong position of women has been c reated in various field including art literature.

সার-সংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বে শিল্পকলার বিস্তৃতি ব্যাপক। আধুনিক শিল্পাঙ্গনে এর সীমারেখা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। মানবজাতির প্রয়োজনভিত্তিক কর্মপ্রবাহে যে শিল্পকলার উৎপত্তি তারই ক্রম-অগ্রগতির ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেছে বিশাল শিল্পজগৎ। গোটা বিশ্ব আজ নানা ভাষা ও নানা ধর্মভিত্তিক হাজারো জাতির আবাসভূমি। শাসকশ্রেণির আধিপত্য ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে মানবজাতির মধ্যে শ্রেণি-বৈষম্য গড়ে উঠেছে। আর সে-সমস্ত কারণ মিলিয়েই গড়ে উঠেছে মানবসত্তায় নানা দৃষ্টিভঙ্গি, নানামত, সর্বোপরি নানামুখী জীবনদর্শন। বাংলাদেশে শিল্পচর্চার বিকাশ ঘটে দেশবিভাগের পর থেকে। তবে একেবারে শুরুতে না হলেও বাংলাদেশে নারীদের আঁকার প্রতি দুর্বলতা অনেক আগে থেকেই লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় প্রাগৈতিহাসিককালে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বঙ্গীয় অবরুদ্ধ নারীরা অনেক বেশি সাহসিকতার সঙ্গে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম দিকে আধুনিক শিল্পচর্চায় অখণ্ড বাংলার অনেক

নারীশিল্পী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে উন্নত দেশ সমূহের কৃত্রিম সামাজিক বাধাসমূহ কিছুটা দূরীভূত হওয়ায় মেয়েরা তাদের অগ্রগতিতে প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন নারী সংগঠন, নারী-আন্দোলন, বিভিন্ন নারী দিবসে নারীদের জোরালো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। ফলে শিল্প সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের একটি জোড়ালো অবস্থান তৈরি হয়েছে।

সংকেত-শব্দ

নারীশিল্পী, নূরজাহান, ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী, নভেরা আহমেদ, ভাস্কর্য, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, গ্রুপ অব ফোর, সাঁকো

মূল-প্রবন্ধ

নারী সৃজনশীল—এ সত্য চিরকালীন। মৃৎশিল্প বয়নশিল্প, কারুশিল্প, চারুশিল্প ও উৎপাদনে তাদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য ছিল। তবু একুশ শতকের এসেও পৃথিবীর সকল দেশেই নারীর অবস্থান শিল্পী হিসেবে দূরের কথা; এমনকি একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করার মানসিকতাই গড়ে ওঠেনি। ইতিহাসের কালক্রমে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যখন পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে বা পুরুষের অধীনস্থ হতে বাধ্য হয় তখন থেকেই নারীরা তাদের শিল্পভাষা এবং প্রকাশ বিশেষদিকে প্রবাহিত করে, যা পুরুষের শিক্ষা থেকে ভিন্ন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান হয় অন্তঃপুরে যা সাধারণ জনসমাজ থেকে অনেক দূরে। যেখানে তার শ্রম এবং মেধা ব্যবহৃত হয় পিতৃতন্ত্রের প্রয়োজনে। এ সময় নারীরা শিল্প সৃষ্টি করছে ঠিকই, তবে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধারণের অগোচরে অতি সাধারণ উপাদানে। বহির্জগতে নারীর শিল্পের কোনো স্থান তেমন ছিল না। এ কারণে নারীদের শিল্পকর্ম তেমন চোখে পড়ে না। উচ্চকোটির শিল্পে নারীর প্রবেশ সাম্প্রতিক কালের। ইতিহাসের সূচনা থেকে দেখা যায় নারীরা নশ্বর উপাদান দিয়ে নিজের নান্দনিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা শুধু নিজ সংসারের সুখ,

শান্তি, মঙ্গল ও প্রিয়জনদের তৃপ্তির জন্য। অধিকাংশ সামগ্রীই শুধু স্বল্পকালীন ব্যবহারের জন্য কিংবা ভোগের জন্যই সৃষ্ট। যেমন বিভিন্ন ঋতুতে আচার-অনুষ্ঠানে, গৃহের আচারে, আল্পনা, উল্কি, শিশুদের খেলনায়, নানারকম পিঠা, সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতি যার সঙ্গে রাজ কোষাগারে বা ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত পাথর, কাঠ, মাটির ভাস্কর্য, পুঁথিচিত্র-পাটাচিত্রের উদ্দেশ্য এবং প্রকাশের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ নারীশিল্পীরা শিল্প রচনা করে দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর করতে, সংসারের সুখ আনতে, প্রকৃতির নানান শক্তিকে আয়ত্তে আনতে এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা নিজের আধ্যাত্ম চর্চার চেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন স্বামী ও সংসারের সুখ-শান্তির পরিচর্যায়।[১]

১

আদি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পর সমাজ যখন থেকে আর্যীকরণ করা হয় তখন থেকে নারীর অধঃস্তন ভূমিকা প্রতিষ্ঠা পায় যা আজও সমাজে দৃশ্যমান। সেই থেকেই বাঙালি নারীর গণ্ডী সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাই নারীর শক্তি বা ক্ষমতা প্রকাশের গুরুত্ব কমে যায়। ফলে নারী শিল্পীদের শিল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে তার দেখা প্রকৃতি ও সংসার। শিল্পকলা সর্বদাই সমাজ ও মানুষের আদান-প্রদান ও প্রয়োজন থেকেই সৃষ্টি। সমাজের সকল মানুষের শিল্পবোধ ও ভাষা এক নয়; আবার নান্দনিক তৃপ্তির প্রয়োজনও এক নয়। নারী শিল্পীদের শিল্পকে বুঝতে হলে প্রথমে বাংলার লোকশিল্পের মূল পরিচালক শক্তি সেটাকে বুঝতে হবে, তা হলো ব্রত যা নারীরাই পরিচালনা করে। ব্রতের আচারের মূলে যে বিশ্বাস কাজ করে তা হলো সাফল্য বা ইচ্ছা পূরণের জন্য সামাজিক নিয়ম বা অনুষ্ঠান করে পার্থিব কল্যাণ কামনা। ড. শীলা বসাক লিখেছেন 'ব্রত কথাটির সাধারণ অর্থ নিয়ম বা সংযম। নারীরাই প্রাচীনতম শিল্পধারাকে বর্তমান অবধি বয়ে নিয়ে এসেছে ব্রতের মাধ্যমে। নারী কখনো উৎপাদক ও ভোক্তা সম্পর্কে অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না, তা সব সময়ই ছিল পুরুষকেন্দ্রিক। সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বপ্রথম যে চিত্রকরের উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি হলেন প্রাগজ্যোতিষপুরের বাণ রাজ্যের অন্তঃপুরচারিণী, চিত্রলেখা। বৈষ্ণব সাহিত্যেও বার বার রাধার সখীদের চিত্রবিদ্যার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।'[২]

বাংলার লোকশিল্পের সুনিপুণ হাতের ছোঁয়া প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। তাদের আলপনা, পিঁড়িচিত্র, নকশি-কাঁথা, নকশি-পিঠা, বরণ-ডালা, সরা, কুলা, শোলার কাজ, শীতলপাটি, বাঁশ-বেতের কাজ, আমসত্ত্বের ছাঁচ, নানারকমের পাটের তৈরি

শিকা যেমন—আনন্দলহরি, ফুলঝুরি, আদরফানা, সাগর-ফেনা, কেলিকদম্ব প্রভৃতি ব্যবহারিক সামগ্রীতে নান্দনিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩] তারপরও মূলধারার শিল্পের জগতে নারীদের প্রবেশ অনেকটা সামাজিক রীতি নীতিবিরুদ্ধ। নারীর শিল্প উচ্চকোটি শিল্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ স্বীকার করে নিতেই হবে যে, নারী ও পুরুষ ভিন্ন। একই সমাজ, সংসার পরিবারে থেকেও তারা ভিন্ন। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যেখানে গোঁড়া থেকেই বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এই বৈষম্যের কবলে নারী-পুরুষের নান্দনিক চেতনা ও জীবনবোধকে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছে। নারীর শিল্প কখনো আত্মকেন্দ্রিক নয়; নারী সবসময়ই সাধারণের বোধগম্য ও সহজে প্রবেশযোগ্য স্তরে শিল্পচর্চা করে। সে কখনই জীবন এবং শিল্পকে আলাদা করে দেখে না। পৃথকীকরণ শুধু পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উচ্চকোটির শিল্পকে নানা ভাগে বিভক্ত করেছে। একজন নারী যখন উচ্চকোটি শিল্পজগতে প্রবেশ করে তখন সে সমাজে এবং নিজের শিক্ষা ও প্রবণতার বিরুদ্ধে গিয়ে প্রবেশ করে। নন্দনতত্ত্বের অচেনা জগতে তাকে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। তাই প্রায়ই দেখা যায় একজন নারীর শিল্পশিক্ষায় যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেয়ার পরেও পরবর্তীকালে মূলধারার শিল্পচর্চার জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। সামাজিক চাপ, সংসার, সন্তান লালনের সঙ্গে শিল্পকলার জগতের সমন্বয় যেন অতি দুষ্কর। স্বাভাবিক সংসারজীবন যাপন করে শিল্পসাধনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন।

নারীদের আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মসচেতনতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ পুরুষদের সঙ্গে সমভাবে গড়ে না ওঠায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। নারী সর্বক্ষণ অপরের চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত। নিজেকে গৌণ করে সংসারের সকলের সুখ-শান্তি ও যত্নে সে পূর্ণতা পায়। এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে শিল্পজগতে ঠাঁই পাওয়া অসম্ভব। তাই যে সকল নারী শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে পেশাগত চর্চায় হঠাৎ কয়েক বছরের নিস্তব্ধতা। হয়তো তখন তারা নতুন সংসারে, নতুন ভূমিকায় নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে কিংবা মা হিসেবে সন্তান লালনে ব্যস্ত বা স্বামীর পেশাকে অগ্রগণ্য করে নিজেকে আড়াল করছে। তারপরও নারী তার মত করেই শিল্প সৃষ্টি করে এসেছে। অবিভক্ত বাংলার বাঙালি নারী শিল্পীদের অংশগ্রহণে প্রথম চিত্র-প্রদর্শনীর খবর পাওয়া যায় ১৮৭৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ফাইন আর্ট এক্সিবিশন'-এ। এই প্রদর্শনীতে ২৫ জন নারীশিল্পী অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের অধিকাংশই ছিল বাঙালি। এরই সুবাদে ১৯৩৯ সালে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ হয়। অপর্ণা রায় ছিলেন প্রথম ব্যাচের ছাত্রী। তবে

নারীশিল্পীদের পেশাগত জগতে প্রবেশ ঘটার পূর্বেই এমনকিছু নারীদের পরিচয় পাওয়া যায় যারা পেশাদার শিল্পীদের উপকরণ, করণকৌশল নিয়ে শিল্পচর্চা করে নিজেদের অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যদিও সাংসারিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এই শিল্পচর্চা করেছেন ফলে তাদের কাজে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়।[৪]

ব্রিটিশদের আগমনের ঢেউ লেগেই খুব সম্ভবত নারীরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে শিল্পের সকল মাধ্যম ও আঙ্গিকে হাত দেয় যেগুলোতে পুরুষ তার সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। যার সূত্র ধরে মূলধারার শিল্পের জগতে উচ্চবংশীয় শিক্ষিত জনের প্রবেশ ঘটতে শুরু করে। এই নবতরঙ্গের ঢেউ লেগে নারী ও অন্যান্য ভদ্রঘরের সন্তানদের সঙ্গে উচ্চকোটি শিল্পের জগতে প্রবেশ করে। পুরুষের প্রবেশ ছিল পেশাদারী বড় মাপের বিখ্যাত ও ধনী শিল্পী হবার সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে আর নারীদের প্রবেশ ছিল ব্যবহারিক শিল্পের আঙিনা থেকে বেরিয়ে অন্য মাধ্যমে স্থায়ী শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা খোঁজা।[৫]

অবিভক্ত বাংলার বেশ কিছু নারীশিল্পীর নাম পাওয়া যায় যাদের অধিকাংশের নামের সঙ্গে শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তার কারণ তারা শিল্পসৃষ্টিতে সম্পন্ন নিবেদিত ছিলেন না। তারা সাংসারিক কাজের পাশাপাশি সৌখিনতার বশে ছবি আঁকতেন তাই এ-সমস্ত শিল্পীদের সম্পর্কে শোনা গেলেও তাদের কাজের নিদর্শন কম। এক্ষেত্রে নারীশিল্পীদের কাজ অপরিচিত, অজ্ঞাত, অবিশ্লেষিত ও অমূল্যায়িতই থেকে যায়। যুগ ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীশিল্পীদের অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বে শিল্প শিক্ষা ছিল অভিজাত, প্রভাবশালী ও শাসকশ্রেণির মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় অধিকাংশ নারীশিল্পী শিক্ষিত উচ্চ বা অভিজাত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান।[৬] ভারত-বিভাগ পূর্ববর্তী বাঙালি কতিপয় নারীশিল্পীর জীবন ও শিল্পচর্চা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে মোঘল আমলে মোঘল সম্রাট নূরউদ্দিন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের বিশতম স্ত্রী ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী, মেধাবী এবং চৌকস সম্রাজ্ঞী মেহেরুননিসা ওরফে নূরজাহান। কান্দাহারের এক মরুভূমিতে ১৫৭৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লাহোর রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে ১৪ বছর বয়সে নূরজাহান মোঘল হেরেমে শিক্ষাগ্রহণের জন্য মনোনীত হন। সেখানে থাকাকালীন আরবি, ফারসি, সাহিত্য ইতিহাস ও ঐতিহ্য পড়ার পাশাপাশি যুদ্ধবিদ্যা তথা অশ্বচালনা, তীর ছোঁড়া,

তলোয়ার চালানো এবং সৈন্য পরিচালনায় নূরজাহান, রাজকুমারদের চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। এইসব গুণাবলি ছাড়াও নূরজাহান নৃত্য, গীত, ছবি আঁকা, বাগানের ডিজাইন, পোশাক ও অলংকারাদিতে ডিজাইন করতেন। তাঁর অনবদ্য ডিজাইনের সুখ্যাতি সে সময় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।[৭] আবার পূর্ববঙ্গের একমাত্র নারী নবাব ফয়জুননেছা চৌধুরাণী(১৮৩৪-১৯০৩) বাংলা সাহিত্যে '*রূপজালালের* মতো অনন্য রচনার পাশাপাশি চিত্রাঙ্কন করতেন বলে জানা যায়। তেমনি মেহেরবানু খানম (১৮৮৫-১৯২৫) ছিলেন নওয়াব স্যার খাজা আহসানুল্লাহর কন্যা। ১৯২০ সালে *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় তাঁর আঁকা ছবি প্রকাশিত হয় যা দেখে কাজী নজরুল ইসলাম 'খেয়া পারের তরণী' কবিতা রচনা করেন। মেহেরবানু খানম রক্ষণশীল মুসলিম নবাব পরিবারে সংগৃহীত চিত্রকলা দেখে শিল্পসাধনায় আগ্রহী হন। তিনি ছয় মাস ছবি আঁকা শিক্ষা নেন। তাঁর ছবিতে ধর্মীয় কারণে জীবজন্তু থাকতো না। জলরঙে দৃশ্যচিত্রই বেশি অঙ্কন করতেন। পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর দুটি ছবির হদিস পাওয়া যায়। একটি নদী পারাপাররত রঙিন ছবি। অপরটি সাদাকালোতে পল্লিদৃশ্য। ছবি দুটিতে আলোছায়ার সুসমাবেশে মনোরম ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে।[৮] অপরদিকে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জলরঙ দিয়ে দেব-দেবী এবং দৃশ চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর ছবি অস্ট্রেলিয়ার এক চিত্র-প্রদর্শনীতে পাঠানো হয়। স্বরচিত কাব্যগ্রন্থসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়। সূচারু দেবী (১৮৭৪-১৯৫৯) ময়ূরভঞ্জের মহারাণী ছিলেন। কৈশোরে ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীর কাছে তেলরঙ চিত্রের অনুশীলন করেন। তিনি তেলরঙে পারদর্শী ছিলেন। এছাড়াও স্বামী ও পুত্রের মৃত্যুর শোক ও নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনাও তাঁর চিত্রকর্মে প্রকাশ করেন। সুনয়নী দেবী (১৮৭৫-১৯৬২) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অগ্রজদের অনুপ্রেরণায় চিত্রকলার জগতে যাত্রা শুরু হয়। জলরঙ মাধ্যমে দেব-দেবীর চিত্রাঙ্কনসহ বাংলার গার্হস্থ্যজীবন ও নারীদের মুখ তাঁর বিষয় হিসেবে স্থান পায় । তাঁর চিত্রকলার ভিত্তি 'বাংলার পট'। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের উদ্যোগে তাঁর ছবি ইউরোপে একাধিকবার প্রদর্শিত হয়। তিনি বহু ছবি এঁকেছেন যাতে অতি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব প্রকাশ পায়। সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯) উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বড় মেয়ে। বাবার কাছে চিত্রবিদ্যার চর্চা করেন। জলরঙে পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণ করেন। তাঁর চিত্র *প্রবাসী*, *মডার্ন রিভিউ*, *সুপ্রভাত*, *সন্দেশ*, *চ্যাটার্জিস পিকচার*, *অ্যালবাম* প্রভৃতি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। হাসিনা খানম (১৮৯২-?)-কে বাংলা একাডেমিতে প্রকাশিত চরিতাভিধানে বাঙালি মুসলিম

নারীশিল্পীর পথিকৃৎ ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩০-১৯৪০ এর দশকে *সওগাত*, *বসুমতী* প্রভৃতি সাময়িকীতে তাঁর আঁকা জলরঙ ও স্কেচ প্রকাশিত হয়। প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯) কলকাতার জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ। আন্তর্জাতিক পরিসরে অবাধ বিচরণ থাকায় শিল্পজগৎ সম্পর্কে তাঁর বিস্তর ধারণা ছিল। ১৯৩৫ সালে লন্ডনে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী হয়। তিনি প্যারিসে ফ্রেস্কো, সিরামিক ও বাটিক আয়ত্ত করেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের উন্নয়নে তাঁর অবদান অনেক। শান্তা দেবী (১৮৯৩-১৯৮৪) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক পরিবেশের কারণে কৈশোরেই ছবি আঁকা ও লেখালেখি শুরু করেন। নন্দলাল বসু এবং অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবি আঁকা শেখেন। তেলরঙের করণকৌশল ও আয়ত্ত করেন তাঁর ছবি কলকাতা, মদ্রাজ, ইয়াঙ্গুন ও বিড়লা একাডেমিতে প্রদর্শিত হয় এবং পুরস্কারও অর্জন করেন। সুকুমারী দেবীর (জ. ?-১৯৩৮) পিতা কুমিল্লা চাঁদপুরের বড়দিয়ার জমিদার রামকুমার মজুমদার। চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়ে সতেরো বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে যান। সেখানে তাঁর সূচিশিল্পের দক্ষতার জন্য কলাভবনের শিক্ষিকা নিয়োগ করেন। উজ্জ্বল রঙ ও বলিষ্ঠ রেখার সমন্বয়ে দেব-দেবী ও পৌরাণিক ঘটনাবলির বিষয় অবলম্বনে ডেকোরেটিভধর্মী ছবি আঁকতেন এছাড়া আল্পনা ও কারুকলায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রকৃতি চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৩৪) মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র শিল্পী জলধিচন্দ্রের কন্যা। নব্যবঙ্গীয় রীতিতে জলরঙে কৃষ্ণলীলা, বুদ্ধজীবন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কাহিনি অবলম্বনে চিত্র রচনা করেন। তিনি জেসোপেইন্টিং, সিল্কের ওপর চিত্রাঙ্কন, গালা ও মিনার কাজের দক্ষতার পরিচয় দেন। পাশাপাশি তাঁর সূচিশিল্প ও আল্পনা সম্বলিত প্রকাশনা বের হয়। ইন্দুরানি সিংহ (১৯০৫-?) কলকাতায় জন্ম নেন। তাঁর পিতা অক্ষয়কুমার মিত্র। শিল্পী সতীশচন্দ্র সিংহের সঙ্গে ১৯২০ সালে বিয়ে হয়। বিয়ের ষোল বছর পর স্বামীর নিকট চারুকলা চর্চা শুরু করেন। তেলরঙ জলরঙ আর প্যাস্টেলে দৃশ্যচিত্র, গ্রামের নর-নারীর আবৃত ও অনাবৃত নারীদেহ অঙ্কনে দক্ষ ছিলেন। গৌরী ভঞ্জ (১৯০৭-?) শিল্পী নন্দলাল বসুর কন্যা। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে চারু ও কারুকলা শেখেন এবং এই বিভাগে পঁয়ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেন। আল্পনা, বাটিক, চামড়া ও অন্যান্য কারুশিল্পে দক্ষতাসহ নানা অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা ও অলংকরণে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ইন্দিরাদেবী রায় চৌধুরী (১৯১০-১৯৫০) টাঙ্গাইলের শীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিনোদিনী দেবীর কন্যা। গৌরিপুরের ভূম্যাধিকারীর পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ বীরেন্দ্রকিশোর রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের ও অতুল বসুর কাছে ছবি আঁকা শেখেন। জল ও

তেলরঙের চিত্র বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনের জন্য একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। ইন্দুসুধা প্রথম চিত্রবিদ্যা শিক্ষা নেন ময়মনসিংহের একজন আলোকচিত্রীর কাছে। ১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে চারু ও কারুকলা অনুশীলন করেন। চিত্রাঙ্কন, অলংকরণ ও সেলাইশিল্পে তাঁর দক্ষতা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন নারী সংগঠনের সঙ্গে কাজ করেন। বিপ্লবী কাজের জন্য পাঁচ বছর কারাভোগ করেন। হাসি রাণী দেবী (১৯১১-?) চব্বিশ পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দিনাজপুরের আইনজীবী ছিলেন। কিশোরকালেই চারুচর্চায় উৎসাহী হন এবং অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি রম্যগল্প রচনা ও তাতে ব্যঙ্গচিত্র ইলাস্ট্রেশন করে খ্যাতি লাভ করেন। একমাত্র কন্যার অকালমৃত্যুর শোক তাঁর ছবিতে প্রকাশ পায়। এছাড়াও ভারতীয় পত্রিকায় তাঁর নানা ছবি প্রকাশিত হয়। যমুনা সেন (১৯১২-?) নন্দলাল বসুর ছোট মেয়ে। ছয় বছর বাবার কাছে চিত্রাঙ্কন, ফ্রেস্কো, মডেলিং ও লিনোকাট চর্চা করেন। আল্পনা সূচিশিল্প ও বাটিকের কাজে দক্ষ ছিলেন। তিনি কলাভবনের কারুকলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন তাঁর ছবি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাণী চন্দ (১৯১২-?) জন্মগ্রহণ করেন মেদিনীপুরে। শিল্পী মুকুল চন্দ্র দে'র বোন। ১৯২৮ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং নন্দলাল বসু ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে জলরঙ, টেম্পারা, ক্রেয়ন, চক এবং উডকাট ও লিনোকাট মাধ্যমে কাজ করেন। তিনি 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কামিনীসুন্দর পাল (১৮৮৩-) খুলনায় খালিশপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শিল্পী শশীভূষণ পালের স্ত্রী এবং মহেশ্বরপাশা স্কুলের সূচিশিল্পের শিক্ষক ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই সূচিকর্মের মাধ্যমে বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি এবং পলাশির যুদ্ধের ঘটনা তাঁর বিষয় ছিল। এ-সময়ের নারীশিল্পরাও দেশপ্রেমিক, দেশাত্মবোধ ও দেশমাতৃকতার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রনিভা চৌধুরী ১৯১৩ সালে মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। নোয়াখালির নিরঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে ১৯২৭ সালে বিয়ের পর স্বামীর অনুপ্রেরণায় কলাভবনে পাঁচ বছর চিত্রশিল্প অনুশীলন করেন। শিক্ষা শেষে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। তিনি জলরঙ ও প্যাস্টেল মাধ্যমে প্রাচীন সাহিত্যের চরিত্র ও ঘটনা এবং গ্রামবাংলার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক দৃশ্যকে ছবির বিষয় হিসেবে নেন।[৯] ভারতের পাঞ্জাবের অমৃতা শেরগীল (১৯১৩-১৯৪১) জন্মগ্রহণ করেন হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে। আট বছর বয়স থেকে ইউরোপে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ভারতীয় চিত্রশিল্পের আধুনিকতায় অবদান রাখেন। তাই ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের ভুবনে রবীন্দ্রনাথ এবং অমৃতার নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। তেলরঙ-এ অসংখ্য ফিগারেটিভ চিত্র

এঁকেছেন। ছবির বিষয় ছিল লোকজ ফর্ম, গ্রামীণ শ্রমজীবী, সাধারণ মানুষের গার্হস্থ্যজীবন আর দেশীয় ঐতিহ্যে নারী-ফিগারই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর চিত্রে। তাঁর ছবির জন্য স্বর্ণপদকও পেয়েছেন।[১০]

২

নভেরা আহমেদ (২৯ মার্চ ১৯৩৯-৬ মে ২০১৫) বাংলাদেশের আধুনিক ভাস্কর্যশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ। এই উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বাংলাদেশি ভাস্কর যিনি ১৯৫০ সালেই লন্ডনে ভাস্কর্য বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য ভর্তি হয়ে ক্রমান্বয়ে ইতালি, ফ্লোরেন্স এবং ভেনিসে শিক্ষাগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে বাংলাদেশে ১৯৫৬ সালে আসেন এবং চিত্রশিল্পী হামিদুর রহমানের সঙ্গে যৌথভাবে শহিদ মিনারের নকশা প্রণয়ন করেন। তিনি ১৯৬০ সালের ৭ আগস্ট ৭৫টি ভাস্কর্য নিয়ে একক প্রদর্শনী করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে দশদিনব্যাপী এই প্রদর্শনী সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। এই প্রদর্শনীটি ছিল ভাস্কর্য বিষয়ে এ দেশের প্রথম প্রদর্শনী। তাঁর কাজের বিষয় হল এ দেশের ট্যাপা পুতুলের আদলের সঙ্গে পশ্চিমা স্টাইলের সমন্বয়ে ভাস্কর্যের গড়ন। ভাস্কর্যে বিমূর্তরূপ নভেরার অনবদ্য কীর্তি। তাঁর কাজের মধ্যে রয়েছে 'পরিবার', 'চাইল্ড ফিলোসোফার', 'মা ও শিশু', 'জেব্রা ক্রসিং ও যুগল' ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর আরও ৪৩টি চিত্রকর্মের খোঁজ পাওয়া যায়।[১১]

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস পঞ্চাশ বছরের হলেও এদেশের শিল্প-ঐতিহ্যের ইতিহাস বহু শতাব্দীর। আর এদেশের সংস্কৃতির শেকড় অনাদিকাল পর্যন্ত বিস্তৃত— যা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বহুমুখী পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চারুকলা শিক্ষা শুরু হয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিউদ্দিন আহমেদ, হাবিবুর রহমান এবং তাঁদের সমমায়কি চিত্রশিল্পী এস.এম সুলতান। পরের সারিতে রয়েছেন অন্যতম চিত্রশিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, হাশেম খান, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, মর্তুজা বশীর, মাহমুদুল হক। এই গুণী শিল্পীরা বাংলাদেশে চারুকলা চর্চাকে এগিয়ে দিয়েছেন। অপরদিকে শিল্পকলার অন্যান্য শাখার পাশাপাশি চারুকলার শিক্ষার প্রতি নারীদের আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। '৫০ দশকে প্রথম ব্যাচে বেশ কয়েকজন নারীশিল্পীর আগমন ঘটে তারা হলেন—তাহেরা খানম, রওশন আরা আমিন, সৈয়দা মইনা আহসান, মোহসিনা

আলী এবং জোবেদা ইসলাম। বর্তমানে পঞ্চাশ দশকের নারীশিল্পীদের পর অনেক নারীশিল্পীর আগমন ঘটেছে চারুকলার জগতে। তাদের মধ্যে স্বাধীনতার পর যে সকল নারীশিল্পীদের শিল্পকলার জগতে নিরলসভাবে কাজ করতে দেখা যায় তাঁরা হলেন নাজলী লায়লা মনসুর (১৯৫২) যিনি আশির দশক থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিল্পকর্ম নির্মাণ করে আসছেন। তাঁর কাজে নারী জগতের সংকীর্ণতা, নিরাপত্তাহীনতা ও নিপীড়নের চিত্র সরাসরি খানিকটা পরাবাস্তব রীতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি রিকশা-পেইন্টিং-এর ধরন ব্যবহার করে চিত্রাঙ্কন করেছেন। তাঁর চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে যেমন 'লুই কানের স্বপ্ন', 'বাঁশিওয়ালা', 'ব্যবহৃত চিত্র', 'খল নকল সরল', 'বন্ডেজ' ইত্যাদি। ফরিদা জামান (১৯৫৩) এদেশের প্রথম নারীশিল্পী যিনি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পুরস্কারসহ জাতীয় নবীন এবং দেশ বিদেশের নানা পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর কাজের বিষয় গ্রাম্যজীবন নিয়ে। জেলে, মাছ ও জালকে ঘিরে নানা বিষয় তুলে ধরেন তাঁর চিত্রে। তাঁর চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে 'ক্যাট এন্ড ফিস, 'সুফিয়া ইন এ রিশ্রো', 'ফিসিং নেট', 'ডেড ফিস', 'রেইন' ইত্যাদি।

নাইমা হক (১৯৫৩) একজন ক্রিয়াশীল শিল্পী। বিশুদ্ধ বির্মূত রীতিতে কাজ করেন। তাঁর কাজের বিষয় হিসেবে মাতৃত্ব এবং শিশুদের চোখে দেখা ভুবন, সংসার ও প্রকৃতি। শামীম শিকদার (১৯৫৩) ভাস্কর হিসেবে আশি নব্বই দশকে অবদান রাখেন এবং শিল্পক্ষেত্রে অবদানের জন্য একুশের পদকপ্রাপ্ত। তিনি কংক্রিট ঢালাই বা সিমেন্টে ব্রোঞ্জ, কাঠ, স্টিল ও গ্লাস ফাইবার মাধ্যমে কাজ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা,' 'সংগ্রাম,' এবং 'স্বাধীনতা'। সাধনা ইসলাম (১৯৫৪) তিনি চিত্রের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাংলার গ্রামীণজীবনের লোকজ অনুষঙ্গ যা সরলীকৃত আমেজে উপস্থাপন করেন। নুরুননাহার পাপা (১৯৫৪) নিয়মিত শিল্পচর্চা করে যাচ্ছেন। তিনি বিচিত্র মাধ্যমে নকশাধর্মী শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন। প্রয়াত রওশন হক দীপা (১৯৫৩-১৯৯৯) অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী শিল্পী ছিলেন। তিনি ড্রইং-এ অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর ছবির বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে নারীর বিচিত্র অভিব্যক্তি। এছাড়া তাঁর অসুস্থ অবস্থার পেন্সিলে আঁকা আত্ম-প্রতিকৃতি যাতে তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নাসরীন বেগম (১৯৫৬) নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাচ্যরীতিতে শিল্পচর্চা দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বিষয় হিসেবে নারী ও প্রকৃতি, জীবনে নারীর অসম অবস্থান সূক্ষ্ম তুলির আচরে নিপুণ সৌন্দর্যে তাঁর কাজে উঠে এসেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের মধ্যে 'মালালা', 'গার্ডেন', 'ক্যাকটাসওম্যান', 'হিউম্যান উইথ ক্যাকটাস' ইত্যাদি। রোকেয়া সুলতানা (১৯৫৮)

ছাপচিত্রের জগতে নব্বই দশকের একজন সক্রিয় শিল্পী এবং তিনি নানা পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন। তাঁর চিত্রে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধি এক স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। নারী-সত্তা নারীর অভিজ্ঞতা, নারীর পরিপ্রেক্ষিত ইন্দ্রিয়জগৎ তাঁর ছবির উপজীব্য বিষয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে 'রিলেশন', 'জল বায়ু মাটি', 'ম্যাডোনা' ইত্যাদি সিরিজ ছবি। আইভী জামান (১৯৫৮) নারী ভাস্করদের মধ্যে একজন। নব্বই দশক থেকে অধিক সক্রিয় শিল্পী শৈশব স্মৃতি, পরিবেশ প্রকৃতি তাঁর কাজের বিষয়। তিনি সিমেন্ট, ব্রোঞ্জ, সিট মেটাল, কাঠ, পোড়ামাটি মাধ্যমে কাজ করেন। তাঁর অন্যতম কয়েকটি ভাস্কর্যের মধ্যে রয়েছে 'বেগম রোকেয়া, 'মাদার ল্যাঙ্গোয়েজ ট্রি', 'বুদ্ধ', 'হ্যাপি স্মৃতির মিনার' ইত্যাদি। দিলারা বেগম জলি (১৯৬০) আশির দশকে একজন ক্রিয়াশীল শিল্পী। নারীর সামাজিক অসঙ্গতি নির্যাতন অসামঞ্জস্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে নিজস্ব চিত্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন। তাঁর চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে তাজরীন নামা, লাল সালু, বেহুলা, নুরজাহান, ভ্রণ প্রত্যাহার। মুর্শিদা আরজু আল্পনা (১৯৬১) নবীন শিল্পীদের মধ্যে অধিক সক্রিয় একজন শিল্পী। সম্প্রতি দেশে এবং দেশের বাইরে তাঁর শিল্পকর্মের জন্য অধিক প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর কাজের মধ্যে রয়েছে 'ব্রোকেন ডায়ালগ' (স্থাপনা), 'আনটাইটেল ফাইনাল ড্রাইভ'। ফারেহা জেবা (১৯৬১) নিয়মিত শিল্পচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাজেও নারীদের প্রতি নির্যাতন ও বৈষম্য উঠে এসেছে। নারীর প্রতি সহমর্মিতা পরম শ্রদ্ধা এবং একাত্মতার প্রকাশ লক্ষণীয়। আতিয়া ইসলাম এ্যানি (১৯৬২) সমগ্র চিত্রপটের কেন্দ্রে আছে নারী। নারী অধঃস্তন ভূমিকা সমাজে নারীর নির্যাতন ও অসহায় অবস্থার গভীর উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর চিত্রে। নিলুফার চামান (১৯৬২) একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাষায় রচনা করে যাচ্ছেন নারীর সামাজিক অবস্থা। তাঁর অন্যতম কয়েকটি চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে 'বিষণ্ন জীবন', 'অন্ধকার ও সেই মেয়েটি', '৭১,' 'পাখিরা ও পাখিরা,' 'অজন্তা নিভিয়া যা'। কনকচাঁপা চাকমা (১৯৬৩) তাঁর কাজের অনুপ্রেরণা ও উৎস তাঁর জন্মভূমির চাকমা জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মূলত নারীজীবনেরই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে 'ঘণ্টার প্রতিধ্বনি', 'লক্ষ সাদা ঘোড়া', 'সবার জন্য শান্তি'। নাসিমা হক মিতু (১৯৬৭) একজন ভাস্কর্যশিল্পী। তাঁর কাজে নারী-পুরুষের বৈপরীত্য ও সম্পর্কের পরিশীলিত রূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তৈয়বা বেগম লিপি (১৯৬৯) স্থাপনাশিল্পের জগতে নবীন এক শিল্পী। আত্মোপলব্ধি দিয়ে বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য প্রায়ই নিজের আত্মপ্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে নারী দেহের পণ্যায়ন ছাড়াও দুই মাত্রার সমাজ দ্বারা নারীর দেহ নিয়ন্ত্রিত। যা তিনি চিত্র রচনা ছাড়াও স্থাপনাকর্মে

তুলে ধরেন। যেমন 'হু এ্যাম আই', 'এ্যান হুয়াট এ্যাম আই', 'চাইল্ড হুড', 'বিজারি এ্যান্ড বিউটিফুল', 'টাচ মি' ইত্যাদি স্থাপনাকর্ম উল্লেখযোগ্য। সুলেখা চৌধুরী (১৯৭২) নবীন এই শিল্পী চিত্রকলা কিংবা স্থাপত্যকর্মে নারীর সামাজিক শোষণ ও সহিংসতার চিত্র তুলে ধরেছেন। নিত্য ব্যবহার্য গৃহসামগ্রীকে প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন। এই সব সক্রিয় ক্রিয়াশীল শিল্পী ছাড়াও আরও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠিত নারী শিল্পী রয়েছেন যারা তাঁদের শিল্পকর্ম দ্বারা শিল্পাঙ্গনে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমানে চারুকলা শিক্ষার ব্যাপারে পারিবারিক ও সামাজিক বাধা অনেক কমে এসেছে এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে ছাত্রের পাশাপাশি ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৮ সালে ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভের পর নানা পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ১৯৫৪-১৯৫৫ সেশনে ইনস্টিটিউটে প্রথম পাঁচজন ছাত্রী ভর্তির মধ্যদিয়ে ক্রমান্বয়ে ছাত্রের পাশাপাশি ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর ১৯৯২-১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন অনার্স বা সম্মান কোর্স চালু করা হলে পূর্বের তুলনায় চারুকলার শিক্ষার মান অন্যান্য বিষয়ের মতই সমসাময়িক হয়ে উঠে। ফলে ঢাকাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিষয়ে অধিক হারে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি হবার উৎসাহ লক্ষ করা যায়। যা চারুকলা জগতে ইতিবাচক তাৎপর্য বহন করে। বর্তমানে চারুকলা বিষয়ে নারীশিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি লক্ষ করা যায়। তবে এইসব ভর্তিকৃত নারীশিল্পীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে অংশ নিচ্ছেন বেশকিছু নবীন-প্রবীণ নারীশিল্পী। বিগত কয়েক বছরে নারীশিল্পীদের কাজের অনেক প্রদর্শনী হয়েছে এবং এদেশের গণ্ডী পেরিয়ে বিদেশে প্রদর্শনী করার প্রবণতা ও ইচ্ছা বেশি দেখা যায়।

ভর্তিকৃত সকল ছাত্রী একাডেমিক কার্যক্রম শেষ করে সবাই যে শিল্পচর্চার মধ্যে নিয়োজিত আছেন তা নয়। মোটামুটি তালিকাভুক্ত যে সকল শিল্পী রয়েছেন যারা বর্তমানে এই দেশের শিল্পের অঙ্গনে সৃজনশীল কাজ নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রদর্শনী করে যাচ্ছেন। যার ফলস্বরূপ দেখা যায় ১৯৭০ দশকের নাজলী লায়লা মনসুর, ফরিদা জামান, সাধনা ইসলাম, জ্যোৎস্না হাবিব, নাইমা হক, আসমা কিবরিয়া, আইভি জামান এবং আশির দশকের নাসরিন বেগম, রোকেয়া সুলতানা, তন্দ্রা দাস, অন্যদিকে এর কাছাকাছি সময়ের দিলারা বেগম জলি, নিলুফার চামান, কনকচাঁপা চাকমা, আতিয়া ইসলাম এ্যানি, ফারেহা জেবা, লায়লা শারমিন, লালারুখ সেলিম, সুফিয়া বেগম, তৈয়বা বেগম লিপি, সরকার নাহিদ নিয়াজি প্রমুখ প্রতিভাদীপ্ত

শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটে।[১২] সত্তর দশকের প্রধান কয়েকজন চিত্রশিল্পীর মধ্যে ফরিদা জামানকে অন্যতম একজন শিল্পী হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। শিল্পী ফরিদা জামান তিনি একধরনের আধা-বিমূর্ত চিত্র আঁকেন তাঁর ক্যানভাসের পটভূমিতে। সেখানে তিনি দেশীয় ঐতিহ্যের উপাদানসমূহের কল্পনা ও বাস্তবের সংশ্লেষিত রূপ নির্মাণ করেন।

আশির দশকে বাংলাদেশের স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক শাসন যা মুক্তিযুদ্ধের অর্জিত চেতনাবোধকে পরিহার করতে থাকে। এই দশককে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন এদেশের চিত্রশিল্পীরা। আশির দশকের চিত্রশিল্পীরা হলেন—নিলুফার চামান, দিলারা বেগম জলি প্রমুখ। তবে এই দশকের অধিকাংশ শিল্পীরা এখনো নিজস্ব শিল্প-শৈলীর গঠন পর্যায়ে থাকলেও কিছু শিল্পী রয়েছে যারা সত্তর দশকের শিল্পীদের চেয়েও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন এবং ভিন্ন চিত্রভাষা প্রকাশ করেছেন। যাকে উত্তর আধুনিক প্রবণতা বলা যায়। বর্তমানের নৈরাজ্যকে তারা প্রত্যক্ষ করেছেন পরিহাস ব্যঙ্গ, ফ্যান্টাসি ইত্যাদি হালকা ভাষায়।[১৩] তাঁরা বিভিন্নভাবে সমাজের অমানবিক রূপকে চিত্রের ভাষায় পরিণত করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর যে কয়েকজন নারীশিল্পী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে ফরিদা জামানই অগ্রণী শিল্পী। তেমনি নিলুফার চামান, রোকেয়া সুলতানা, দিলারা বেগম জলি, কনকচাঁপা চাকমা, তৈয়বা বেগম লিপি এরাও বিভিন্ন জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। তরুণ নারী শিল্পীদের মধ্যে মুর্শিদা আরজু আল্পনা বেশ শক্তিশালী। নব্বই এর দশকে একটি আর্ন্তজাতিক পুরস্কারও পেয়েছেন। এখন প্যারিসে বৃত্তি নিয়ে শিল্পর্চচা করছেন। চিত্র শিল্পীদের বাইরে আছেন বেশ কয়েকজন প্রতিশ্রুতিশীল ভাস্কর। মিশ্র মাধ্যমে ও অন্যান্য মাধ্যমের শিল্পীরা হলেন আইভি জামান ভাস্কর, নূরুননাহার পাপা মিশ্র মাধ্যমে, চামড়া, নানারকম তন্তু ব্যবহার করে তাপিশ্রী ধরনের শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন, মাহমুদা বেগম করেন বুননে, মাসুদা কাজী পেপার মেসে এবং রেজিন নিয়ে আর রিফাত ইউসুফ মোজাইকে কাজ করেন।[১৪] স্থাপনাশিল্প চর্চা করেন তৈয়বা বেগম লিপি, সুলেখা চৌধুরীসহ বেশকিছু নবীন নারী শিল্পী।

বাংলাদেশের নারী শিল্পীদের কাজের বিষয় বিবেচনায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। অগ্রণী শিল্পীদের মধ্যে সমবিমূর্ত, বিমূর্ত প্রতীকবাদী, পরাবাস্তববাদী, উত্তর-আধুনিকতা ইত্যাদি নানা ধারা লক্ষ করা যায়। ফরিদা জামানের কাজকে সমবিমূর্ত

বলা যায়। নাইমা হক প্রায় বিশুদ্ধ বিমূর্ত ধারায় কাজ করেন। নাজলী লায়লা মানুষ পরিবেশ ও নগরজীবনকে ভিত্তি করে চমৎকার স্টাইলাইজড প্রতীকী ছবি আঁকেন। তাঁর রঙ, অনেকটা ফভ-ভঙ্গির উজ্জ্বল প্রাথমিক রঙের সুন্দর ব্যবহার। সামাজিক কিছু বক্তব্য থাকে পরাবাস্তবরূপে তাঁর ছবিতে। নাসরীন বেগম জলরঙে টেম্পারায় অনবদ্য কাজ করেন। নানা নাগরিক-উৎসব নিয়ে চমৎকার সূক্ষ্ম হাতের কাজের ভারতীয় চিত্রাঙ্গনের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিমূর্ত আধুনিক আঙ্গিকের সুন্দর সমন্বয় ঘটান। রোকেয়া সুলতানার কাজে নিজস্বতা আছে। দিলারা বেগমের কাজে পাশ্চাত্য আঙ্গিকে মার্ক শাগালের প্রভাব লক্ষ করা যায়। নিলুফার চামানকে নারী শিল্পীদের মধ্যে যথেষ্ট বিপ্লবী বলা যায়। তার চিত্রে সহজ অবাস্তবতা বিষয়। রঙের প্রচণ্ড সরলতা প্রায় নেই রঙ উত্তর-আধুনিকতা বলা যায়। কনকচাঁপা চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের তাঁর চেনা জগৎকে ফিগারেটিভ(Figuretive আধাবিমূর্ত ভাঙ্গিতে একটি নিজস্ব আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। কম্পোজিশনের (Composition) ক্ষেত্রেও আধুনিকতা আছে। রঙের ক্ষেত্রে নীল এবং ক্রিমসনের (Creamson) প্রাধান্য আছে।

৩

বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনীতে নারী শিল্পীদের অংশগ্রহণ

বর্তমানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নারীবাদী আন্দোলন হচ্ছে। এইসব বিষয়ে অসংখ্য সংগঠনও গড়ে উঠেছে। সেই ক্ষেত্রে নারী শিল্পীরা বাদ যায়নি। নারীশিল্পীদের বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছে আবার বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে এইসব শিল্পীরা জড়িত রয়েছেন। তাঁরা ঢাকায় প্রথম ১৯৭৪ সালে আর্ট কলেজ গ্যালারিতে সম্পূর্ণ মেয়েদের উদ্যোগে চার জনের একটি 'গ্রুপ অব ফোর' নামে প্রথম নারীশিল্পীদের একটি দল যৌথ-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই শিল্পীরা হলেন ফরিদা জামান, নাইমা হক, শামিম শিকদার এবং সাধনা ইসলাম। তারপর বিশ বছর পর নতুন করে উদ্যোগী হয়েছেন শক্তি, সাহস, সংখ্যা এবং গুণাগুণ নিয়ে অনেক বেশি নারীশিল্পী। তাঁরা ঢাকায় ১৯৯৪ সালে একটি নতুন 'এরিয়েল' নামক চিত্রশালা গঠন করে। এরা 'She' (সে) শীর্ষক ৩০ জন নারী শিল্পীর প্রদর্শনীর আয়োজন করে দেখিয়ে দেয় নারীশিল্পীদের শিল্পচর্চা এদেশে অনেক দূর এগিয়েছে। ২০ বছরের পর্যবেক্ষণে চার থেকে ত্রিশ জন শিল্পীর শিল্পে নিজস্বতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। অর্থাৎ নারীদের শিল্পচর্চা সারে সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও আরও আটজন নারীশিল্পী ১৯৯৩ সালে কলকাতায় বাংলাদেশের দূতাবাসে দলগত প্রদর্শনী করেন। যা নারীশিল্পীসহ

সকলকে অনুপ্রাণিত করে। এই শিল্পীরা হলেন, ফরিদা জামান, নাজলী লায়লা মনসুর, নাইমা হক, নাসরীন বেগম, রোকেয়া সুলতানা, দিলারা বেগম জলি, নিলুফার চামান এবং কনকচাঁপা চাকমা। ২০০০ সালে নারী শিক্ষার অগ্রপথিক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের জন্মদিন উপলক্ষে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন নারীশিল্পীদের এক যৌথ-প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এই আয়োজনে সারা দেশের পঞ্চাশজন নারীশিল্পী অংশগ্রহণ করেন। যা ছিল নারীশিল্পীদের নিয়ে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের প্রথম আয়োজন। এই প্রদর্শনীতে নারীশিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মে বেগম রোকেয়ার চেতনার প্রতিফলন ঘটান। সত্তর, আশি, নব্বই এবং তার পরবর্তী সময়ের সুপ্রতিষ্ঠিত নারীশিল্পীরা বেগম রোকেয়ার জীবন থেকে নেয়া ঘটনাকে বিষয় করে চিত্রকর্ম রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিল্পী ফরিদা জামান, নাসরীন বেগম, রোকেয়া সুলতানা, নাজলী লায়লা মনসুর, তন্দ্রা দাস, সাধনা ইসলাম, দিলারা বেগম জলি, নিলুফার চামান, মুর্শিদা আরজু আলপনা, কনকচাঁপা চাকমা, নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা, শামীম সুব্রানা, বেবী সুলতানা, গুলনাহার বেগম, আজাদী পারভীন, সুলেখা চৌধুরী, আতিয়া ইসলাম এ্যানি, রেবেকা সুলতানা মলিসহ অনেককে অংশ নিতে দেখা যায়। আবার সমকালীন ৪ জন নারীশিল্পীর শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ২০০৯ সালের জয়নুল গ্যালারিতে ২৪ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী নারীশিল্পীরা হলেন—ফারেহা জেবা, কনকচাঁপা চাকমা, নাসরীন বেগম এবং সুলেখা চৌধুরী। তাঁদের শিল্পকর্ম যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে। শুধু নারীশিল্পীদের যৌথ-প্রদর্শনী ছাড়াও ১৯৭০ সালে আর্ট কলেজে 'কালবৈশাখী' শীর্ষক বড় প্রদর্শনীতে ১০৬ জন শিল্পীর মধ্যে মাত্র ৬জন নারীশিল্পী ছিলেন। জাতীয় প্রদর্শনী কিংবা এশীয় দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনীতে অনেক বেশি নারীশিল্পীর অংশগ্রহণ দেখা যায়। আবার শুধু নারীদের আলাদা করে প্রদর্শনী ভিন্নরকম সম্ভাবনার সূত্রপাতের অনুভূতির সৃষ্টি করে। দশম জাতীয় প্রদর্শনীতে (১৯৯২) ৩৪জন, ১৩তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে ৫২জন, ১৫তম জাতীয় প্রদর্শনীতে ৪৪জন। ১ম এশীয় দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে ১৯৮১ সালে মাত্র ৫জন অংশগ্রহণ করে। ৬ষ্ঠ এশীয় দ্বি-বার্ষিকী ১৯৯৩ সালে মাত্র ১৭জন। আবার ১৩তম এশীয় দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী-২০০৮ অংশ নেয় ৪০ জন। কিন্তু ১৪তম এশীয় দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনী ২০১০ সালে অংশগ্রহণকারী ৪২ জনের মধ্যে ১০জন নারী অংশ নেন। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে নব্বই দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায় নারীশিল্পীদের অগ্রগতি এক চতুর্থাংশে উন্নীত হয়েছে যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।[১৫] একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে এসে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার শুরুর প্রায় অর্ধ-

শতাব্দীর বেশি সময় পার হওয়ার পর এদেশের পঞ্চাশ জনেরও বেশি নারীশিল্পীর নাম পাওয়া যায়। যারা নিয়মিত কিংবা অনিয়মিতভাবে ছবি আঁকছেন এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন, আবার এককভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রদর্শনী করছেন। বর্তমানে এরই ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই নারী শিল্পীরা দেশে এবং দেশের বাইরে একক কিংবা যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন প্রায়ই করে চলেছেন। একক প্রদর্শনীর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. নভেরা আহমেদ এর ৭৫টি ভাস্কর্য নিয়ে প্রথম একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী 'ইনার গেজ' শিরোনামে ১৯৬০ সালের ৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে দশদিনব্যাপী সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল। যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) প্রথম ভাস্কর্য প্রদর্শনী।
২. ১৯৮১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি শিল্পী আসমা কিবরিয়ার নয়দিনব্যাপী একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। (এমেচার শিল্পী)
৩. ১৯৮২-এর ১৬ জানুয়ারি থেকে একাডেমির উদ্যোগে শিল্পী শামীম শিকদারের পক্ষকালব্যাপী একক ভাস্কর্য-প্রদর্শনী ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়।
৪. ১৯৮৪ এর ১৩ই ডিসেম্বর শিল্পী নূরুননাহার পাপার দশদিনব্যাপী একক চিত্র-প্রদর্শনী। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়।
৫. ১৯৮৭-এর ১৭ই অক্টোবর থেকে শিল্পী নার্গিস মান্নানের সপ্তাহব্যাপী একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।
৬. ২০০২-২০০৩ ফেরদৌস আরা আহমেদের একক ক্যালিওগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে।
৭. বেঙ্গলে শিল্পী লায়লা শারমিনের একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।
৮. ২০০২ সালের নভেম্বরে 'মাই ইমোশন মাই ওয়ান্ড' নামে জয়নুল গ্যালারিতে রেবেকা সুলতানা মলির একক চিত্র-প্রদর্শনী।
৯. শিল্পাঙ্গনে গ্যালারিতে ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর 'ঝরা-পাতা' শীর্ষক একক প্রদর্শনী।
১০. বেঙ্গল গ্যালারিতে মুর্শিদা আরজু আল্পনার একক চিত্র-প্রদর্শনী।
১১. শিল্পী নাসিমা খান 'একটি শিশিরবিন্দু' নামের একক প্রদর্শনী।
১২. আলিয়াঁস ফ্রঁসেস, ঢাকায় শিল্পী সুলেখা চৌধুরীর একক চিত্র-প্রদর্শনী।
১৩. চট্টগ্রাম আলিয়াঁসে দিলারা বেগম জলির দশম একক চিত্র-প্রদর্শনী, ২০০৮
১৪. আলিয়াঁস ফ্রঁসেসে শিল্পী নাজিয়া আন্দালব প্রিমার 'ল্যাবারেনথ্ অব অ্যাবস্ট্রাকশন' নামে একক প্রদর্শনী।
১৫. বেঙ্গল শিল্পালয়ে শিল্পী মাকসুদা ইকবাল নিপার একক প্রদর্শনী।

১৬. সমকালীন চিত্রশালা শিল্পাঙ্গনে আইভী জামানের একক ভাস্কর্য-প্রদর্শনী।
১৭. শিল্পাঙ্গনে চিত্রশালায় শিল্পী নাজমা আক্তার-এর একক চিত্র-প্রদর্শনী।
১৮. তৈয়বা বেগম লিপির 'নারীত্ব' শীর্ষক একক চিত্র-প্রদর্শনী, ২০০৭
১৯. তৈয়বা বেগম লিপির 'নেভার বিন ইনটিমেট' শিরোনামে একক চিত্র-প্রদর্শনী ২০১৪
২০. বেঙ্গল গ্যালারিতে শিল্পী ফরিদা জামানের একক চিত্র-প্রদর্শনী ৮ থেকে ২১ আগস্ট ২০০৮ অনুষ্ঠিত হয়।
২১. ফরিদা জামানের 'নিরন্তর মাটির টানে' ৬ষ্ঠ একক চিত্র-প্রদর্শনী, ২০১৩
২২. রোকেয়া সুলতানার বেঙ্গল গ্যালারিতে 'অধরার স্বপ্নকথা' শীর্ষক একক চিত্র-প্রদর্শনী ২০০৫
২৩. রোকেয়া সুলতানার বেঙ্গল গ্যালারিতে 'মরমি সাম্রাজ্য' শীর্ষক এক চিত্র-প্রদর্শনী
২৪. নাসরীন বেগমের একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী ২০০১, জয়নুল গ্যালারি, ২০১০
২৫. নাসরীন বেগমের একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী মার্চ ২০০৬, হিমেল আর্ট-গ্যালারি

সত্তরের দশক থেকে ক্রমে আরো অধিক সংখ্যক নারীশিল্পী শিল্পকলার জগতে প্রবেশ করতে থাকেন এবং তার সঙ্গে পরিবর্তন করতে থাকেন শিল্পজগৎকে। নারীরা নিজেদের অস্তিত্বকে তুলে ধরে, তাঁদের শিল্পচর্চায় ফুটিয়ে তোলে সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে নারীরা নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বক্তব্য রাখছেন তাদের চিত্রে। শিল্পী নাজলী লায়লা মনসুর, ফরিদা জামান, নাসরীন বেগম, রোকেয়া সুলতানা, দিলারা বেগম জলি, নিলুফার চামান, কনকচাঁপা চাকমা, নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা, রেবেকা সুলতানা, শামীম সুব্রানা, আতিয়া ইসলাম এ্যানির মতো আরও নারীশিল্পীদের কাজে জীবনের ছোটখাট, আবেগ, অনুভূতি, চাহিদা, আনন্দ-বেদনা, পাওয়া না পাওয়া স্বপ্ন অনেককিছু উঠে আসে। এছাড়া সংসার জীবনের নানা অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন অনেক শিল্পী। অতি সাবলীল ও সূক্ষ্মভাবে তাঁরা তাঁদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। নারী মনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ বিভিন্ন প্রতিকূলতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এদেশের নারীশিল্পীরা। চলমান সমাজব্যবস্থা এবং আদিকাল থেকে নারীদের প্রতি যে অবহেলা চলে আসছে তাঁর চিত্র তুলে ধরেন তাঁদের চিত্রকর্মে। নারীরা পিছিয়ে নেই তাঁরা শিল্পকর্মের ভাষায় প্রতিবাদ করছেন। সম্মিলিতভাবে শুধু নারীরাই যৌথ-প্রদর্শনী করছেন এবং একতাবদ্ধভাবে চিত্রকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। যেমন, মার্চ ২০১৪-তে গ্যালারি কসমসে পনেরোজন নারীশিল্পীর শিল্পকর্মের এক ব্যতিক্রম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা বাংলাদেশের নারীশিল্পীদের বিশেষত্ব দান করেছে। সেক্ষেত্রে

বলতেই হয় যে নারী শিল্পীরা যেন প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত মূলধারার বাইরে একটা বিকল্পপথ বের করে চলেছেন। তাঁরা আত্মানুসন্ধানে ও স্বতন্ত্র শিল্পভাষা নিরীক্ষায় অধিক বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে যাচ্ছেন।[১৬]

বিশ শতকে কয়েকজন নারীশিল্পীর সমন্বয়ে গত ২০০৩ সালের জুলাই মাসে 'সাঁকো' নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠে। প্রথমে ড. ফরিদা জামানসহ নাসরীন বেগম, কুহু, ফারেহা জেবা ও কনকচাঁপা ২০০৩ সালে জুলাই মাসে একত্র হয়। পরবর্তীকালে তাঁদের সঙ্গে আরো পাঁচজন যুক্ত হয়ে ছিলেন তাঁরা হলেন নাইমা হক, রেবেকা সুলতানা মলি, ফারজানা ইসলাম মিল্কী, লায়লা শারমিন ও সুলেখা চৌধুরী। সর্বমোট দশজনের প্রচেষ্টায় প্রথমে মিরপুর সিআরপিতে তিনদিনের একটি যৌথ চিত্র-কর্মশালা এবং পরবর্তীকালে গ্যালারি 'চিত্রক'-এ যৌথ-প্রদর্শনীর মাধ্যমে 'সাঁকো' আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'সাঁকো' অর্থাৎ Bridge বা সেতু। একে অন্যের সঙ্গে সেতু বন্ধন তৈরির ক্ষুদ্রতম চেষ্টা তাঁদের। এই গোষ্ঠিটি শিল্পচর্চার পাশাপাশি সমাজে সেবামূলক কাজ করার চেষ্টা এবং ছোট ছোট কাজের মধ্যে দিয়েই বৃহত্তর সেবামূলক কাজ করার আশা রাখে। তাঁরা প্রথম দু'বছরের কম সময়ে মোট পাঁচটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এভাবেই সংগঠনটি সামনে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশের শিল্পচর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য কতগুলো গ্যালারির সহযোগিতা ও প্রশংসার দাবি রাখে।[১৭] সংগঠনটি জন্মলগ্ন থেকে তারা যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। সদস্য শিল্পীদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগের মাধ্যমে তাঁদের সৃজনকে বিকশিত করতে মানসিক সহায়তার পাশাপাশি সমাজে অবহেলিত ও নির্যাতিত শিল্পীকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা এবং সম্ভাবনাময় নবীন শিল্পীকে বৃত্তি প্রদান, দুর্যোগ দুর্ঘটনায় পীড়িত মানুষের প্রতি মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মহান ব্রত নিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পীদের তৎপরতার মতোই দুর্বার গতিতে চলছে।[১৮] একাদশ জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে নারীশিল্পীদের প্রসঙ্গে শিল্প সমালোচক অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন নারীশিল্পীরা বেশ পরাক্রমের সঙ্গেই প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের নারী শিল্পীদের সংগঠন সাঁকো 'সাঁকোর রঙ' শীর্ষক একটি প্রদর্শনী বেঙ্গল শিল্পালয়ে মার্চ ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে অতিথি শিল্পী হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, ট্রিনো বোহান টাইরি এবং প্রতিবন্ধী শিল্পী সেলিমা শারমিন ফারজানা রুমাকে। সর্বমোট তেরোজন শিল্পীর তিনটি করে কাজ নিয়ে বেশ জমজমাট প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছে আপন ড্রাগ রিহ্যাবিলিটেশন এর সাহায্যার্থে। এই প্রদর্শনীর ছবিগুলির

প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো নারীর দুঃখ-দুর্দশা আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা, অপেক্ষা, স্বপ্ন বাস্তবতা ও প্রতিবন্ধকতা। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 'জীবনের ছায়া' শীর্ষক আরেকটি প্রদর্শনীতে দশজন নারীশিল্পীর সঙ্গে আমন্ত্রিত এক কিশোরী শিল্পীর চারটি চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর বিক্রয় লব্ধ অর্থের একটি অঙ্ক সাম্প্রতিক সুনামিতে আক্রান্তদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। সাঁকো শিল্পীদের সঙ্গে এসিড দগ্ধ কিশোরী শিল্পী হলো ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডের রুবিনা খাতুন এবং আমন্ত্রিত হয়েছে ঢাকার কামরাঙ্গীচরের অন্ধ গায়েন দেওয়ান মোহাম্মদ বেলায়েত। সাঁকোর এই সহমর্মিতায় শিল্পীদ্বয় অনুপ্রাণিত হয়েছন। এই শিল্পীরা চারুশিল্পের মূল স্রোতধারার শিল্পী।[১৯]

এছাড়াও সাঁকো ২০১৩ সাল পর্যন্ত দেশে এবং দেশের বাইরে অনেক যৌথ প্রদর্শনী করেছে যেমন:

1. Illuminating Spirit of Colours. 4-18 May 2012 Group Exhibition by Shako- Venue: Bay's Galleris, Radius Centre 57 Gulshan Avenue 1, (5th Floor) Dhaka.
2. Delivering Art an artists workshop, 2005
3. Colours of Shako Bengal Gallery, 2005
4. Expression of Shiko- March 2007 Alliance Francaise
5. Image in the Mirror, 5, February 2005
6. Essence of `Shanko' group Exhibition 2009 March 27 April 4 at gallery Chitrak
7. Siddhartha Art Gallary, Babar Mahal, Kathmandu Nepal, Renderzvous, Nepal 19 th June to 24th June- 2009.

'সাঁকো' গ্রুপ সংগঠনটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপহার দিয়েছে চোখ স্বস্তিকর এক মনোরম প্রদর্শনী। 'সাঁকো' যে শিল্প-অভিযাত্রা শুরু করেছে তা নিঃসন্দেহে মহৎ উদ্যোগ। বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া নারী শিল্পীদের সামনে এগিয়ে দেয়ার মহৎ চেষ্টা। এ পর্যায়ে অবশ্য সংঘবদ্ধ চর্চার মধ্য দিয়ে সিদ্ধিলাভ সম্ভব প্রতিনিয়ত একত্র হয়ে কাজ করা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন নিঃসন্দেহে দেশের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে। 'সাঁকো' সত্যিকার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করার মত এবং সাঁকো সত্যিই সবার মধ্যে সাঁকোর বন্ধন গড়ে তুলবে এবং মঙ্গলের বার্তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবে এটাই সকলের কামনা। বর্তমানে শিল্পীদের নানারকম সংগঠনই বেড়ে

উঠতে দেখা যায়। তবে নারীশিল্পীদের সংগঠন 'সাঁকো'র মত কার্যক্রম লক্ষ করা যায় না। 'সাঁকো' বাংলাদেশের নারীশিল্পীদের উজ্জ্বল সম্ভাবনারই আভাস দেয়।

৪

নারীরা সবসময়ই সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে নারীদের চারুকলার জগতে সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলার যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে নানা সময়ে অনুষ্ঠিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে নারীদের পদচারণা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদেশে অনুষ্টিত বিভিন্ন প্রদর্শনী যেমন-এশীয় দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী, জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, নবীন চারুকলা প্রদর্শনী ছাড়াও নানা দিবসের স্মরণে যৌথ প্রদর্শনী কিংবা আলাদা করে নারী শিল্পীদের একক অথবা সাংগঠনিক যৌথ-প্রদর্শনীর প্রাপ্ত তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, শিল্পজগতে নারীশিল্পীদের আগমনের আগ্রহ এবং প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলস্বরূপ নব্বই দশক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত নারীশিল্পীদের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের গড় মাত্রা এক পঞ্চমাংশ থেকে প্রায় এক চতুর্থাংশে উন্নীত হয়েছে। আবার অংশগ্রহণকারী নারীশিল্পীদের কাজের বিষয়গত বৈচিত্র্য এবং শিল্পের গুণগত মান উচ্চ-প্রশংসার দাবিদার। বাংলাদেশের নারীশিল্পীদের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুরুষশিল্পীর তুলনায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের সমকালীন নারীশিল্পীদের কাজ আধুনিক কালের অন্যান্য শিল্পীদের কাজের থেকে যথেষ্ট ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদের কাজের মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য, রঙের গভীরতা, টেক্সচার, ড্রইংয়ের বিশেষত্ব বাস্তবতার নিরিখে আধুনিকতায় পর্যবসিত। যদিও তাঁরা এখনো নিজস্ব আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে এদেশের নারীশিল্পীরা তাদের শিল্প-অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের বাইরে নানা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে বিরল সম্মান অর্জন করছেন যা এদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। আশা করা যায় শিল্পাঙ্গনে নারীশিল্পীরা আগামীতে আরও ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। সেই সঙ্গে জাতীয় অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় নারীশিল্পীরা সঠিক এবং জোরালো অবস্থান তৈরি করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জন করতে সক্ষম হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. লালারুখ সেলিম সম্পা. *চারু ও কারুকলা*(ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২৫১-২৫২
২. *তদেব*, পৃ. ২৫২-২৫৩
৩. *তদেব*, পৃ. ২৫৪
৪. *তদেব*, পৃ. ২৫৪-২৫৫
৫ *তদেব*, পৃ. ২৫৬
৬ *তদেব*, পৃ. ২৫৬-২৫৭
৭. গোলাম মাওলা রনি, 'মোঘল হেরেমে দুনিয়া কাঁপানো প্রেম', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৮. শামীম আমিনুর রহমান, *প্রথম আলো*, 'ঢাকার প্রথম মুসলিম নারী চিত্রশিল্পী', রবিবার, ১০ জুলাই ২০১১
৯. লালারুখ সেলিম সম্পা. *চারু ও কারুকলা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭-২৬১
১০. উদ্ধৃত—*প্রথম আলো*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১১. উদ্ধৃত— *উইকিপিডিয়া*, নভেরা আহমেদ
১২. মইনুদ্দীন খালেদ, 'নারীর মননে বাংলাদেশের চিত্রশিল্প', মাসিক *সাঁকো*, জুলাই ২০০৩
১৩. নবম দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী-১৯৯৯, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা
১৪ নজরুল ইসলাম 'সমকালীন শিল্প ও শিল্পী'(ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা জানুয়ারি, ১৯৯৫), পৃ. ৩৮-৪৪
১৫. নজরুল ইসলাম, 'সমকালীন শিল্প ও শিল্পী'(ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৫), পৃ. ৪২
১৬. লালারুখ সেলিম সম্পা. *চারু ও কারুকলা*(ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২১৪
১৭. ড. ফরিদা জামান, 'সাঁকো', মহিলা শিল্পী সংগঠন বাংলাদেশ, মার্চ-২০০৫ প্রদর্শনী ক্যাটালগ
১৮. নজরুল ইসলাম, একাদশ জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী প্রাসঙ্গিক, ১৯৯৪, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৫
১৯. জামিল মুস্তাফিজ, 'নামির সঙ্গে নবীনের সেতুবন্ধন', *কালি ও কলম*, আবুল হাসনাত সম্পা., ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মার্চ ২০০৫

সাহিত্যিকী
দ্বিপঞ্চাশৎ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ | জুন ২০২২ | বাংলা বিভাগ
পৃষ্ঠা : ১৫১- ১৭৮ | শব্দসংখ্যা ৪৬৭৯ | ISSN: 1994-4888 | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ: মানুষ ও প্রকৃতির বিচিত্র মেলবন্ধন

মো. ইসমাইল হোসেন সাদী*

Abstract

Emerging from the grassroots, Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975) was able to establish himself as the main leader of the liberation of the Bengali nation, the architect of sovereign Bangladesh, and the father of the nation. He brought in the hands of the Bengalis the liberation from the excruciating pain of a thousand years of subjugation and neglect. He has been behind bars for several years for the independence of the nation. Proof of the fact that prison has become a school of politics for famous politicians is his *The Unfinished Memoirs* (2012), *The Prison Diaries* (2016), and *Amar Dekha Naya Chinna*

* প্রভাষক | স্কুল অফ জেনারেল এডুকেশন | বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ | ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি | ঢাকা, বাংলাদেশ | ই-মেইল: ismile.hossain@bracu.ac.bd

(2020). Bangabandhu was a magnanimous who was able to win the hearts of common people with his political wisdom. As he became very close to the common people, his thoughts also revolved around the common man - their freedom and betterment from exploitation and deprivation. The first two books are autobiographical. We aspire to uncover the horizons of the real public leader Sheikh Mujibur Rahman in observing the way of ordinary people's life, nature, and children of nature aka plants and animals.

সার-সংক্ষেপ

একেবারে তৃণমূল থেকে উঠে আসা শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) বাঙালি জাতির মুক্তির প্রধান নেতা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও বাঙালি জাতির জনক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বাঙালির হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছিলেন হাজার বছরের অধীনতা ও উপেক্ষার বিষম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। জাতির প্রয়োজনে বছরের পর বছর তাঁকে কারান্তরীণ থাকতে হয়েছে। খ্যাতনামা রাজনীতিকদের কাছে কারাগার যে রাজনীতির পাঠশালা হয়ে ওঠে, তারই প্রমাণ তাঁর রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২) ও *কারাগারের রোজনামচা* (২০১৭), *আমার দেখা নয়াচীন* (২০২০)। বঙ্গবন্ধু তেমনই এক ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজস্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে সাধারণ মানুষের মন জয় করতে পেরেছিলেন। তিনি যেমন সাধারণ মানুষের অতি নিকটজন হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি তাঁর ভাবনাজুড়েও ছিল সাধারণ মানুষ—শোষণ-বঞ্চনা থেকে তাদের মুক্তি ও কল্যাণকামনা। প্রথমোক্ত গ্রন্থ দুটি আত্মজীবনীমূলক। সাধারণ মানুষ, প্রকৃতি ও প্রকৃতির সন্তান তথা গাছপালা, পশুপাখির জীবনাচরণ পর্যবেক্ষণে প্রকৃত জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা অনন্য ও ব্যতিক্রমী ছিল, গ্রন্থদ্বয় অবলম্বনে তার দিগন্ত-উন্মোচনই আমাদের অন্বিষ্ট।

সংকেত-শব্দ

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, পরশ্রীকাতরতা. পূর্ববঙ্গ, ছয়দফা

মূল-প্রবন্ধ

পৃথিবীর সব কীর্তিমানই স্বপ্ন দেখেন এবং নিজ সাধনার মধ্য দিয়ে জগৎকে আলোড়িত করে থাকেন। ফলে তাঁরা স্বপ্ন দেখানও। নিজেদের সত্তার সমান্তরাল হয়ে ওঠা স্বপ্নের বাস্তবায়নও ঘটাতে পারেন তাঁরা। স্বপ্ন ও সাধনার মধ্য দিয়ে পথ দেখানোই তাঁদের কর্মব্রত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। সেই কীর্তির সুবাদেই তাঁরা উত্তর প্রজন্মের কাছে গণ্য হন কালোত্তীর্ণ মহামানব হিসেবে। সাধনার একাগ্রতা, আত্মত্যাগের মহিমা, প্রতিজ্ঞার অবিচলতা, বঞ্চিত মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তিলে তিলে সেই স্বপ্নের দিকে অগ্রগামী ও অবিকল্প এক কাণ্ডারিতে পরিণত করে তুলেছিল। তাঁর স্বপ্নের মধ্যেই ছিল বহুমুখী কর্মস্পৃহার খতিয়ান। সংগ্রামী মনোবল এবং অভিজ্ঞতার আয়নায় ভবিষ্যতের পথনকশাকে চূড়ান্ত করাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য। সততার সঙ্গে নিষ্ঠা, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুচিন্তা, একাগ্রতার সঙ্গে অকৃত্রিম সাহস; এমনকি অন্যায়ের কাছে হার-না-মানার দৃঢ়তা যে গোটা জাতির স্বপ্নের চাইতেও বিস্তৃত দিগন্তের একাধিপতি করে তুলতে পারে, বঙ্গবন্ধু তা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। ক্ষণজীবনের অধিকারী বঙ্গবন্ধুর অর্জন জাতিগত ভাবনা বা কল্পনার চাইতেও অনন্য উচ্চতায় বিরাজমান। ধাপে ধাপে তিনি সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক উচ্চাসনে পৌছেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়েছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকালে। তবে তিনি 'পাকিস্তান-দাবির ঘোর সমর্থক হলেও তাঁর মনের গঠনটা ছিল অসাম্প্রদায়িক। [...] সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের উপদলভুক্ত হওয়ায় তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং একটি ন্যায়পর সমাজগঠনের চিন্তা নিজের মধ্যে লালন করতে পেরেছিলেন।'[১] সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাধীনতার তিনি স্বপ্নবীজ বপন করেছিলেন।

সেই সময়গুলোতে রাজনীতির প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধু সফর করতে হয়েছে গোপালগঞ্জ থেকে মাদারিপুর, কলকাতা থেকে ঢাকা, পাটনা থেকে আসানসোল, দিল্লি থেকে করাচি প্রভৃতি স্থানে। রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে নদীপথে তাঁকে যেতে হয়েছে হাওরাঞ্চল কিংবা দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার শহর থেকে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যপ্রাপ্তি, অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন তাঁকে ক্রমশ মৌলিক রাষ্ট্রচিন্তার নায়কে পরিণত করে। যে জাতি হাজার বছর ধরে নানা দেশের, নানা জাতির শাসকের বশংবদ হয়ে ছিল, কয়েকজন যোগ্য সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সে-জাতির ভূখণ্ডকে শোষণমুক্ত করার গুরুভার তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

কারাপ্রকোষ্ঠের নিঃসঙ্গ সময়গুলোতে বঙ্গবন্ধু সুযোগ পেলেই দেশ-বিদেশের সেরা লেখকদের গ্রন্থপাঠ করেছেন। তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থদ্বয়ে লেখার স্বকীয় ধরন, শব্দ ব্যবহারের নিজস্বতা, চিন্তার গভীরতা, রাজনৈতিক দর্শন — এসব প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাভাষীদের কাছে অনন্য এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবের চিন্তাজুড়ে বিরাজমান ছিল অধিকারবঞ্চিত, বাস্তুহারা সাধারণ মানুষ, যারা সচরাচর উচ্চবিত্ত পাকিস্তানি রাজনীতিকদের আলোচনাতেও স্থান পেত না।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থ দুটির পাণ্ডুলিপিই ১৯৬৬-১৯৬৯ সময়পর্বে[২] কেন্দ্রীয় কারাগারে নিঃসঙ্গ থাকা অবস্থায় রচিত। গ্রন্থ দুটি পৃথক হলেও পরস্পরের পরিপূরক। তবে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* নামকরণেই স্পষ্ট, এটি বঙ্গবন্ধুর পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ নয়। এ গ্রন্থে তিনি ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন মাত্র। এতে স্থান পেয়েছে নিজের রাজনৈতিক জীবন, মুসলিম লীগের রাজনীতি, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, ভারতভাগ, দলীয় রাজনীতি প্রভৃতির অল্পবিস্তর আলোচনা। যেহেতু আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখার সিংহভাগজুড়েই স্থান পেয়েছে নিজের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্ক, সরকার ও প্রশাসনের লোকদের আচরণ, রাজনীতির নানা জটিল বিষয়-আশয়, সমাজের অন্যান্য পেশাজীবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ব্যক্তিগত তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা, পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃবন্দের ভালো-মন্দ দিক, পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্য, পরিবার ও কারাগারে অন্তরীণ থাকাকালে স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে তাঁর আবেগাপ্লুত সাক্ষাৎপর্ব ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে রয়েছে একেবারের

কারাজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক অনুপুঙ্খ বর্ণনা। প্রকৃত জননেতা বলেই সহকর্মী ও পরিবার নিয়ে উদ্বিগ্নতা, দলীয় নানা সংকট ও দুশ্চিন্তা কিংবা ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা নিয়ে আত্মমগ্নতা সত্ত্বেও কারাগারের অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার কিংবা ঘনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিচেতনা তাঁর ভেতরে কাজ করেনি; মাঝখানে দাঁড়িয়ে যায়নি কোনো উন্নাসিকতার দেয়াল। ফলে সাধারণ কারারক্ষী, দীর্ঘদিনের কারাবন্দী কয়েদি, সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কারাভোগের ফলে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বা পাগল, ভয়ংকর অপরাধী কিংবা শিশুকিশোর থেকে শুরু করে কৃষক, মাঝি, কারখানা-শ্রমিক প্রভৃতি পেশাজীবী—তাঁর বর্ণনা-বিশ্লেষণের ক্যানভাস থেকে বাদ পড়েনি কেউ। বরং তৎকালীন জনজীবনের সংগ্রাম, সাধারণ মানুষের নানামুখী সংকট ও প্রকৃতির বহু বর্ণিলতা—একজন রাজনীতিবিদ হয়েও পেশাদার লেখকের মতোই তিনি স্বকীয় শব্দভাষ্যে উদ্ভাসিত করেছেন।

দুই

যেকোনো রাজনীতিবিদের ভাবনায় প্রাধান্য পায় মানুষ। সেই 'মানুষ' অবশ্যই তার দলীয় মানুষ, তার সমকক্ষ মানুষ, তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মানুষ, বিশেষ করে ভোটার বা সমর্থক গোষ্ঠীই হওয়ার কথা। কিন্তু *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র শুরুতেই আমরা দেখতে পাই, বঙ্গবন্ধু 'আকাশের দিকে চেয়ে' ভাবছেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা (১৮৯২-১৯৬৩)—সাধারণ মানুষের কথা যাঁরা কাছে তিনি ভাবতে শিখেছিলেন। জীবনী লেখার শুরুতে তিনি উল্লেখ করেছেন মধুমতী নদীর কথা। উল্লেখ করেছেন চারণ কবিদের কথা। তাঁদের কাছে তিনি শুনেছেন নিজের বংশের ঐতিহ্যের কথা। এক গৃহশিক্ষকের উদ্যোগে মাত্র সতেরো বছর বয়সে তাঁকে দেখা যায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল সংগ্রহের কাজে অংশ নিতে। সেই শিক্ষক ও তাঁর কর্মকাণ্ডের ভাষ্য থেকে মানুষের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার সদিচ্ছার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, 'মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা মুসলিম সেবা সমিতি গঠন করেন, যার দ্বারা ছেলেদের সাহায্য করতেন। মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠাতেন সকল মুসলমান বাড়ি থেকে। প্রত্যেক রবিবার আমরা থলে নিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাউল উঠিয়ে আনতাম এবং এই চাল বিক্রি করে তিনি গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার ও অন্যান্য খরচ দিতেন। ঘুরে ঘুরে জায়গিরও ঠিক করে দিতেন। আমাকেই

অনেক কাজ করতে হত তাঁর সাথে। হঠাৎ যক্ষ্মা রোগে তিনি মারা যান। তখন আমি এই সেবা সমিতির ভার নেই এবং অনেক দিন পরিচালনা করি।'[৩] দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নির্বিঘ্ন করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের সামাজিক কর্মকাণ্ডের হাতেখড়ি হয়। তিনি যে জনগণের সত্যিকারের স্বজন হয়ে উঠবেন, তা সংকেতিত হয়ে উঠেছে এর মধ্য দিয়ে। তাঁর মধ্যে মানুষের আত্মত্যাগী মনোভাব ও আন্তরিক উপলব্ধি লক্ষ করা যায় তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময়। তখন তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র। বর্ণনা-দক্ষতায় তিনি তুলে ধরেছেন তৎকালীন ইংরেজ সরকারের গাফিলতি ও সাধারণ মানুষের প্রতি অবহেলার চিত্র। বন্ধুবান্ধব ও দলবল নিয়ে তিনি যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যুর মুখে পতিত মানুষকে বাঁচানোর তাগিদে, তাও লিপিবদ্ধ করেছেন অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে। রাজনীতির নানা ধাপ অতিক্রম করে তিনি কীভাবে হয়ে উঠলেন সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-সোপানের অপরিহার্য নির্মাতা, তা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় উঠে এসেছে।

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষকালে খাদ্যসংকট পরিস্থিতি মোকাবিলাকে শেখ মুজিব স্বজ্ঞানেই দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করছিলেন। তখন অঘোষিতভাবে মুসলিম লীগের মধ্যে দুটি দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটি প্রগতিশীল, অন্য প্রতিক্রিয়াশীল। সেই সময় তিনি সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে থাকা প্রগতিশীল অংশের প্রাদেশিক কাউন্সিল সদস্য হন।[৪] তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ যে কৃত্রিম সংকটের কারণে হয়েছে, তা উঠে এসেছে দূরদর্শী মুজিবের কলমকণ্ঠে। ইংরেজের যুদ্ধকৌশলে অস্ত্রের প্রাধান্য, সাধারণ মানুষের প্রাণ অবহেলিত ছিল। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় দুর্ভিক্ষ-কবলিত মানুষের করুণ অবস্থা তাঁকে কাতর করে তুলেছিল। সাধারণ মানুষের প্রতি এই অবর্ণনীয় ও অমানবিক আচরণ তিনি মানতে পারেননি। এ বিষয়ে খুব সংক্ষেপে অথচ সাবলীল ও অসাধারণ দক্ষতায় চিত্ররূপময় গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন:

> ইংরেজের কথা হল, বাংলার মানুষ যদি মরে তো মরুক, যুদ্ধের সাহায্য আগে। যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রথম স্থান পাবে। ট্রেনে অস্ত্র যাবে, তারপর যদি জায়গা থাকে তবে রিলিফের খাবার যাবে। যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বাঙালির কিছুরই অভাব ছিল না। [...] মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তা ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও,

> মরে তো গেলাম, আর পারি না. একটু ফেন দাও।' এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে। [...] হোস্টেলে যা বাঁচে দুপুরে ও রাতে বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দেই, কিন্তু কি হবে এতে?[৫]

সোহরাওয়ার্দী তখন সাপ্লাই মিনিস্টার। তিনি লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করলে মুসলিম তরুণ কর্মীদের নিয়ে শেখ মুজিব আত্মনিয়োগ করেন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য। তাঁর ভাষায়, 'দিনভর কাজ করতাম, আর রাতে কোনোদিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনোদিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম।'[৬] এমন আত্মত্যাগের মানসিকতা তিলে তিলে তাঁকে অবিকল্প রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। এ সময় তিনি বহু বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের স্তাবকতা করে যারা খান বাহাদুর, খান সাহেব, রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেছিলেন, তাঁদের হাতে রাজনীতিকে বন্দি হতে দিতে চাননি। আদতে পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁদের তেমন কোনো কৃতিত্বও নেই, বরং কৃতিত্ব আছে সাধারণ মানুষের। সে-কথা তিনি লিখেছেন অবলীলায়: 'শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব যদি বাংলার কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় না করতে পারতেন এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে টেনে আনতে না পারতেন, তাহলে কোনোদিনও পাকিস্তান আন্দোলন বাংলার কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারত না।'[৭] উচ্চবিত্ত রাজনীতিকদের বিপরীতে সুভাষ বসুকে তাঁর সত্যিকারের মুক্তির দূত মনে হতো। তাঁর 'মনে হত, সুভাষ বাবু একবার বাংলাদেশে আসতে পারলে ইংরেজকে তাড়ান সহজ হবে।'[৮] নেতাজীর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা মুজিবকে আকৃষ্ট করেছিল।

প্রসঙ্গ পেলেই বঙ্গবন্ধু দার্শনিকের মতো মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থের বেশ কয়েক জায়গায় বাঙালি জাতির দুর্বলতা নিয়ে সমালোচনা করেছেন। বাঙালিদের মধ্যে নানা কোন্দল ও রেষারেষির কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন:

> আমাদের বাঙালিদের মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হল 'আমরা মুসলমান, আর একটা হল, আমরা বাঙালি।' পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোন ভাষারই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, 'পরশ্রীকাতরতা'। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে 'পরশ্রীকাতর' বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই, ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয়

> না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ায় খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ, যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজকে এরা চেনে না, আর যত দিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।[৯]

> বঙ্গবন্ধুর এই বিশ্লেষণ বাঙালির দেড় বছরের ইতিহাসের বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিতবহ। এই দীর্ঘ সময়ে জাতি হিসেবে বাঙালি, বাংলা বা বঙ্গ ভূখণ্ড বহুবার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছিল। দীর্ঘ সময় যেমন তা ধরে রাখতে পারেনি, তেমনি প্রভাবশালী জাতি হিসেবে বাঙালি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। কারণ, 'কেবলমাত্র একই নরগোষ্ঠীজাত 'জন হলেই তারা জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার নানাবিধ উপাদানের মধ্যে ভৌগোলিক ঐক্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ।'[১০] এসব বৈশিষ্ট্য বাঙালির মধ্যে ছিল না। উপরন্তু জাতি হিসেবে বাঙালি অনেকটা অন্তর্মুখী বৈশিষ্ট্যের। তাই বলা যায়:

> 'আত্মকেন্দ্রিকতা' বাঙালি মানসে যেমন একটি গুণ, তেমনি দুর্বলতার দিকও বটে। স্মরণ রাখা দরকার আত্মকেন্দ্রিক জীবনমুখিতাকে সুসংসহত ঐক্যরূপ না দিতে পারলে তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতায় পর্যবসিত হয়। বঙ্গরাষ্ট্রের ইতিহাসে বঙ্গ স্বাধীন থেকেছে সুদীর্ঘকাল, কিন্তু বাঙালি রাজবংশের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এটা যেমন লজ্জাকর, তেমনি শিক্ষণীয় এর অন্তরালে বাঙালি চরিত্রের আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিস্বার্থপরতা সক্রিয় ছিল কিনা, ভেবে দেখবার বিষয়।[১১]

ইতিহাসের এই বাস্তবতাকে বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছেন তাঁর বহু বঙ্কিম ও সমৃদ্ধ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। মানুষের ইতিবাচক-নেতিবাচক দুই দিকই নির্মোহ বিশ্লেষণে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর লেখায়। তবে 'সাধারণ মানুষ' যেমন তাঁর ওপর আস্থা রেখেছিলেন, তেমনি তিনিও ক্রমশ তাঁদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির ওপর ভরসা করেছিলেন।

তিন

বঙ্গবন্ধুর লেখায় রাজনীতির বিচিত্র বিষয় স্থান পেলেও সাধারণ মানুষের প্রতি শতভাগ নিবেদন এবং প্রকৃতিই যে তাঁকে যে সহজভাবে জীবন ও জগৎকে দেখতে প্রভাবিত করেছিল, সেটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে সিদ্ধহস্তের বর্ণনায়। তাতে সাধারণ মানুষের

পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি আলাদা অনুরাগ লক্ষণীয়। ১৯৪৬ সালে দলীয় কাজে গিয়েছিলেন দিল্লিতে। সেখান থেকে আগ্রায় গিয়েছিলেন তাজমহল দেখতে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। তাঁর আনন্দ বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ। তিনি 'মনে মনে পূর্ণিমাকে ধন্যবাদ' দেন এবং বলেন, 'তাজকে দেখতে হলে আসতে হবে সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যাবার সময়, চাঁদ যখন হেসে উঠবে তখন।'[১২] একজন রাজনীতিবিদ প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যকে কতটা মাধুর্য সহকারে লালন করতে পারেন, তাজমহল দর্শনের একুশ বছর পর রচিত লিপিবদ্ধ এ বর্ণনায় তা ভাস্বর হয়ে উঠে। স্মৃতিকাতর এ বর্ণনা অপূর্ব কাব্যিকতায় পরিপূর্ণ: 'সূর্য যখন অস্ত গেল, সোনালি রঙ আকাশ থেকে ছুটে আসছে। মনে হল, তাজের যেন আর একটা নতুন রূপ। সন্ধ্যার একটু পরেই চাঁদ দেখা দিল। চাঁদ অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে আর সাথে সাথে তাজ যেন ঘোমটা ফেলে দিয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে। কি অপূর্ব দেখতে!'[১৩]

ভারত যেভাবে ভাগ হয়েছে, সেটা শেখ মুজিব মানতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল, গোটা বাংলা-পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম অভিন্ন থাকবে। হয় পাকিস্তানের সঙ্গে যাবে অথবা ভারতের সঙ্গে। কারণ, তাঁর বড় চিন্তা ছিল অবহেলিত এ অঞ্চলসমূহের মানুষকে নিয়ে। সাধারণ মানুষের ছোটবড় সমস্যা নিয়ে তিনি কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালে ফরিদপুর, কুমিল্লা, ঢাকা প্রভৃতি জেলার কৃষক ও দিনমজুরদের দুরবস্থার বর্ণনা-চিত্রে। জনগণের প্রতি কতটা আন্তরিক দরদ ও আত্মপ্রতিশ্রুতি ছিল যে, সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি দিনমজুরদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

> ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লোক খুলনা ও বরিশালে ধান কাটবার মরশুমে দল বেঁধে দিনমজুর হিসাবে যেত। এরা ধান কেটে ঘরে উঠিয়ে দিত। পরিবর্তে একটা অংশ পেত। এদের দওয়াল বলা হত। হাজার হাজার লোক নৌকা করে যেত। আসবার সময় তাদের অংশের ধান নিজেদের নৌকা করে বাড়িতে নিয়ে আসত। [...] যখন এবার দাওয়ালরা ধান কাটতে গেল, কেউ তাদের বাধা দিল না। [...] যখন তারা দুই মাস পর্যন্ত ধান কেটে তাদের ভাগ নৌকায় তুলে রওয়ানা করল বাড়ির দিকে তাদের বুভুক্ষু মা-বোন, স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়াবার জন্য, যারা পথ চেয়ে আছে, আর কোনো মতে ধার করে সংসার চালাচ্ছে-কখন তাদের, স্বামী, ভাই, বাবা ফিরে আসবে ধান নিয়ে, পেট ভরে কিছুদিন ভাত খাবে, এই আশায়-তখন নৌকায় রওয়ানা করার সাথে সাথে তাদের পথ রোধ করা হল।' ধান নিতে পারবে না সরকারের হুকুম, ধান জমা দিয়ে যেতে হবে, নতুবা নৌকাসমেত

> আটক ও বাজেয়াপ্ত করা হবে। [...] আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করলাম। সভা করলাম. সরকারি কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎও করলাম কিন্তু কোনো ফল হল না। [...] সরকার হুকুম দিল ধান কাটতে আপত্তি নাই। তবে ধান আনতে পারবে না। নিকটতম গুদামে জমা দিতে হবে এবং সেই গুদাম থেকে কর্মচারীরা একটা রসিদ দেবে, দাওয়ালরা দেশে ফিরে এসে সেই পরিমাণ ধান নিজের জেলার নিকটতম গুদাম থেকে পাবে। [...] ১৯৪৮ সালের শেষে অথবা ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে এই হুকুম সরকার দিল। দুঃখের বিষয়, ধান গুদামে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ দাওয়াল ফিরে এসে ধান পায় নাই। কোন রকম পাকা রসিদ ছিল না, সাদা কাগজে লিখে দিয়েই ধান নামিয়ে রাখত। সেই রসিদ নিয়ে দেশের গুদামে গেলে গালাগাল করে তাড়িয়ে দিত।[১৪]

সরকারের অন্যায় সিদ্ধান্তের কারণে দিনমজুর 'দাওয়ালদের' বার্ষিক এই উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ধান চাষ করা কৃষকগণ শ্রমিকের অভাবে ধান নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েন। তরুণ শেখ মুজিব সেই সময়ে চেষ্টা করেও এই অন্যায় কবল থেকে কৃষক-শ্রমিকদের রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু এই ঘটনায় ভেতরে ভেতরে তিনি আরও বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাদের সম্পর্কে মুজিবের যে উপলব্ধি, সেটা অনেকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো। কারণ কৃষকের শিল্পিত কাজের উপকারভোগী সমাজের প্রত্যেকেই। কবি তাঁর এক কবিতায় বলেছেন:

> চাষি খেতে চালাইছে হাল,
> তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল–
> বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
> তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
> অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
> সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।...
> আমার কবিতা, জানি আমি,
> গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
> কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
> যে আছে মাটির কাছাকাছি,
> সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।[১৫]

মাটি ও সাধারণ মানুষের কাছাকাছি, তাদের দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনা থেকে মুক্ত করতেই ছিল শেখ মুজিবের আমৃত্যু সংগ্রাম। একবার খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকার জিন্নাহ ফান্ড নামে একটা তহবিল গঠনের চেষ্টা করেন। এটাকে শেখ মুজিব সমর্থন করলেও এর নামে যে বাড়াবাড়ি চলেছিল, সেটাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। সেই সময়ে তিনি একদিন নৌকায় যাচ্ছিলেন। নৌকার শ্রমিক তাঁকে জানান, দিনে উপার্জন এক-দুই টাকা। অথচ তাঁকে চাদা দিতে হবে পাঁচ টাকা। শ্রমিকেরা-কৃষকেরা তাকেই অনুযোগ জানিয়েছেন, কেননা, পাকিস্তান স্বাধীন হলে এই ধরনেই মানুষের বঞ্চনা থাকবে না, তাদের প্রতি বৈষম্য থাকবে না, এমন স্বপ্নের কথা তরুণ শেখ মুজিবই তাদের শুনিয়েছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের সময়।[১৬]

শেখ মুজিবের বয়স যত বাড়তে থাকে, তত বেশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। আর সরকার ততই রুষ্ট হয় তাঁর ওপর। গ্রেপ্তার আর কারাবরণ তাঁর জন্য দৈনন্দিন স্বাভাবিক ঘটনার মতো হয়ে ওঠে। ফলে সাধারণ মানুষেরও তাঁর কাছে সনির্বন্ধ প্রশ্ন, 'আপনাকে কেন জেলে নেয়? আপনিই তো আমাদের পাকিস্তানের কথা শুনিয়েছেন। আবার বলে, কত কথা বলেছিলেন, পাকিস্তান হলে কত উন্নতি হবে, জনগণ সুখে থাকবে, অত্যাচার জুলুম থাকবে না। কয়েক বছর হয়ে গেল দুঃখই তো আরও বাড়ছে, কমার লক্ষণ দেখছি না। চাউলের দাম কত বেড়ে গেছে। কি উত্তর দেব? এরা সাধারণ মানুষ।'[১৭]

কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেও তাঁর জীবনের সান্নিধ্যে আসা ছোটবড় সবাইকে স্মরণ করে লিখেছেন। কবে কখন একজন আইনজীবী তাঁদের পার্টি অফিসে এসে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে দিতে চেয়েছিলেন ভুলে যাননি তাঁর কথাও। বরং অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাচিত্তে তাঁকে স্মরণ করেছেন, প্রশংসা করেছেন। নাম তাঁর মিস্টার মোহাম্মদউল্লাহ।[১৮] তাঁদের মতো কর্মীদের নিয়ে তিনি লিখেছেন মনেপ্রাণে সৎ ও দায়বদ্ধ ব্যক্তিসত্তার কারণেই। জেলের অভ্যন্তরে কোনো কৃত্রিমতার বালাই নেই। তাই অফিসের সহকারী থেকে সহায়তাকারী এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন পরম আন্তরিকতায়। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে যে সাধারণ মানুষের স্বভাবজাত আন্তরিকতার গভীর সম্পর্ক বিরাজমান, সেটাও তিনি স্পষ্ট করেছেন। তাঁর লেখায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে করাচি দেখার অভিজ্ঞতা। বিষয়টির সঙ্গে যুক্তি ও গভীরতা দিয়ে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ১৯৫২ সালের মে মাসে তিনি করাচিতে গিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনাঃ

> আমি এই প্রথম করাচি দেখলাম; ভাবলাম এই আমাদের রাজধানী! বাঙালিরা কয়জন তাদের রাজধানী দেখতে সুযোগ পাবে! আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সবুজের দেশে, যেদিকে তাকানো যায় সবুজের মেলা। মরুভূমির এই পাষাণ বালু আমাদের পছন্দ হবে কেন? প্রকৃতির সাথে মানুষের মনেরও একটা সম্বন্ধ আছে। বালুর দেশের মানুষের মনও বালুর মত উড়ে বেড়ায়। আর পলিমাটির বাংলার মানুষের মন ঐ রকমই নরম, ঐ রকমই সবুজ। প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্যে আমাদের জন্ম, সৌন্দর্যই আমরা ভালবাসি।'[১৯]

হাজার মাইল দূরের দেশের মানুষের সঙ্গে সামাজিকতা, মানসিকতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্বভাবচরিত্র সবই যে ভিন্ন, সেটা বোঝাতে এর চেয়ে সংহত উপলব্ধি খুব বেশি নেই। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি গিয়েছিলেন চীন আয়োজিত শান্তি সম্মেলনে। সম্প্রতি এ-নিয়ে আমার দেখা নয়াচীন নামে পৃথক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে সেই সফরের অল্পবিস্তর বর্ণনা রয়েছে। সাধারণ মানুষ নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ কেবল বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে নয়, সব দেশ ও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তা সত্য। চীনের তৃতীয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ওই সম্মেলনে গিয়েও সাধারণ মানুষ ও সেই দেশের শ্রমিকদের জীবনমান প্রত্যক্ষ করতে তাদের জন্য নির্ধারিত আবাসিক এলাকাতে গিয়েছিলেন তিনি। সরকারের করে দেওয়া সেই বাড়িগুলো দেখতে গিয়ে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় বঙ্গবন্ধুর। সেখানকার ইন্টারপ্রেটার তাঁদের নিয়ে যান এক নববিবাহিত দম্পতির বাড়িতে। কোনো কিছু না পেয়ে তিনি নিজের হাতের আংটি খুলে এক শ্রমিকের নববিবাহিত স্ত্রীকে উপহার দিয়ে আসেন 'আমার দেশের নিয়ম কোনো নতুন বিবাহ বাড়িতে গেলে বর ও কনেকে কিছু উপহার দিতে হয়'[২০] বলে। একই সঙ্গে উদারতা, মহানুভবতা এবং নিজ দেশের রীতি-সংস্কৃতি তুলে ধরার এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে মুজিবের এই উপহার প্রদানের মধ্য দিয়ে। সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও আনন্দ দেখতে তার মতো মন খুব কম রাজনৈতিক নেতারই থাকে। যেমন চীন সফরে অনেকেই গিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব ছাড়া আর কেউ সাধারণ শ্রমিকদের জীবনযাপন কিংবা তাদের আবাসস্থল দেখতে যাননি। কারণ তিনি এমন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন, যেখানে বৈষম্য থাকবে না, সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো বঞ্চনা থাকবে না।

সাধারণ মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি তিনি গিয়েছিলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত সাংহাই শহর থেকে দূরবর্তী হ্যাংচো হ্রদে। সেখানে তিনি হ্রদের সৌন্দর্য দেখে পূর্ব বাংলার সবুজ প্রকৃতিকে খুঁজে পেয়েছিলেন, 'ছোট ছোট নৌকায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে চীন দেশের লোকেরা। ...লেকের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে দ্বীপ আছে। হ্যাংচো ও ক্যান্টন দেখলে মনে হবে যেন পূর্ব বাংলা। সবুজের মেলা চারিদিকে। ...নৌকায় চড়ে লেকের চারিদিকে ঘুরে দেখতে লাগলাম।'[২১]

একজন সত্যিকারের জননেতা সব সময় যে নিজেকে জনসাধারণের সেবক হিসেবে গণ্য করেন, তার প্রমাণ শেখ মুজিব। ছেচল্লিশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় তিনি যেমন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কলকাতার হিন্দু পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তেমনি নারায়ণগঞ্জের সংঘটিত বাঙালি-অবাঙালির সংঘর্ষ কালেও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এক্ষেত্রে কে বাঙালি আর কে অবাঙলি, তা তাঁর কাছে প্রাধান্য পায়নি। প্রাধান্য পেয়েছে 'মানুষ' পরিচয়। ১৯৫৪ সালের মে মাসে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার কিছুক্ষণ পরই জানতে পারেন নারায়ণগঞ্জের দাঙ্গা সম্পর্কে। আহত-নিহত দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। কারও জন্য অপেক্ষা না করে তিনি নিজেই আহতদের তাৎক্ষণিক সেবাশুশ্রূষা দেওয়া শুরু করেন। আহত ব্যক্তিদের মাথায় পানি ঢালেন। বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত নিরলসভাবে তিনি ৩০০ মানুষকে প্রাথমিক সেবা দিয়ে হাসপাতালে পাঠান। শুধু তা-ই নয়, হতাহতের খবরে বিক্ষুব্ধ বাঙালিকে শান্ত করতে বক্তৃতাও করেন। না হলে এর রেষ হয়তো থামানো যেত না। মর্মান্তিক সেই ঘটনায় পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছিল।[২২] নারায়ণগঞ্জ থেকে ফিরে দেখেন ঢাকার বাঙালিরা ফুঁসছে। কারণ নারায়ণগঞ্জের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল বেশি। আর যাতে কোনো গোলযোগ না ঘটে, সে-জন্য তিনি যেখানে সাধারণ মানুষের জমায়েত দেখেছেন, সেখানেই বক্তৃতা করে তাঁদের ঘরে পাঠাতে সক্ষম হন। রাত চারটা পর্যন্ত ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পথসভায় বক্তৃতা করে জনতাকে শান্ত করে তিনি ঘরে ফেরেন।[২৩] এভাবে বিভিন্ন ঘটনায় যেখানেই গোলোযোগ হয়েছে, সেটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রশাসনের কিংবা সাধারণ মানুষের অধিকার প্রশ্নে পুলিশের সঙ্গেই হোক, তিনি সংবাদ পাওয়ামাত্র তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

চার

শেখ মুজিব যেহেতু তাঁর জীবনের বেশির ভাগ মূল্যবান সময়ে কারাগারে আটক ছিলেন-কখনো বিনা বিচারে, কখনো নিরাপত্তা আইনে, কখনো রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে; তাই তাঁর কারাজীবনের (১৯৬৬-১৯৬৯ পর্বে) প্রায় প্রতিদিনই তিনি দিনলিপি লিখেছেন। সেখানে আমরা দেখি, বঙ্গবন্ধু সাধারণ কয়েদি থেকে শুরু করে বিভিন্ন লঘুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী, ভয়ংকর অপরাধী, মানসিক রোগী কিংবা বিনা বিচারে বছরের পর বছর ধরে আটক বন্দীদের সঙ্গে মিশেছেন আন্তরিকভাবে। পরিচ্ছন্নতাকর্মী থেকে শুরু করে সব শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মেশার অসাধারণ এক মানবিক গুণ ছিল তাঁর। ফলে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করার অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনি। একাকিত্বকালে কখনো তিনি সময় কাটিয়েছেন দাগি আসামির সঙ্গে, কখনো-বা পাখি, মুরগি, গাছপালা কিংবা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। কারাগারে তিনি মুরগিও পুষেছিলেন। *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'গাছপালা, পশু-পাখি, জেলখানায় যারা অবাধে বিচরণ করতে পারত তারাই ছিল একমাত্র সাথি। এক জোড়া হলুদ পাখির কথা কী সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে। তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। একটা মুরগি পালতেন, সেই মুরগিটা সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।'[২৪]

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ঐতিহাসিক ছয়দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেখানে বিষয়টি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যাত হয়। তিনি ফিরে এসে ক্রমশ ছয়দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের সারা দেশের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। জনমতও তখন ছয়দফার চেতনায় উদ্বুদ্ধ। কারণ, 'আইয়ুব খানের নির্যাতন-নিপীড়নের পটভূমিতে যখন ছয় দফা পেশ করা হয়, অতি দ্রুত এর প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমার মনে হয়, পৃথিবীতে এ এক বিরল ঘটনা। কোনো দাবির প্রতি এত দ্রুত জনসমর্থন পাওয়ার ইতিহাস আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ...বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সমগ্র পূর্ব বাংলা সফর শুরু করেন। তিনি যে জেলায় জনসভা করতেন, সেখানেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হতো, গ্রেপ্তার করা হতো। জামিন পেয়ে তিনি আবার অন্য জেলায় সভা করতেন। এভাবে পরপর তিনি আটবার গ্রেপ্তার হন মাত্র দুই মাসের মধ্যে।'[২৫] ৮ মে নারায়ণগঞ্জে জনসভা শেষে ঢাকায় ফিরলে মধ্যরাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে 'এই ছয় দফা আদায়ই হয় তাঁর রাজনৈতিক

জীবনের মূল লক্ষ্য। বারবার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে, এমনকি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় এক নম্বর আসামি করেও ক্ষমতাশীনেরা তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। তিনি মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত ছিলেন।'[২৬] তিনি কারাগারে বন্দি থাকলেও শেখ মুজিবের নামেই সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। এভাবেই একসময় তিনি সবার আস্থা অর্জন করেন এবং বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হন। বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকুন কিংবা মুক্ত অবস্থায়, সাধারণ মানুষের কল্যাণচিন্তার বাইরে কখনোই ব্যক্তি-স্বার্থের কথা চিন্তা করেননি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর দিনলিপির শুরুতেই কারাগারের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এটা একটা আলাদা জগৎ—বাইরে থেকে যেমনটি দেখা যায় বা অনুমান করা যায়, ভেতরটা আসলে তেমন নয়। তিনি লিখেছেন, 'জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে।' জেলের ভেতর কত কাজের জন্য কতসংখ্যক পরিভাষা আছে, তার ইয়ত্তা নেই। মাত্র পঞ্চান্ন বছরের ক্ষণজীবনের অধিকারী হয়ে এক যুগ কারাবরণ করেছেন, এমন নেতা বিশ্ব রাজনীতিতেই খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। অন্তত বাঙালির দেড় হাজার বছরেরও বেশি সময়ের ইতিহাসে এমন নেতৃত্বগুণসম্পন্ন কাউকে পাওয়া যায় না। তাই 'বিস্তর কারাবাস এবং পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের বিচিত্র অত্যাচারও এই আপসহীন নেতার মনোবল ভাঙতে পারেনি। জেলজীবনকেও তিনি অত্যন্ত সৃষ্টিশীলভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনাসম্ভার মূলত জেলজীবনেরই সৃষ্টি। [...] *কারাগারের রোজনামচায়* জেলের নানা পরিভাষা, রীতি-কেতা, নিয়মকানুন যে অভিনিবেশ ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন, আর কোনো কারাসাহিত্যেই তার বিবরণ মেলা ভার।'[২৭] সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিরা কারাগারের ভেতর নানা পর্যায়ের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। কাজের বিভিন্ন বিভাগকে দফা বলা হয়। তার বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর দিনলিপিতে। তেমনি একটা বিভাগের নাম 'পাগল দফা'। সেখানে কেবল পাগলদের বন্দি করে রাখা হয়। পাগল হওয়ার বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতসহ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন শেখ মুজিব।

> অনেক কয়েদি পাগল হয়ে যায়, বেশি দিন জেল জীবন সহ্য করতে পারে না বলে। অনেক কয়েদি আপনজনকে হত্যা করে পাগল হয়ে যায়। এরা ভাল না হওয়া পর্যন্ত বিচার বন্ধ থাকে। ফরিদপুরের এক পুলিশের হাওলাদার তার স্ত্রীর চরিত্রের উপর সন্দেহ করে স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করে। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তারপর সে পাগল হয়ে যায়। আবার অনেকে বাইরে পাগল হয়, আত্মীয়

> স্বজন জেলা ম্যাজিস্টেট সাহেবের অনুমতি নিয়ে জেলে পাঠাইয়া দেয়। অনেকে ভাল হয়, আবার অনেকে বেশি পাগল হয়ে যায়। দুনিয়ায় কত রকম পাগল যে আছে জেলে আসলে বোঝা যায়।[২৮]

সাধারণ মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ছিল বলেই শেখ মুজিব মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষদের কথাও অনুপুঙ্খ কারণসহ লিখেছেন। শুধু তা-ই নয়, যেহেতু জেলখানায় তাঁর বসবাসের নির্ধারিত জায়গাটি ছিল পাগল দফার কাছাকাছি, সেহেতু তিনি তাদের দৈনন্দিন আচরণ, তাদের গান গাওয়া, কারও কারও রাতভর আল্লাহ আল্লাহ করা, কারও-বা বিদঘুটে চিৎকার করা প্রভৃতি তিনি খেয়াল করতেন। অনেক রাতে ঘুমাতে পারেননি পাগলদের বিকট চিৎকারে। তবু তিনি কোনো দিন তাদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দেননি। পাগলদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন, কথাবার্তায় অনেকটা স্বাভাবিক। তেমনই এক পাগলকে নিয়ে তিনি লিখেছেনঃ 'একদিন দাঁড়াইয়া পাগলের গোসল দেখছি। এক পাগলের গোসল হয়ে গেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াইয়া আছে। আর একজন পাগলকে কয়েকজন কয়েদি ধরে এনে গোসল করাচ্ছে। যে পাগলটা আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া রোদ পোহাচ্ছে সে আমাকে বলে, কি দেখেন, এগুলি সব পাগল, খুব পাগলামি করে। আমি তো হেসেই অস্থির। নিজে যে পাগল তা ভুলে গেছে।'[২৯]

সাধারণ মানুষ সব জায়গায় বৈষম্যের শিকার। জেলখানাতেও তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। উচ্চবিত্ত বা বিত্তশালী পরিবারের লোকজন অপরাধ করে জেলে গেলেও চিকিৎসকদের কারসাজিতে রোগী হিসেবে দিনের পর দিন জেল হাসপাতালে বসবাসের সুযোগ পায়। আবার বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে দিনের পর দিন বন্দি থেকে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লেও যথাযথ চিকিৎসা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। বিষয়টি 'রাজবন্দি' শেখ মুজিবের চোখ এড়ায়নিঃ

> অনেকে ডাক্তার দেখেছি এই জেলখানায় যারা কয়েদিদের 'ডাইট' দিতে কৃপণতা করে না, অসুস্থ হলে ভাল ঔষধ দেয়। আবার অনেক ডাক্তার দেখেছি যারা কয়েদিদের কয়েদিই ভাবে, মানুষ ভাবে না, রোগ হলে ঔষধ দিতে চায় না। পকেটে করে ঔষধ বাইরে নিয়ে বিক্রি করে। আবার টাকা পেলে হাজতিদের মাসের মাস হাসপাতালে ভর্তি রাখে, ব্যারাম নাই যদিও। [...] ম্যাজিস্ট্রেট যখন জেলখানায় দেখতে যায় কয়েদিদের অবস্থা, তখন হাসপাতালে ভর্তি দেখিয়ে দেয়। এতে জামিন পেয়ে যায়।[৩০]

বঙ্গবন্ধু বহুবার কারাবন্দী হয়েছেন। বিভিন্ন মামলায় মুক্তি পেয়েছেন, আবার অন্য কোনো মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে—কখনো কখনো কারাফটক থেকেও। এককে সময় এককে কারাগারে বন্দি ছিলেন। যেহেতু সাধারণ মানুষ সম্পর্কে জানার কৌতূহল ছিল তাঁর স্বভাবজাত, তাই কোনো কোনো কারাগারে বারবার ফিরে আসায় দীর্ঘদিনের দণ্ডপ্রাপ্ত বহু আসামির সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে উঠেছিল। তেমনই একজন কয়েদি লুদু ওরফে লুৎফর রহমান; মূলত চুরির দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত। কৌতূহলবশত তার জীবনের কাহিনীও শোনেন বঙ্গবন্ধু। মূলত বঙ্গবন্ধু লুদুর জীবনের কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন: 'একটা সামান্য চোরের জীবন আমি কেন লিখছি—এ প্রশ্ন অনেকেই আমাকে করতে পারেন। আমি লিখছি এর জীবনের ঘটনা থেকে পাওয় যাবে আমাদের সমাজব্যবস্থার চিত্র। মনুষ্য চোর চরিত্র সম্বন্ধে, যারা গভীরভাবে দেখতে চেষ্টা করবেন, তারা বুঝতে পারবেন আমাদের সমাজের দুরবস্থা এবং অব্যবস্থায় পড়েই মানুষ চোর ডাকাত পকেটমার হয়। আল্লাহ কোনো মানুষকে চোর ডাকাত করে সৃষ্টি করে নাই।'[৩১]

এরপর বঙ্গবন্ধু লুদুর চোর হয়ে ওঠার ঘটনার বিশদ বর্ণনা করেন। সেই কাহিনী চলচ্চিত্রকে হার মানানোর মতো। লুদু পড়াশোনা করতে চেয়েছিল। অভিভাবকের পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। বিপথগামী ছেলেদের সঙ্গে মিশে সেও জীবনের স্বাভাবিক পথ হারিয়ে ফেলে। প্রথমে সে ছোটখাটো পকেটামারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, ধরা পড়ে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দণ্ডিত হয়। জেলে গিয়েই মূলত বড় চোর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ, এখানে সে অনেক ভয়ংকর চোরদের সঙ্গে মেশার সুযোগ যায়। এখানে 'পেশাদার চোরদের কাছ থেকে অনেক রকমের চুরির ফন্দি সে শিখে নেয় এবং দল সৃষ্টি করে। বাইরে এসে সকলে এক হয়ে চুরি করে।'[৩২] তাছাড়া মাঝেমধ্যে ধরা পড়ে জেলে এলে বিনাখরচে খাবারদাবার পাওয়া যায়-বিষয়টি মন্দ লাগে না লুদুর। তত দিনে বিভিন্ন থানা-পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে যায়। পুলিশকে নির্দিষ্ট পরিমাণে অংশীদারি করে চুরির তৎপরতা ক্রমশ বাড়ায়। একসময় পেশাদার চোরে পরিণত হয়। প্রতিরাতেই লুদুকে থানায় হাজিরা দিতে হয়। চোর-পুলিশে যে এতটা সখ্য, তা বর্ণিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ বুননকৌশলে।

> একদিন পকেট মেরে বেশ কিছু টাকা পেয়ে লুদু ভাবলো দেখা যাক দারোগা সাহেব কি করেন। বাজার থেকে বড় একটা মাছ, কিছু পটল, কিছু আলু, আর

> দশটা টাকা নিয়ে যায় দারোগা সাহেবের বাসায় [...]। লুদু দেখল, দারোগা সাহেব খুশি হয়েছেন। লুদু বলল, হুজুর সামান্য জিনিস এনেছি [...]। দারোগা সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, তবে হাওলাদার, সিপাহিদের দেওয়ার জন্য সপ্তাহে ১০ টাকা দিবি। আর চুরি করলে, তার কিছু ভাগ আমাকে দিয়ে যাবি। কারণ আমার কাছে খবর আসবে। তোকে আর রাতে ডাকা হবে না, কাজ চালাইয়া যা'। আমি রাতে চুরি করতাম, আর দিনে পকেট মারতাম। [...] এইভাবে জিআরপি পুলিশকে হাত করলাম। রোজ পকেট মারতাম। সকালে স্টেশনে, জিআরপিকে ভাগ দিতাম। আর বিকেলে পকেট মারতাম সদরঘাট, তার ভাগ দিতাম কোতওয়ালী থানায়।[৩৩]

এইভাবে চোর-পুলিশের খেলায় লুদু পাকা চোরে পরিণত হয়। সে কোনো মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে শাস্তিপ্রাপ্তিকে কষ্টকর মনে করে না। কারণ, জেলখানায় আরও 'বড়' চোরদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। ফলে তার সঙ্গী আরও বাড়ে। একপর্যায়ে বাইরে বেরিয়ে গলার ভেতর গিনি বা মোহর রাখার জন্য খোকড় করে-বিশেষ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে। কারাগার যেখানে অপরাধীদের সংশোধানাগার হওয়ার কথা, সেখানে বঙ্গবন্ধুর লেখায় তার ঠিক বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সমাজেও পুলিশ বা প্রশাসনের এমন কীর্তি গণমাধ্যমের সুবাদে হরহামেশায় সামনে আসে।

যেহেতু কারাগারে অবসরের শেষ নেই, তাই সুযোগ পেলেই বঙ্গবন্ধু তাঁর ওয়ার্ডের বাইরে বসেন, বিভিন্ন স্তরের বন্দী, যারা বিভিন্ন দায়িত্ব পেয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এক রাতে লুদুর মতো আরেক কয়েদি বঙ্গবন্ধুকে শোনায় তার ডাকাত হওয়ার গল্প। আগে সে ডাকাতি করেনি। তবু তার বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগে মামলা হয়েছিল। সেই সময় সে আত্মসমর্পণ না করে মামলা চালানোর টাকা জোগাড়ের জন্য পরপর তিনবার ডাকাতি করেছে।[৩৪] এসব কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তিনি অত্যন্ত কুশলী শিল্পীর মতো তৎকালীন সমাজ ও প্রশাসনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

বঙ্গবন্ধুর মতো একজন কর্মমুখর মানুষ জেলে কেবল শুয়ে-বসে থাকতে পারেন না। তাঁর সময় কাটত মূলত বই পড়ে, জনসাধারণের কথা ভেবে। নেতা-কর্মীদের ওপর যে পাকিস্তান সরকারের আচরণ ক্রমশ নিষ্ঠুর হচ্ছিল, সেই বিষয়টি ভেবে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। আর যখন একেবারে সাধারণ মানুষকে মিছিলের পাশ থেকে কিংবা সন্দেহবশত রাস্তা থেকে তুলে এনে কারাগারে বন্দী করে রাখে পুলিশ, তখন সবচেয়ে

বেশি বিচলিত বোধ করতেন তিনি। এ ছাড়া এতসংখ্যক মানুষকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং তাঁদের নাম মনে রাখতেন, কাউকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারেন না। সবারই 'প্রাতিস্বিক মূল্য' ছিল তাঁর কাছে। সবাইকে বঙ্গবন্ধু আপন ভাবতেন, ভালোবাসতেন।[৩৫]

১৯৬৬ সালের ৭ জুন ছিল ধর্মঘট। তার আগের দিন সাধারণ মানুষের কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তার অনুমান, পাকিস্তান সরকার চরম নির্যাতন্ পথ বেছে নেবে। কোনোভাবেই তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। আবার তাঁর বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়, দেশের মানুষ ছয়দফার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ। সুতরাং বিজয় তাঁদের সুনিশ্চিত। ৬ জুন বিকেলে যখন কোনোভাবেই সময় কাটছিল না তাঁর। তখন তিনি বাগান পরিচর্যা করে মানসিক স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করেন। এও তাঁর এক দর্শন। সাধারণ মানুষ আর বৃক্ষরাজির সঙ্গ যেন তাঁর মানসিক প্রশান্তির ভরসাস্থল। অবশ্য এ-দুইয়ের স্বভাবে বেশ সাযুজ্য আছে—দুইই সর্বংসহা। এ নিয়ে তাঁর বর্ণনাটা যেন সচিত্রঃ

> বিকালে বাগানে কাজ করতে শুরু করলাম। সময় তো আমার কাটে না। আলাপ করার লোক তো নাই। লাউয়ের দানা লাগাইয়াছিলাম, গাছ হয়েছে। ঝিংগার গাছও বেড়ে উঠছে। ফুলের বাগানটিকে নতুন সাজাইয়া গোছাইয়া করতে শুরু করেছি। বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে। আজকাল সকলেই প্রশংসা করে। নতুন জীবন পেয়েছে ফুলের গাছগুলি।[৩৬]

বাগান পরিচর্যার কথা বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি ও রূপকের মিশেলে অসাধারণ এক বর্ণনা দিয়েছেন, যা হয়ে উঠেছে জীবনের গভীর এক দর্শন। যেমন: 'আকাশটা আজ মেঘে ভরে রয়েছে। [...] বৃষ্টি পেয়ে দূর্বা ঘাসগুলি বেড়ে উঠেছে লিকলিক করে, সমস্ত মাঠটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। বাজে গাছ আমি তুলে ফেলে দিই। একটু ভাল লাগলেই ওর ভিতর দিয়ে হেঁটে বেড়াই আর যে পরগাছা চোখে পড়ে তাকেই ধ্বংস করি।'[৩৭] মেঘলা আকাশ ও অতিরিক্ত বৃষ্টির চেয়ে রৌদ্রালোকিত আকাশ মনে হয় বেশি আকৃষ্ট করত তাঁকে। এ বিষয়ে তাঁর বর্ণনা, 'আজ নাস্তা খেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কারণ বৃষ্টি হতেছে ভীষণভাবে। মনে হয় আকাশটা ফেটে গিয়েছে। ঘুমাতে পারলাম না।' রোদ, মেঘ, বৃষ্টি, ঘাস, গাছ মিলিয়ে প্রকৃতিপ্রীতির অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায় আরেক দিনের লেখায়:

> দুপুরের দিকে সূর্য মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে শুরু করছে। রৌদ্র একটু উঠবে বলে মনে হয়। বৃষ্টি আর ভাল লাগছে না। একটা উপকার হয়েছে আমার দূর্বার বাগানটার। ছোট মাঠটা সবুজ হয়ে উঠেছে। সবুজ ঘাসগুলি বাতাসের তালে তালে নাচতে থাকে। চমৎকার লাগে, যেই আসে আমার বাগানের দিকে একবার না তাকিয়ে যেতে পারে না। বাজে গাছগুলো আমি নিজেই তুলে ফেলি। আগাছাগুলিকে আমার বড় ভয়, এগুলি না তুললে আসল গাছগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩৮]

এ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর অভিজ্ঞতার এক রূঢ় বাস্তবতা তুলে ধরেন রূপককে আশ্রয় করে। তিনি আগাছাকে ভুঁইফোঁড় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'আমাদের দেশের পরগাছা রাজনীতিবিদ যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তাদের ধ্বংস করে, এবং করতে চেষ্টা করে। তাই পরগাছাকে আমার বড় ভয়।'[৩৯] একই জায়গার বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিতে যে ভিন্ন রকম হয়, তা স্পষ্ট হয়েছে আরেকটি দিনলিপিতে: 'আমার ঘরের দরজার কাছে একটা কামিনী ও একটা শেফালী গাছ। কামিনী যখন ফুল দেয় আমার ঘরটা ফুলের গন্ধে ভরে থাকে। একটু দূরেই দুইটা আম আর লেবু গাছ। বৃষ্টি পেয়ে গাছের সবুজ পাতাগুলি যেন আরও সবুজ আরও সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। [...] দেখলাম এদের প্রাণ ভরে। মনে হলো নতুন রূপ নিয়েছে। মোরগ মুরগির বাচ্চা ও কবুতরটা মাঠটা ভরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'[৪০] মাঝেমধ্যে মন খারাপ হলে তিনি নিজের করা ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াতেন। কারণ, 'বৃষ্টি হলেই কেমন যেন হয়ে যায় মনটা'[৪১] তাঁর। স্বজনদের কথা মনে পড়লে ফুলকে তাঁর সবচেয়ে কাছের বন্ধু মনে হতো। তাঁর সময় অতিবাহিত করার উপকরণ ছিল 'বই পড়া আর বাগান করা'। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ছিল বলেই বঙ্গবন্ধু এতটা মনোমুগ্ধকর বর্ণনায় জেলখানাকেও একটা অখণ্ড নৈসর্গিক পরিমণ্ডল হিসেবে পাঠকের সামনে আনতে পেরেছিলেন।

ছয়দফা উপলক্ষে ৭ জুনের ধর্মঘটে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি রিকশাওয়ালা, স্কুলছাত্র, শ্রমিক, দিনমজুর-এমন সাধারণ মানুষকেও সরকার কারারুদ্ধ করে। এমন লোককেও আটক করা হয়েছে, যার উপার্জন ঘরে না যাওয়ার কারণে হয়তো পরিবারের বাকি সদস্যরা অনাহারে রাত কাটাবে। এদের কথা ভেবে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বেদনাহত হন। ৮ জুনের দিনপঞ্জিতে তিনি লেখেন:

> শত শত লোককে গ্রেপ্তার করে আনছে। তাদের দুরবস্থা চিন্তা করতে ভয় হয়। রাস্তায় যাকে পেয়েছে তাকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। খালি গা-কাপড় নাই, একদিন একরাত পর্যন্ত থানায় বা অন্য কোথাও আটকাইয়া রেখেছিল। খাবারও দেয় নাই। গোসল নাই। সাজা দিয়ে নিয়ে এসেছে। এদের কিছু লোককে কয়েদির কাপড় পরাইয়া দিয়েছে। আমি যেখানে ছিলাম তার পার্শ্বেই পুরানা বিশ সেলে রাতে ৮২ জন ছেলেকে নিয়ে এসেছে, বয়স ১৫ বৎসরের বেশি হবে না কারও। অনেকের মাথায় আঘাত। [...] জানালা দিয়ে চিৎকার দিয়ে বললাম, "জমাদার সাহেব এদের খাবার বন্দোবস্ত করে দিবেন। বোধ হয় দুই দিন না খাওয়া।" [...] অনেকে রিকশাওয়ালাকে এনেছে, বোধ হয় বাড়িতে তাদের ছেলেমেয়ে না খেয়েই আছে। দুই মাসের সাজা দিয়েছে অনেককে।[৪২]

জেলখানা থেকেও প্রতিনিয়ত তিনি সমাজের সাধারণ মানুষের কল্যাণচিন্তা যেমন করেছেন, তেমনি উন্মোচিত করতে চেয়েছেন পাকিস্তানি দুঃশাসনের স্বরূপ। উল্লিখিত ধর্মঘটের পর সাধারণ মানুষ যেমন ছয়দফার ভিত্তিতে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তেমনি সামরিক সরকারের প্রতিনিধিরা মানুষের ওপর অত্যাচারও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ সময় আটক করার ক্ষেত্রে তারা যে বয়স বা অপরাধের কোনো বাছবিচার করেনি, তার আরও একটি প্রমাণ তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে: 'ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে নিয়ে এসেছে রাস্তা থেকে, রাতভর মা মা করে কাঁদে। একজন মহিলা, এক ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজ করে। এরই মাধ্যমে সংসার চালায়, বড় গরিব। তার ছয় বৎসরের ছেলেকে নিয়ে চলেছে সেই বাড়িতে কাজ করতে। গাড়ি থামাইয়া পুলিশ ডাক দেয়, এই ছেলে শোন। ছেলেটি এগিয়ে গেছে, তাকেও গাড়িতে উঠাইয়া নিয়েছে। মহিলা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে।'[৪৩] এসব অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী। তাই তিনি লিখেছেন:

> একটা 'দোষ' বোধ হয় আমার আছে সেটা জনগণ আমাকে ভালবাসে এবং যে ৬ দফা দাবি করেছি তাহা সমর্থন করে, তাই বোধ হয় এই অত্যাচার। দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা গেছে যে কোনো ব্যক্তি জনগণের জন্য এবং তাদের আদায়ের জন্য কোনো প্রোগ্রাম দিয়েছে, যাহা ন্যায্য দাবি বলে জনগণ মেনে নিয়েছে। অত্যাচার করে তাহা দমানো যায় না। যদি সেই ব্যক্তিকে হত্যাও করা যায় কিন্তু দাবি মরে না এবং সে দাবি আদায়ও হয়। ...জেলে ভিতর আমি মরে যেতে পারি তবে এ বিশ্বাস নিয়ে মরব। জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার একদিন আদায় করবে।[৪৪]

কারাগারের বন্দিদের সাক্ষাৎপর্বের অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি নিজে দিনের পর দিন বন্দি থাকলেও অন্য সাধারণ বন্দিরা যখন স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান আর মাত্র দুই-চার মিনিটের মধ্যেই সাক্ষাৎপর্ব শেষ করতে হয়, তখন তাদের কথা ভেবে বঙ্গবন্ধুর মন কেঁদে উঠত। তাই অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তিনি সেই দৃশ্যের বর্ণনায় লিখেছেন, 'ভিতরের দিকে কয়েদিরা বাইরের দিকে তাদের আত্মীয়-স্বজন মধ্যখানে লোহার জালের বেড়া ভাল করে চেহারাও দেখা যায় না। দুই চার মিনিটের মধ্যে কথা শেষ করতে হয়। দেখাও শেষ করতে হয়। ছেলেকে দেখতে আসে বৃদ্ধা বাবা-মা, বাবাকে দেখতে আসে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে, স্ত্রীকে দেখতে আসে স্বামী, স্বামীকে দেখতে আসে স্ত্রী। শুধু চিৎকার আর কান্না। দূরে সরে আসে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কয়েদি। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চলে যায়।'[৪৫] রাজবন্দি হিসেবে তাদের চেয়ে বেশি সময় পান। কিন্তু তাদের জন্য বঙ্গবন্ধুর 'দুঃখ হয় যখন বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী এবং ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা' কেঁদে কেঁদে বিদায় নেয়।

বঙ্গবন্ধুর মানবিকতার আরেক চিত্র দেখা যায় তাঁর কাজে নিয়োজিত কর্মীদের বেলায়। রাজবন্দি হিসেবে তাঁর খাবার সাধারণ কয়েদি, বাবুর্চি চেয়ে একটু ভিন্ন। জেলের নিয়ম, তাদের খাবার হবে ভিন্ন। কিন্তু তিনি তা মানেননি। বরং নিজের নির্ধারিত খাবার থেকে তিনি প্রতিনিয়ত তাঁদের দিতেন। এমনকি বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী যেদিন জেল গেটে আসতেন, তিনি স্বামীর জন্য নানা পদের রান্না এবং নানা রকম শুকনো খাবার দিয়ে যেতেন। সেগুলো বঙ্গবন্ধু কখনো একা খেতেন না। তাঁর মুড়ি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল জেলখানায়। তাই তাঁর ভাষ্য, 'এদের রেখে আমি খাই কি করে! আমার পক্ষে সম্ভব নহে। চা একটু বেশি খরচ হয়। আমি আমার নিজের টাকা দিয়ে কিনে আনি। জেলের নিয়ম, আমার কাছে থাকবে, আমার জন্য পাক করবে, আমার ঘর পরিষ্কার করবে, কাপড় ধুইয়ে দিবে কিন্তু আমার সাথে খাইতে পারবে না। [...] আমি না খেয়ে থাকতে রাজি, কিন্তু ওদের না দিয়ে খেতে পারব না।'[৪৬] বঙ্গবন্ধু ফলফলাদি থেকে শুরু করে বাইরে থেকে আনা কিংবা বাড়ি থেকে পাঠানো সব রকম খাবারই সাধারণ কয়েদির সঙ্গে ভাগ করে খেতেন। তাঁর এই চিন্তা সামাজিক সাম্যচিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। জেলখানার ভেতরের শ্রেণিবৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি সামন্ততন্ত্রের শোষণের চেয়েও ভয়াবহ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[৪৭] কোনো কোনো সময় অন্য কয়েদিরাও বাড়ি থেকে আনা খাবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে খেয়ে আনন্দ পেত। বিভিন্ন দিনলিপিতে এ নিয়ে তিনি লিখেছেন। একইভাবে আরেক দিনলিপিতে পাওয়া যায়:

> চা বানাতে বললাম। আজ যাকে পাওয়া যায় তাকেই চা খাওয়াতে বললাম। সাধারণ কয়েদিরা একটু চায়ের জন্য কত ব্যস্ত। তাই বলে দিয়েছি। যে-ই চা খেতে চাইবে তাকেই দিবা। আমার মেটটা একটু কৃপণ, সহজে কিছু দিতে চায় না। যদি আমার কম পড়ে যায়, বাইরের থেকে আসতে দেরি হলে অসুবিধা হবে। তাকে বলে দিয়েছি, কম পড়ে পড়ুক, আনতে দেরি হয় হউক, চাইলে দিতে হবে। কিইবা আমি দিতে পারি, এই নিষ্ঠুর কারাগারে।'[৪৮]

মানসিক ভারসাম্যহীনদের বন্দীখানার খুব কাছেই বঙ্গবন্ধুর ওয়ার্ড। তাই তিনি মাঝেমধ্যে সেই 'পাগলদফা'তেও খাবার পাঠাতেন। নিজের যাওয়ার সুযোগ ছিল না বলে জমাদারে মাধ্যমে খাবার পাঠাতেন তিনি। এক দিন তিনি নিজেই রান্না করে খাবার পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, '৪০ সেলের পাগলা গারদের ভাইদের জন্য নিজেই মুরগি পাক করে পাঠাইয়া দিলাম। আমি না খেয়ে জমাইয়া ছিলাম। আমার যাওয়ার হুকুম নাই ওদের কাছে—যদিও খুব কাছে আমি থাকি। জমাদার সাহেবকে ডেকে বললাম, আপনি দাঁড়াইয়া থেকে ওদের মধ্যে ভাগ করে দিবেন।'[৪৯]

ছয়দফা আন্দোলনের সেই উত্তাল সময়েই শেখ মুজিব খবর পান, তাঁর মা খুব অসুস্থ। তার বাবুর্চি থেকে শুরু করে সিপাহিরা তাঁকে নানা কিছু বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর মায়ের কথা ভেবে অস্থির। জেল কর্তৃপক্ষও জেনে গেছে বিষয়টি। কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎ চেয়েছেন তিনি। একদিন তিনি তাঁর নির্ধারিত কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময়ের বর্ণনাতে এসেছে দুঃখ ভুলে থাকার অভিনব প্রয়াস। তুচ্ছ প্রাণী কিংবা নিজ হাতে গড়া ফুলের বাগান, কিংবা সবজির গাছ দেখে দেখে তিনি কষ্ট ভুলে থাকতে চেয়েছেন। লেখা ও ভাবা—এই পদ্ধতিকেই হয়তো নিজের মনোবল অটল রাখার এক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি :

> [...] মায়ের অবস্থা ভাল না। বাইরে বসে দেখতে লাগলাম, একটা মোরগ একটা মুরগি আর একটা বাচ্চা মুরগি আপন মনে ঘুরে ঘুরে পোকা খেতেছে। আমার বাবুর্চি খাবার থেকে কোনোমতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া এই কয়টা মুরগি জোগাড় করেছে। ছোট ছোট যে মাঠগুলি পড়েছিল আমার ওয়ার্ডে সেগুলিতে দূর্বা ঘাস লাগাইয়া দিয়াছিলাম। এখন সমস্ত মাঠটি সবুজ হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি পেয়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে। দেখতে বড় সুন্দর হয়েছে জায়গাটি। [...] ফুলের গাছ চারিদিকে লাগাইয়াছিলাম, নতুন পাতা ছাড়তে শুরু করেছে। বড় চমৎকার লাগছে।[৫০]

এ ছাড়াও সময় পেলে আকাশ, বৃষ্টি, মেঘ, চাঁদ, পাখির সৌন্দর্য উপভোগ করেন আনমনে। নিজস্ব ভাষায় সেগুলোর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। এমনকি তাঁর পালিত মোরগের হাঁটা ভঙ্গিও তিনি প্রত্যক্ষ গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে। কোনো মুরগি অসুস্থ কি না, সেই খবরও রাখেন তিনি। এই ছোট ছোট বিষয়ও সেই সময় যে তাঁর মনে রেখাপাত করেছে এবং লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে, এতেই বোঝা যায়, কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও তাঁর দৃষ্টিগোচর হতো। যেমন: 'মুরগিটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে যেন কি কি ওষুধ খাইয়েছে বাবুর্চি। বলল, একটু ভাল। আমাকে বলল, মোরগটা জবাই দিয়ে ফেলি। বললাম, না, দরকার নাই। ও বেশ বাগান দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওর চলাফেলার ভঙ্গিমা দেখে আমার ভাল লাগে।'[৫১]

দিনপঞ্জি লিখতে লিখতে পাখি নিয়ে পাখি স্মৃতিচারণা করেছে অসাধারণ দক্ষতায়। কারণ, এই ওয়ার্ডে তিনি এর আগেও ছিলেন। সাত-আট বছর আগে যখন এই কক্ষে ছিলেন, তখন পাশের আমগাছে দুটি হলুদ পাখি বাস করত। তাদের ছোটোছুটি করার সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করতেন। কিন্তু ছয়দফা আন্দোলনে কারাগারের আসার পর তিনি পাখি দুটিকে দেখতে পাননি। তাই লিখেছেন, 'বহুদিন পর্যন্ত দু'টি হলদে পাখিকে আমি খোঁজ করছি। ১৯৫৮-১৯৫৯ সালে যখন ছিলাম এই জায়গাটিতে তখন প্রায়ই ১০টা/১১টার সময় আসত, আর আমগাছের এক শাখা হতে অন্য শাখায় ঘুরে বেড়াত। মাঝে মাঝে পোকা ধরে খেত। আজ ৪০ দিন এই জায়গায় আমি আছি, কিন্তু হলদে পাখি দু'টি আসল না। [...] ওদের জন্য দুঃখ হলো। যখন ১৬ মাস এই ঘরটিতে একাকী থাকতাম তখন রোজই সকাল বেলা বন্ধ করে বাইরে যেয়ে বসতাম ওদের দেখার জন্য। মনে হলো ওরা আমার ওপর অভিমান করে চলে গেছে।'[৫২] কয়েক মাস পর একই ধরনের একটু ছোট আকারের হলদে পাখি এখানে আসা শুরু করে। তখন তিনি ভাবেন, হয়তো ওদেরই বংশধর ওরা। গাছের ডাল ফাঁকে তাকিয়ে তিনি দেখেন তাদের।

একলা জীবনে পাখি, বাগান, গাছ যে তার কত প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠেছিল, তার চমৎকার বর্ণনা যাওয়া একটি দিনলিপিতে। বিশেষ করে, কবুতরের জীবনযাপন এবং অনাগত বাচ্চাদের জন্য ওদের কীর্তিকলাপের অদ্ভুত সুন্দর বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে এভাবে:

> আমাকে একেবারে একলা রেখেছে। গাছপালা, হলদে পাখি, চড়ুই পাখি আর কাকই তো আমার বন্ধু এই নির্জন প্রকোষ্ঠে। যে কয়েকটা কবুতর আমার বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে তারা এখানে বাচ্চা দেয়। কাউকেও আমি ওদের ধরতে

> দেই না। সিপাহি জমাদার সাহেবরাও ওদের কিছু বলে না। আর বাচ্চাদেরও ধরে নিয়ে যায় না। বড় হয়ে উড়ে যায়। কিছুদিন ওদের মা-বাবা মুখ দিয়ে খাওয়ায়। তারপর যখন আপন পায়ে উপর দাঁড়াতে শিখে এবং মা-পায়রার নতুন ডিম দেওয়ার সময় হয় তখন ওই বাচ্চাদের মেরে তাড়াইয়া দেয়। আমি অবাক হয়ে কীর্তিকলাপ দেখি।[৫৩]

সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আত্মত্যাগ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ব্যতিক্রমী ও বিচিত্র। প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে এই অঞ্চলের মানুষ ভাগ্যকে দোষারোপ করে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার সদিচ্ছা থাকলে যে তা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব, বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি তার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। এই দেশের সাধারণ মানুষ অসচেতন ও অত্যন্ত অজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে থাকেন, সেই বাস্তবতা ও অন্ধবিশ্বাসের প্রসঙ্গ অভিনব কৌশলে তিনি তুলে এনেছেন। এ নিয়েও তিনি ব্যঙ্গও করেছেন। ছেষট্টির জুন মাসে পূর্ববাংলায় ভয়াবহ বন্যায় অনেক ফসলহানি হয়েছে। কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল। মূলত সেই চিন্তা থেকেই তিনি বলেন:

> এ দেশের হতভাগা লোকগুলি খোদাকে দোষ দিয়ে চুপ করে থাকে। ফসল নষ্ট হয়েছে, বলে আল্লা দেয় নাই, না খেয়ে আছে, বলে কিসমতে নাই। ছেলেমেয়ে বিনা-চিকিৎসায় মারা যায়, বলে সময় হয়ে গেছে বাঁচবে কেমন করে! বন্যা তো বন্ধ করা যায়। দুনিয়ার বহু দেশে করেছে। চীন দেশে বৎসরে বৎসরে লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল নষ্ট হতো। সে বন্যা তারা বন্ধ করে দিয়েছে। [...] শোষক শ্রেণী এদের সমস্ত সম্পদ শোষণ করে নিয়ে এদের পথের ভিখারি করে, না খাওয়াইয়া মারিতেছে। না খেতে খেতে শুকায়ে মরছে, শেষ পর্যন্ত না খাওয়ার ফলে বা অখাদ্য খাওয়ার ফলে কোনো একটি ব্যারাম হয়ে মরছে, বলে কিনা আল্লা ডাক দিয়েছে আর রাখবে কে?[৫৪]

সাধারণ মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অগাধ ভালোবাসা ছিল। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কল্যাণভাবনা বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক রাজনৈতিক দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। তাই কারাপ্রকোষ্ঠে থেকেও তিনি যেমন তাদের ভুল পারেন না, তেমনি একাত্তরের সাতই মার্চের ভাষণদানকালেও ভোলেননি। বরং সবকিছুকে অনির্দিষ্টকালের বন্ধের আওতাভুক্ত করলেও শ্রমিক যেমন তার বেতন পান, সে-ব্যাপারে তাঁর ছিল স্পষ্ট নির্দেশনা: 'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের বন্ধ থাকবে।

গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে।'[৫৫]

তাদের কষ্টলাঘবের জন্য বঙ্গবন্ধুর অবিরাম ভাবনা ও পরিকল্পনা ছিল। পাশাপাশি ছিল রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি-বিষয়ক কঠোর সমালোচনা, তা দিনপঞ্জির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ইতিহাসের অনালোকিত অনেক সত্যই বঙ্গবন্ধু তাঁর দিনলিপিতে উন্মোচন করে গেছেন, যা এর আগে কখনো কারও পক্ষে জানার সুযোগ ছিল না। যত নিষ্ঠুর পরিস্থিতিই মোকাবিলা করুন না কেন, তিনি সারাক্ষণ সাধারণ মানুষের কল্যাণচিন্তায় আবিষ্ট ছিলেন। বিষয়টি যেমন তাঁর দুটি গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বিষয়, তেমনি প্রকৃতি, বাগান পরিচর্যা ও পশুপাখির প্রতি তাঁর আলাদা আবেগ ছিল, যা সেই 'পাষাণ-দেয়ালের' মধ্যে থেকেও তাঁকে কিছুটা স্বস্তি দিত। কিন্তু দালাল ও অসৎ চরিত্রের রাজনীতিকদের নিয়ে তাঁর শঙ্কারও শেষ ছিল না। তাই খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি লিখেছেন, 'এই সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ এত উর্বর; এখানে সোনার ফসল হয়, আবার পরগাছা আর আগাছাও বেশি জন্মে। জানি না বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে এই সোনার দেশকে বাঁচানো যাবে কিনা!'[৫৬] সেই বিশ্বাসঘাতকদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও দেশটা স্বাধীন হয়েছিল ১৯৭১ সালে। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সেই বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে বঙ্গবন্ধু নিজেকে বাঁচাতে পারেননি।

সহজ, সাবলীল, নিয়ন্ত্রিত ভাষায় সরল ও সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু উপর্যুক্ত দুটি গ্রন্থেই রাজনীতিবিদ ও লেখক হিসেবে নতুন প্রজন্মের সামনে বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়, 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে কিন্তু লেখক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বড় কৃতিত্ব সম্ভবত এখানে যে নিজের অভিজ্ঞতাগুলো তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন সহজ ভাষায়, অতিরঞ্জনের অশ্রয় না নিয়ে। বোধ করি এটা বড় লেখকেরই গুণ।'[৫৭] কেবল বড় লেখকই নন; সাধারণ মানুষ, প্রকৃতি, পশুপাখির প্রতি স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধুকে এক অনন্য মহৎ-হৃদয় ব্যক্তি হিসেবে নতুন প্রজন্মের সামনে নতুনমাত্রায় প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। লেখক হিসেবে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের অনেকাংশই প্রকাশ করতে পেরেছেন। তিনি যে হয়ে উঠেছিলেন তাঁর স্বপ্নের সমান বিশাল, গ্রন্থ দুটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রোথিত আত্মবিশ্বাসী শব্দসমূহের প্রয়োগে তার সংকেত ও স্বরূপই উদ্ভাসিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, 'বঙ্গবন্ধু' (ঢাকা: প্রথম আলো, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬)
২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, 'ভূমিকা': শেখ হাসিনা, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃষ্ঠা: xii
৩. শেখ মুজিবুর রহমান, পৃ. ৯
৪. পূর্বোক্ত ১৭
৫. পূর্বোক্ত ১৮
৬. পূর্বোক্ত
৭. পূর্বোক্ত ৩৫
৮. পূর্বোক্ত
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮
১০. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাঙলাদেশ', মনসুর মুসা সম্পাদিত *বাঙলাদেশ*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৩) পৃ. ৩৮
১১. সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫
১২. পূর্বোক্ত ৫৭
১৩. পূর্বোক্ত ৫৯
১৪. পূর্বোক্ত ১০৩-১০৪
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্রসমগ্র*, (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০১১), পৃ. ৬৫
১৬. শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত ১০৬
১৭. পূর্বোক্ত ২০৯
১৮. এই আইনজীবী প্রতিদিন অফিস শেষে আওয়ামী লীগ অফিসের দাপ্তরিক কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন সবার বিশ্বস্ত। পরে তাঁকে অফিসের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত করা হয়।
১৯. শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত ২১৪
২০. পূর্বোক্ত ২৩২-২৩৩
২১. পূর্বোক্ত ২৩৩
২২. পূর্বোক্ত ২৬৪
২৩. পূর্বোক্ত ২৬৬
২৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, 'ভূমিকা': শেখ হাসিনা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭), পৃ. ১৪
২৫. শেখ হাসিনা, "ছয় দফা বাঙালির 'স্বাধীনতার সনদ'", (ঢাকা: প্রথম আলো, ৭ জুন ২০২০)
২৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত

২৭. শামসুজ্জামান খান, "লেখক বঙ্গবন্ধু", (ঢাকা: প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০১৮)
২৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পূর্বোক্ত, ৩৩
২৯. পূর্বোক্ত, ৩৪
৩০. পূর্বোক্ত, ৩৭
৩১. পূর্বোক্ত, ৪৮
৩২. পূর্বোক্ত, ৫০
৩৩. পূর্বোক্ত, ৫০-৫১
৩৪. পূর্বোক্ত, ৯০
৩৫. আনিসুজ্জামান, "যিনি বাঙালিকে ভালোবেসেছিলেন", (ঢাকা: সমকাল, ১৫ আগস্ট ২০১৬)
৩৬. শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, ৬৮-৬৯
৩৭. পূর্বোক্ত, ১১২
৩৮. পূর্বোক্ত, ১১৭
৩৯. পূর্বোক্ত
৪০. পূর্বোক্ত, ১১৯
৪১. পূর্বোক্ত, ১০৯
৪২. পূর্বোক্ত, ৭৪ ও ৭৬
৪৩. পূর্বোক্ত, ৯৪
৪৪. পূর্বোক্ত, ২৩৯
৪৫. পূর্বোক্ত, ১৯৭
৪৬. পূর্বোক্ত, ১১৬
৪৭. পূর্বোক্ত, ১৮৮
৪৮. পূর্বোক্ত, ১১৮
৪৯. পূর্বোক্ত, ২০৪
৫০. পূর্বোক্ত, ৮০
৫১. পূর্বোক্ত, ৮৮
৫২. পূর্বোক্ত, ১০১-১০২
৫৩. পূর্বোক্ত, ২১৯
৫৪. পূর্বোক্ত, ১০৯-১১০
৫৫. সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পঞ্চম তফসিল, পৃ. ১৫২, অক্টোবর ২০১১
৫৬. শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, ১১২
৫৭. শামসুজ্জামান খান, পূর্বোক্ত

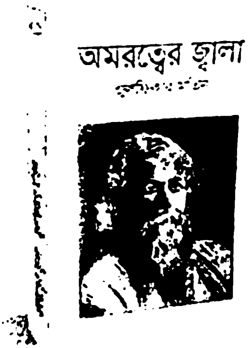

অমরত্বের জ্বালা
জুলফিকার মতিন
প্রকাশক: বাংলাপ্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদের স্কেচ: চৌধুরী ওসমান
দাম: ৩০০ টাকা

আমি তোমাদের লোক

মনিরা কায়েস*

এ এক অভূতপূর্ব পরিভ্রমণ।

যে পরিভ্রমণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সঙ্গী। ফাল্গুনের ঐ জ্যোৎস্নাময় ভাঁটফুলের তীব্র সুগন্ধময় রাত্রিটা তখন অবিকল মার্ক সাগালের তৈলচিত্র হয়ে ঝুলছিল চোখের সামনে। বাতাসে ভেসে আসছিল জীবনানন্দীয় কবিতা-চাতাল থেকে উঠে আসা মরখুটে ঘোড়ার হ্রেষারব। দূরে কোথাও কি যাত্রাপালা হচ্ছে,

* অধ্যাপক | বাংলা বিভাগ | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | রাজশাহী, বাংলাদেশ
ই-মেইল: moniraqais@gmail.com

ঐ যে ক্ল্যারিওনেটের শব্দ। বাসন্তী পূজা বোধহয় এসময় হয়টয়। ধূপখোলা মাঠে প্যাণ্ডেল বাঁধা হচ্ছিল চোখে পড়েছে। এবার কোন দল আসবে 'মা গঙ্গা' নাকি 'সোনার বাংলা অপেরা'? এরই মধ্যে শুনতে পাচ্ছি ভাঙা গলায় গান হচ্ছে, জোছনা করেছে আড়ি, আসে না আমার বাড়ি... এই জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্তিরে এমন গানে দর্শক জাগবে তো? বরং ভেবে নেয়া যাক স্মৃতি থেকে উসকে আসা অমলেন্দু-জ্যোৎস্না বিশ্বাসের সেই আকুতিভরা অভিনয়...অমলেন্দু সেজেছেন রবীন্দ্রনাথ, জ্যোৎস্না কাদম্বিনী দেবী (এই ঘোর জ্যোৎস্নায় বড় কষ্ট ঠাকুরপো... বড় কষ্ট) যাত্রাপালায় এমনটা বিরল দৃষ্টান্ত তবে এর চেয়েও ঢের ঢের বছর আগের এক দৃশ্য এসে কড়া নাড়ে বোধে। সেই দৃশ্যেও জ্যোৎস্না ছিল, বৈশাখের আলোভরা এক রাতে রবিশঙ্কর এসেছিলেন উদয়শঙ্করের কাছে, বলেছিলেন, দাদা চলুন দু'ভাই মিলে একটা কাজ করা যাক রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে। আপনি যদি ব্যালে করেন তো I would have to do music for it... আর এভাবেই তৈরি হয়েছিল 'সামান্য ক্ষতি'র ডান্স ফর্ম। কিন্তু এতে করুণা কে সেজেছিল, ফরাসি সুরভিত সিমকি নাকি রুশ ব্যালেরিনা আনা পাভলোভা... যদিও করুণা চরিত্রে আমাদের অমলাশঙ্করই মানানসই হবার কথা। আর এরও ঢের ঢের বছর পর আরেক চন্দ্রালোকিত রাতে শান্তিনিকেতনে শিবনারায়ণ রায়ের বাড়ির তুমুল আড্ডার চা-পর্ব সেরে পথে নামলে নরেশ গুহ বললেন, আমার ছাদের বাগানে চন্দ্রমল্লিকার মেলা বসে আছে, তোমরা দেখবে না? স্নোবলের জাতটা কিন্তু রথীন্দ্রনাথের আনা জাপান থেকে। ওটারই বংশপরম্পরা চলে আসছে আজ অব্দি। মনে আছে ছাদের ঐ চন্দ্রমল্লিকার বাহারের ঘোরে ঐ রাতে ঘুম আসছিল না। ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর কথা মনে পড়ছিল। আর্জেন্টিনায় বাসকালে রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিলে প্রতি সকালে তাজা ফুল সাজিয়ে দিতেন ভিকতোরিয়া, সেই ফুলের বিন্যাসে চন্দ্রমল্লিকাই সেরা হয়ে ফুটে থাকতো একথা শঙ্খ ঘোষে ছিল নাকি কেতকী কুশারী ডাইসনে! আসলে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমাদের অনন্ত কৌতূহল। সেই কৌতূহল মেটাতে কখনও আচার্য ক্ষুদিরাম দাসের দ্বারস্থ হয়েছি কখনো বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব কখনো আনিসুজ্জামান, হায়াত মামুদের রচনায় বুঁদ হয়ে থেকেছি। আর মহামহিম শঙ্খ ঘোষের ছায়াতো ছিলই মাথার ওপর। এছাড়া মতিহার সবুজে বেড়ে ওঠার সুবাদে কত কত নক্ষত্র মানবের সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথকে অন্যভাবে

জানবার সুযোগ হয়েছে আমাদের। পরম শ্রদ্ধেয় মযহারুল ইসলাম কী শহীদ হবিবুর রহমান কী প্রফেসর মফিজ আহমেদের পরিবার রবীন্দ্রচর্চায় অনলস ছিলেন। স্বল্পবাস হলেও প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অসিত রায় চৌধুরী এমনকি মাঝে কর্মসূত্রে কিছুদিন এখানে ছিলেন খান সারওয়ার মুরশিদও—ছড়িয়েছিলেন প্রজ্ঞাদীপ্ত রাবীন্দ্রিক সুধা। এঁদের পাশাপাশি আরও কত নাম—প্রফেসর আবদুল খালেক, আতাউর রহমান, মজিরউদ্দিন মিয়া, আবুবকর সিদ্দিক... আর নাজিম মাহমুদ তো নিজেই এক প্রতিষ্ঠান ছিলেন। ররীন্দ্রচর্চার যোগ্য প্ল্যাটফর্ম। পাশে ছিলেন কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, আলী আনোয়ার, শহিদুল ইসলাম, সনৎকুমার সাহা, গোলাম মুরশিদ, সুব্রত মজুমদার, শিশির ভট্টাচার্য্য... রবীন্দ্র আবহাওয়া তৈরিতে যাঁদের ভূমিকা অপরিসীম। এরই মধ্যে শুনতে পাচ্ছি বাফা থেকে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য নিয়ে আসছেন কাজল ইব্রাহীমেরা। আমাদের না ওঠা কড়কড়ে নতুন ডব্লু-৬৭/এ ফ্ল্যাট বাড়িটায় উঠেছেন দলবলে। ঘরের দেয়ালে অনেকদিন অব্দি তাদের নকশাদার টিপ আঁটকানো ছিল। খবর পাচ্ছি আঁদ্রে মালরো আসছেন বলে সকাল সকাল যেতে হবে জুবেরি ভবনের দিকে। বিশাল এক ফুলের মালা তৈরি হয়েছে তাঁর জন্য। হেলিকপ্টার থেকে নামতেই তাঁকে আমরা মানে ছোটরা সাদরে বরণ করে নিলাম। শুনলাম এখানের অনুষ্ঠান শেষে তিনি পতিসর না শিলাইদহ না সাজাদপুর যাবেন রবীন্দ্র স্মৃতি স্পর্শ করতে।

এর আরও পরে এক সন্ধ্যায় আমরা কাতর হয়েছিলাম ছিন্নভিন্ন হয়েছিলাম উদ্বেল হয়েছিলাম আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের এস্রাজ বাদনের করুণ সৌন্দর্যে। গায়কীতে তাঁর পাশে সন্‌জীদা খাতুন না ফাহমিদা খাতুন ছিলেন মনে নেই তবে এটা মনে আছে সেদিন ঐ সুরের মূর্ছনায় পূর্ণিমার চাঁদ নেমে এসেছিল জুবেরির হল রুমে। হাওয়া বইছিল শনশন, একযোগে ফুটে উঠেছিল জুঁই কী বেলী কী রজনীগন্ধা কী হাসনাহেনা। আমরা একে অপরকে চিনতে পারছিলাম না, সব কেমন অচেনা ঠেকছিল এস্রাজের করুণতায়। কে আমি কোথায় আমি কেন আমি? এই কী তবে রবীন্দ্রমায়া, রাবীন্দ্রিক ঘোর?

সব্যসাচী লেখক জুলফিকার মতিন মতিহারেরই একজন। বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক; প্রগতিশীল মানবিক। মনে পড়ে বাংলা সাহিত্যে পড়বার সুবাদে তাঁর অসাধারণ মেধাস্পর্শে উজ্জ্বল ক্লাসগুলোর কথা; তিরিশোত্তর কাব্য পড়ানোর সময় বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতির তাবৎ অলিগলি আমাদের এমনভাবে ঘুরিয়ে আনতেন যে ক্লাস শেষেও তার রেশ থেকে যেত, অনায়াসেই মার্কস-এঙ্গেলস কী ফ্রয়েড-লেনিন আমার সঙ্গী হতেন, আলভিজিয়ার পথ ধরে ফিরতে ফিরতে গেয়ে উঠতাম প্রুফকের গান কী বুদ্ধদেবের 'আমার প্রাণের কাছে গানের মত কঙ্কা কঙ্কা কঙ্কাবতী'...। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখন তাঁর বোধে কড়া নেড়েছিলেন? *অমরত্বের জ্বালা* গ্রন্থে নিজেই জানিয়েছেন, আর সব বাঙালির মত স্কুলের প্রথম পাঠে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। জসীমউদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা তো ছিলই সেই পাঠ্যবইয়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' কবিতায় বোনা প্রকৃতি যা কিনা তাঁর নিজেরও অতি চেনা ঐ মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, তাল দিঘিতে কেয়া পাতার নৌকো ভাসানো কী রাখাল ছেলের বাঁশির সুর সবই তাকে নতুন করে ছন্দ-তালে বেঁধে দিয়েছিল। এমনকি রোজ সন্ধ্যায় যে মা তাঁকে লণ্ঠনের টিমটিম আলোয় মাদুর পেতে পড়াতে বসে বিষাদসিন্ধুর বুক ভার করা গল্প সুর করে শুনিয়ে যেতেন, একদিন হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' যা কিনা ট্রেন বাহিত ডাকে এ বাড়িতে পৌঁছেছিল তাঁর কবি স্বামীর নামে, সেই 'শিশু' থেকে কবিতা পড়তে থাকলে কিশোর মতিন বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন সেই অনাস্বাদিত শব্দ-স্পর্শে। মা কাছে আছেন, তাঁর শাদা খোলের শাড়িতে স্নেহ গন্ধ ছড়ানো অথচ তাঁর মনে হতে থাকে কোথাও কেউ নেই, কেবল সামনে পড়ে আছে ধূ ধূ উঠোনের প্রান্তর... এক চিলতে চাঁদের আলোয় ছটফট করতে থাকে তার ভেতর মহল, কে আমি কোথায় আমি কেন আমি? অথচ ক্লাসের দু'একজন সহপাঠী রবীন্দ্রনাথকে তখন হিন্দু কবি বলে অভিহিত করতো, কোনও কোনও শিক্ষক তাঁর চেয়ে কবি নজরুল কত বড় কবি এ বিষয়ক তর্ক জুড়ে দিতেন পাঠ-কক্ষেই, পাকিস্তানের তমুদ্দুন রক্ষার জন্য কবি ইকবাল প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ নন এই প্রচারও চলতো জোরে-সোরে কিন্তু মতিনের ওসব শোনার সময় নেই, নানাবাড়ি থেকে ডাক এসেছে, খালাতো ভাই কুদ্দুস এবং মজিদ ভাই রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী করবে, সেখানে কবিতা আবৃত্তি করতে হবে তাকে। সন্ধেয় অনুষ্ঠান। 'বেড়া'র বিপিনবিহারী হাইস্কুলের কম্পাউন্ড লাগোয়া এক বাড়ির চৌচালা টিনের ঘর। খাট পাতা। এক

পাশে ক'টা চেয়ার, মাঝখানে বড় এক টেবিল। তাতে লাল কাপড়ে বাঁধানো একটা বই। পাশে কাঠের ফ্রেমে রবীন্দ্রনাথের ছবি। দাড়িঅলা বুড়ো। চোখদুটোয় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। যেন সব দেখতে পাচ্ছেন। মতিনের গলা কী একটু কেঁপে উঠেছিল সেই দৃষ্টির সামনে! যদিও তদ্দিনে একটু একটু করে বালকোচিত পালক খসে পড়ছে তার। হাইস্কুলে উঠে যাচ্ছেন। হাতে লেখা পত্রিকায় লেখার হাত মকসো হচ্ছে। শুনতে পেলাম পাড়ার বাচ্চুদা যে এখানকার নাটক-থেটারে মহিলা চরিত্রে পার্ট করতো সে কোলকাতার কোন কলেজে পড়তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি শুনিয়ে সবাইকে মাত করে দিয়েছে। শুনে মনে হলো আমিও পড়বো ঐ কবিতা। বাবার ঘর ভর্তি বই। *সঞ্চয়িতা* সবসময় টেবিল আলো করে অধিষ্ঠিত। আমি দেবতার গ্রাসে প্রবেশ করলাম। ঠিক প্রবেশ করলাম না পড়তে পড়তে আঁটকে গেলাম এক মোহনীয় মায়াজালে। কী কাহিনী কী শব্দ ব্যবহারের ভেতর দিয়ে ধ্বনির অনুরণন—আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখলো। ঘুমন্ত আমি যেন জেগে উঠলাম। টেবিলের ওপর বাবার লেখার খাতায় শেষ না করা এক কবিতার লাইন চোখে ভাসলো: হাওয়ার নির্জন সুরে অনাময় চাঁদের কিরণ... কিন্তু আমাকে ঐ সময় রবীন্দ্রনাথই আকৃষ্ট করেছিলেন, 'দুই বিঘা জমি'র উপেনের জমি হারানোর বেদনার চে বিশ্বনিখিল লিখে দেয়ার ব্যাপারটায় বেশি আলোড়িত হয়েছিলাম। দুই বিঘা জমির মায়ায় না জড়িয়ে সে সাধুর শিষ্য হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, সে পথ আমাকেও টানে। অজানা-অচেনা পথ। যে পথে কেউ কখনো হাঁটে নাই... বুকের ভেতর ফের শিরশিরানো অনুভূতি... কে আমি কোথায় আমি কেন আমি? উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়িতে একটা পুরনো গ্রামোফোন ছিল। চোঙ্গা লাগানো। হাতল ঘুরিয়ে দম দিয়ে পিন লাগিয়ে শুনতে হতো গান। আমরা বলতাম কলের গান। আমার শাহজাদা কাকা নিজে গান করতেন। বেহালা বাজাতেন, তার দায়িত্বেই ছিল ঐ গ্রামোফোন। মাঝে মধ্যে শোনা হতো। আব্বাসউদ্দিনই বেশি। তবে রবীন্দ্র সংগীতেরও কিছু রেকর্ড ছিল। জ্যোৎস্নারাতে যখন নিমফুলের গন্ধে গোটা সলপের হাওয়া ভারি হয়ে যেত তখন শাহজাদা কাকায় কলের গান জুড়ে দিতেন, আমি কান পেতে রই কী বঁধু কোন আলো লাগলো চোখে কী যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন... আমি ঘুম ঘুম চোখে উঠে দাঁড়াতাম, জানালার বাইরে জ্যোৎস্নার মসলিন উড়ছে। মন মোর হংসবলাকা যায় উড়ে, কচিত কচিত চকিত তড়িৎ আলোকে... আমার কিশোর মনের উথালপাতাল জগৎ কীভাবে টের পেয়েছিলেন

রবীন্দ্রনাথ? ভেবে বিস্মিত হই। এরই মধ্যে নতুন কাকীমা এসেছেন এ বাড়িতে, মেহেরপুরের ডাক্তার পরিবারের মেয়ে। সংস্কৃতি-চর্চায় এই পরিবার যথেষ্ট এগিয়ে। নতুন কাকীমার বোনেরা নাচে-গানে পারদর্শী। একজন আমার ক্লাসের। জোছন খালা। সে নাচলো রবীন্দ্রনাথের গানে। সে নাচ অনুশীলন পর্বের কিন্তু গানের কথাগুলো আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল: যদি মাতে মহাকাল উদ্দাম জটাজাল/ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত ঢেউ ওঠে উত্তাল/হয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিও তাল... এ যেন এক গতির স্রোত, সেই স্রোতে ভাসতে ভাসতে বুঝতে পারছি ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েও জীবনের এই নিঃসঙ্গ জয়গান কবি মানসের প্রচণ্ড শক্তিকেই নির্দেশ করে। কবি-কল্পনার এমন মুক্তপক্ষ বিচরণ আমাদের সীমাবদ্ধ চিন্তার জগতে কতটা প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে তা-ও বোঝা যাচ্ছে। এবং এই বুঝে উঠতে পারার যে আনন্দ সেই আনন্দ নিয়েই লেখকের বড় হতে থাকা। আর বড় হতে হতেই রবীন্দ্রবিশ্বের বিপুল আয়োজনে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রবেশ। লক্ষ করছেন নিজেকে তৈরি করার জন্য রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার বিকল্প নেই, চিত্তের প্রসারতা ও মস্তিষ্কের মুক্তি—এ দুটি ছাড়া মানুষের বড় হবার পথ রুদ্ধ। এর সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার পরিচর্যাও জরুরি। তবেই সেই মুক্তি সম্ভব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে শিরোধার্য করে ক'জনই বা সেই মুক্তি খুঁজেছেন? লেখক আরো লক্ষ্য করেছেন: বৌদ্ধ ধর্ম, উপনিষদ, ইসলামি সুফিবাদসহ নানা উপকরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস তৈরি হয়েছে, ইউরোপীয় মানবতাবাদের বিষয়টিও প্রত্যক্ষই ছিল তাঁর কালে আর এসবের ভেতর দিয়ে তিনি আসলে মানুষের একটা আদর্শায়িত রূপ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের যে ধূপ তিনি জ্বেলেছেন সেখানে মানুষই ছিল তাঁর আরাধ্য। মানুষকেই তিনি করেছিলেন ধ্যেয়। আর এজন্যেই দেবতা ও মানুষের ভেদাভেদ মুছে গিয়েছিল তাঁর কাছে। অথচ সেই মানুষ (বাঙালি বলাটাই এখানে যুক্তিসঙ্গত) তাকে বারবার ভুল বুঝেছে, বারবার তার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে এমনকি শাসকবর্গের কাছ থেকেও রেহাই নেই রবীন্দ্রনাথ বারবার শাসকবর্গের রক্তচক্ষুর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। *অমরত্বের জ্বালায়* লেখকের স্পষ্টত উচ্চারণ:

(১) মার্কসবাদের ডিক্টেটরশীপ অব দি প্রোলেটারিয়েট, ডায়ালেকটিক ম্যাটেরিয়লিজম, সারপ্লাস ভ্যালু ইত্যাদি আইডিয়া হিসেবে নতুন এবং চমকপ্রদ। আর শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রেণীশত্রুর তো কথাই নাই, রীতিমত উত্তেজক, সুতরাং

মাঠময়দানে তা নিয়ে হাতপা ছোঁড়ার সুযোগ যখন কম, তখন বুদ্ধিবৃত্তির জগতে শিল্প-সাহিত্য-নান্দনিকতার বলয়ে একটা ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করাও তো কম কাজের কথা নয়! এ জন্য রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাদের কাছে উপযুক্ত ব্যক্তি। তাদের কাছে তিনি হয়ে পড়েছিলেন প্রতিক্রিয়াশীলতার ধ্বজাধারী [...] কবিতা যেখানে মানুষের অভাবের কথা বলবে, দারিদ্রের চিত্র তুলে ধরবে, শোষকদের হাড়গুঁড়ো করে দিয়ে তাদের শাস্তি বিধান করবে, সংগ্রামের বাণী ঘরে ঘরে পৌছে দেবে, বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালাবে—সেখানে রবীন্দ্রনাথ যেন একটা নতজানু চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব শেখেননি, যাবতীয় বুর্জোয়া জীবনের আবর্জনা হলো তাঁর কবিতার অলঙ্কার। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা বোঝার অবকাশ তাঁর কোথায়?

(২) ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ভেতর দিয়ে ব্রিটিশ শাসকেরা দৃশ্যত ডিভাইড অ্যাণ্ড রুলের যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে, তাতে যে ফলটি ধরে তা হলো পাকিস্তান নামক একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। এটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পাকিস্তানী আদর্শে বাংলা সাহিত্য রচনার যে এলান আসে, সেখানে রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যাখ্যান করার মনোভাবটাকেই করে তোলা হয় মুখ্য। বাধা আসে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশত বার্ষিকী উদযাপনে। এ পর্যায়ে সরকারী প্রচার মাধ্যমে রেডিওতে নিষিদ্ধ করা হয় রবীন্দ্রসংগীত। এবং ১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও রবীন্দ্রচর্চা যে একেবারেই স্বচ্ছন্দ হয়েছে তা ঠিক মনে হয় না।

(৩) আরেকটি বিষয়, যা নিয়ে অনেকেই খড়গহস্ত হয়ে পড়েন সেটিও বোধ করি আলোচিত হতে পারে। একবার রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এ ঘটনাটি ঘটেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯) শুরুর প্রায় এক যুগ আগে। ওরকম একজন ফ্যাসিস্ট শাসকের সঙ্গে দহরম-মহরম করে রবীন্দ্রনাথ মহা অন্যায় করেছেন এই অপবাদ এসে চেপেছে তাঁর ঘাড়ে।

(৪) আবার এটাও দেখা যায় নানাবিধ অভিযোগ-অনুযোগের পাশাপাশি রবীন্দ্র প্রসঙ্গ নিয়ে সুড়সুড়ি দেয়ার কাজটিও অনেকে যেন কর্তব্যজ্ঞানেই নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেছেন। মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে আর কতটুকু লেখা হয়েছে কিন্তু বৌদি কাদম্বিনী দেবী কিংবা আনা তরখর কিংবা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো—এদের সম্পর্কে উৎসাহের কোনো শেষ নেই [...] রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষদের জীবনে এ রকম এক্সট্রা ম্যারিটাল সম্পর্ক নিয়ে লেখালেখি করে চমক সৃষ্টি করাটা তো রীতিমত প্রতিযোগিতারও বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৫) প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে পালাবদলের কথাটা বেশ জোরেসোরেই বলা হয়। আর এই পালাবদলের প্রথম এবং প্রধান বলীই হলো রবীন্দ্রনাথ তাঁর গড়া কবিতার জগৎকে ভেঙে, তাঁর কবিতার আইডিয়াগুলোকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দিয়ে এককথায় তাঁকে অস্বীকার করে নতুন কবিরা কবিতার নতুন ধারাপাত সৃষ্টি করলেন। এই নতুন ধারাপাতে—এক কথায় বিশ্বাসের জগৎটাই গেল ধূসর হয়ে। ভালোবাসার স্থান দখল করল ঘৃণা। যাবতীয় নোংরামী, কদর্যতা আর কলুষকেই পরিগণনা করা হলো বাস্তবতার একমাত্র মাপকাঠি রূপে। পুণ্য নয়, পাপই গৃহীত হলো আরাধ্য বস্তু হিসেবে।

এবং লেখক এসব অভিযোগের ফিরিস্তিই শুধু দেননি সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা খণ্ডনও করেছেন, বলেছেন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এতসব প্রতিকূলতার মধ্যে—বিরুদ্ধতার মধ্যেও কালের অবক্ষয় এড়িয়ে টিকতে টিকতে তিনি এসেছেন এতদূর পর্যন্ত। তবে অবশ্যই তা অকারণে নয়। কেননা সঙ্কট থেকে মানবতার উত্তরণ ঘটানোটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে প্রধান অবলম্বন। জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে মঙ্গল চেতনার–কল্যাণ বোধের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর ব্রত। বাঙালি কবি হয়েও এ কাজে তিনি ছিলেন সর্বমানবিক। *অমরত্বের জ্বালায়* এসব কথাই ফিরে ফিরে এসেছে, কোথাও বৌদ্ধ-কাহিনী ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, উনিশ শতকের শেষাশেষি রবীন্দ্রমানসে প্রাচীন ভারত ও পরবর্তীকালের তার নানা ঐতিহাসিক বিষয়ে এমনকি কিংবদন্তিগুলো এক নতুন ডাইমেনশন নিয়ে এসেছিল। বৌদ্ধ-কাহিনীগুলো তারই অংশ। আর একথা ঠিক যে নতুন ধর্ম চিরকালই সমাজে নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। এতে করে অনিবার্যভাবে সামাজিক মানুষেরও অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। প্রচলিত সমাজের একটা কাঠামো থাকে। সেখানে কায়েমি স্বার্থবাদের যে গাঁটছড়া তাতে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি কখনই চায় না বদল ঘটুক। কারণ তার স্বার্থরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থাই সেই সিস্টেমের মধ্যে রয়ে গেছে। কিন্তু যারা নির্যাতিত-নিপীড়িত-সামাজিক অসাম্যের শিকার, পরিবর্তন কাম্য তাদেরই। একারণেই অতীতে দেখা গেছে, নতুন ধর্ম প্রবর্তিত হলে গড়ভাবে সমাজের নীচুতলার মানুষেরাই তাতে সাড়া দিয়েছে বেশি। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে এর মূল্য যে কতটা অপরিসীম তা সহজেই অনুমেয়।

আবার কোথাও আমাদের চোখে পড়ে মহাভারত থেকে আহরিত কাহিনী নিয়ে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' সম্পর্কিত আলোচনা। যেখানে মহাভারতের কর্ণ আর রবীন্দ্রনাথের কর্ণের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্য নির্ণয় করেছেন সুললিত ভাষায়। বলেছেন, মহাভারতের কর্ণ যেমন লোভের কাছে নিজেকে বিসর্জন দেননি তেমনি রবীন্দ্রনাথের কর্ণ হলেও দুই কর্ণ কী এক? গর্ভধারিণী মাতার স্নেহবঞ্চিত সন্তানের হৃদয়ক্ষরণকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন তাতে কর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষেই এক নতুন মানুষে। মহাভারতে কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ রয়েছে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' এ রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন এক নতুন মাত্রা, বলা যায় এই সাক্ষাৎকার পুনর্লিখিতই হয়েছে।

তবে বোতাম আঁটা জামার নিচে' প্রবন্ধটি পাঠ করতে করতে আমরা একটু নড়ে চড়ে উঠি। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে যায় এক বিশাল আয়না। যে আয়নায় প্রতিফলিত হয় ক্রুর, ছিদ্রান্বেষী, অসূয়াপ্রবণ বাঙালি—মানে এই আমরা, আমাদেরই মুখ। আমরা কান পাতি। শুনতে চাই রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বিষয়-আশয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বাঙালি এবং তার চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কী বলেছেন। এ প্রসঙ্গে জুলফিকার মতিন ২৯ জানুয়ারি ১৮৯৮ সালে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক পত্রের উল্লেখ করেছেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের দ্বৈতশক্তির কথা বলেছেন: এখন এক-একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে [...] একদিকে কবিতা, আর দিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা আর দিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস।' এবং এর পরপরই লেখক তৎকালীন কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু শিক্ষিতসমাজ জীবনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন এদের বহুতর বিষমতা ও বৈপরীত্ব কীভাবে নতুন মাত্রা পাচ্ছে। ইংরেজ সাহেবের অফিসে কাজ টাজ সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দিব্যি গঙ্গাজলে নিজেদের পূত-পবিত্র করে তোলা চলছে নিয়মিত। স্বামী ম্লেচ্ছদের খাবার খাচ্ছেন কিন্তু স্ত্রী তা মুখে তুলবেন এমন অধর্ম কলিকালেও করা চলবে না। ফলে দেশপ্রেমের ব্যাপারটা যেমন আসে, স্বাজাত্যবোধের যে উদ্গীরণ ঘটে তার ফল ভারতবাসীর জন্য ইতিবাচক হলেও যেটাকে কন্ট্রাডিকশন বলা হয় তারও প্রাদুর্ভাব ছিল যথেষ্ট। কথার সঙ্গে কাজের মিল নেই, চিন্তার সঙ্গে আচরণের। কিন্তু সেটাকে ঢেকে রেখে ভালো মানুষ সাজা—এই টাইপটাকে চিহ্নিত করার বিষয়টা নিশ্চিতভাবেই অনুভব

করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লেখক আরও উল্লেখ করেছেন, খবরের কাগজ পড়া ও তা থেকে পোলিটিকাল তর্ক করা ছিল তখনকার ভদ্রলোকদের অলস সময় কাটানোর এক মাধ্যম। সংবাদপত্রে বড় বড় কথা লেখা হয় এবং তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনারও শেষ থাকে না কিন্তু ফলাফল হয় শূন্য। এটি আসলে অকর্মণ্যতারই একটা লক্ষণ। এবং রবীন্দ্রনাথ এটা খেয়াল করেছিলেন বলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে আহ্বান করেছেন এসব দম্ভ ভরা কাগজ। তাঁর দৃষ্টিতে এসব ভদ্রলোক স্থাপন করছে প্রভুভক্তির এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। দাসত্বের সুখে এদের মুখে হাসি, জোড়কর, বিনীত, প্রভুর পদ-সোহাগে কলেবর দোলায়িত। তাদের পাদুকাতলে নিজেদের সমর্পণ করে ব্যগ্র হয়ে ঘৃণায় মাখানো অন্ন খুঁটে খুঁটে মুঠোতে ভরে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। এই আত্ম-অবমাননা সম্পর্কে এদের কোনো গ্লানিবোধ নেই। বরং পূর্বপুরুষ আর্যদের তেজের দর্পে পৃথিবী যে থরহর থাকত সেই গর্বে এরা গর্বিত। এখানেই এদের আত্ম-অহঙ্কার। এদের চারিত্রিক স্খলনে রবীন্দ্রনাথের পরিহাস প্রবণতাও ফুটে ওঠে, কীসের এত অহংকার! নতমুখী চরিত্র নিয়ে কিসের এত দম্ভ বরং লজ্জায় মৌন হওয়াই শ্রেয়। তাঁর মনে হয় এইসব 'তীব্র অপমান' কী 'অহর্নিশ হেলার হাসি' মর্মতল ভেদ করে আদৌ বজ্রের মতো কী বাজে, উত্তপ্ত হয়ে রক্তধারা শরীরের মধ্যে কী প্রবাহিত হয়? বাঙালি চরিত্রের এই ভণ্ডামি রবীন্দ্রনাথকে উত্তেজিত করে তুলেছে। শুধু তাই নয় সভাসমিতি অর্গানাইজ করা কী তাতে অংশ নেয়া কী বক্তৃতা দেয়া বা শোনা বা পিটিশন লেখা এগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনকার কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালিদের একটা বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কী করে দেশ ও জাতির উন্নতি হবে এ নিয়ে এরা ছিল নিয়তই সোচ্চার। বোধের ভেতর ভারত মাতা জেগে উঠেছে এ সময় দরকার পুরাকালের ভীষ্ম-দ্রোণের মতো বীরদের কিন্তু তারাই বা এখন কোথায়? কী করেই বা এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায় এই নিয়ে যখন তারা উৎকণ্ঠিত তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবজাত হাস্য-পরিহাসের শব্দযোগে বর্ণনা করেন, এই উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশের দুঃখে সতত দগ্ধ হয়ে মনের বেদনা সকলের কাছে প্রকাশ করে এক লম্বা পিটিশনে নাম স্বাক্ষর করতে হবে। তারপর বুকের ছাতি ফুলিয়ে 'আমরা বড়ো' একথা যে না বলবে তাকে গালিটালি দিয়ে অতঃপর নিজেদের যা কিছু বলার আছে তা কাগজ ভরে লিখতে হবে, হাতের কাছে রাখতে হবে কলম ও কালি। আর এভাবেই (ছায়ার সঙ্গে?) যুদ্ধ করা শিখতে হবে। আসলে তখনকার শিক্ষিত বাঙালির

চারিত্রিক অসংগতিগুলোকে মানুষের আদিপাপের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। জুলফিকার মতিন তেমনটাই বলেছেন এ প্রবন্ধে। মানুষের যেমন ঐ পাপের নিদান নেই বাঙালির চারিত্রিক অসংগতি নিয়েও তেমন কথাও বলা যায়। দেশ-জাতি-সমাজের ঐ একই অসংগতির ধারাবাহিকতার সন্দেহ নেই এখনও বজায় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তা অনুধাবন করেছেন এবং সেই ফাঁকির ধরনকে চরম পরিহাস করেছেন নানাভাবে এবং পরিহাস করতে করতেই আবার ফিরে গেছেন স্বধর্মে, বলেছেন সেই অনন্য রাবীন্দ্রিক ঢঙে, কাজ করতে হবে। কাজ করতে হবে মানুষের জন্য। কাজ করতে হবে নিঃশব্দে-নীরবে। কেননা ঐ কাজটুকুই থেকে যাবে পৃথিবীতে। আর কিছু নয়।

আর এ সব পড়তে পড়তে, জানতে জানতে, পড়তে পড়তে আমাদের সামনের সেই আয়নাটা আরও বৃহৎ হতে থাকে। বৃহৎ হতে হতে ধূসর হতে থাকে। ধূসর হতে হতে ঘোলাটে হতে থাকে। যেখানে আমাদের প্রতিবিম্বগুলো অটুট থাকে না। এলোমেলো হয়ে ভেঙেচুরে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবন ধরে চেয়েছিলেন আত্মার মুক্তি--আত্মিক জাগরণ। সেই জাগরণের রঙ খুঁজি আপ্রাণ। কিন্তু কোথায় সেই রঙ? আমরা জ্যোৎস্নাহীন, চন্দ্রমল্লিকার সৌরভহীন, মাতৃদুগ্ধ সম নদীহীন, শ্যামল-শোভা বেষ্টিত প্রকৃতিহীন এক জড়-পৃথিবীর নাগরিক হয়ে ঐ অন্ধ আয়নার ভেতর কেবল হাতড়িয়ে মরি, কে আমি কোথায় আমি কেন আমি? আঁতিপাতি করে খুঁজতে থাকি আমাদের পলাতক সেই মানবিক আত্মাটাকে। যে আত্মার খোঁজ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন।

অমরত্বের জ্বালা রবীন্দ্র-পরিভ্রমণের বই। রবীন্দ্রবিশ্বের ন'ধরনের বিষয় নিয়ে এর গতিপথ। লেখকের আটপৌরে অথচ টানটান গদ্যের যাদুতে এখানে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই রবীন্দ্রনাথ যাঁর শরীর থেকে সরে গেছে ভক্তি ও আবেগের অনাবশ্যক জোব্বা। বেরিয়ে পড়েছে তাঁর চিরাচরিত সাধারণ মানবীয় চেহারা। যিনি অনায়াসেই আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতে পারেন, আমি তোমাদের লোক।

সাহিত্যিকী

লেখকের জন্য জ্ঞাতব্য

লেখক-গবেষকদের নির্ধারিত নিয়ম (নিম্নে বর্ণিত) মেনে প্রবন্ধ জমা দিতে হবে নইলে তা বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।

- পাণ্ডুলিপির দুই কপি কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট(মুদ্রিত সংস্করণ) সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে এবং একপি ই-ভার্সন (বৈদ্যুতিন সংস্করণ) *সাহিত্যিকীর* ই-মেইল sahityiki.ru@gmail.com-এ প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া বাংলা বিভাগের অফিসে হাতে হাতেও জমা দেওয়া যাবে।
- লেখা প্রকাশের জন্য সম্পাদক-সমীপে একটি আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। আবেদনপত্রে অবশ্যই প্রবন্ধ-লেখকের পেশাগত পরিচয়, ঠিকানা, ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর থাকবে।
- প্রবন্ধের মূল পাঠের সঙ্গে অনধিক ২০০ শব্দের বাংলা 'সার-সংক্ষেপ' ও ইংরেজি 'Abstract' এবং মূল পাঠের শব্দসংখ্যা ও প্রবন্ধটির কয়েকটি সংকেত-শব্দের ('Key-Word') উল্লেখ করতে হবে।
- প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার ১টি কপি এবং তাঁর লেখার ১০ কপি অফপ্রিন্ট পাবেন।
- প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অথবা *বাঙ্গালা অভিধান, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের ভুক্তি অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের উপর-অধিলিপিতে (super-script) সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে (যেমন : [১]) ।

- তথ্যনির্দেশে লেখক বা লেখকগণের পূর্ণ নাম থাকবে। বই ও পত্রিকার উৎস দেখানোর সময় অনুসরণীয় নীতি হলো—প্রকাশিত বই: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*(ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ৪০
- মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙক্তি-বিন্যাস থাকবে।
- মূল পাঠে অপরিচিত বিদেশি শব্দ থাকলে তা বিদেশি শব্দ বাংলা লিপিতে প্রতিলিপিকরণের(Transcription) নিয়ম অনুযায়ী লিখতে হবে। ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।
- গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে তথ্যনির্দেশে সকলের নাম উল্লেখ করতে হবে।
- কবিতা-গল্প-প্রবন্ধের নামে ডাবল উর্ধ্বকমা (" "), গ্রন্থের নাম ও পত্রিকার নাম *ইটালিক* করতে হবে।
- উদ্ধৃতিতে গ্রন্থ, প্রকাশনা, পৃষ্ঠা নম্বর পর-পর একই হলে 'তদেব' ব্যবহার করতে হবে। উদ্ধৃতিতে 'পূর্বোক্ত' ব্যবহার করতে হবে, 'প্রাগুক্ত' বা 'ঐ'-এর ব্যবহার চলবে না।
- এন্ডনোট পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে এবং প্রতি উদ্ধৃতির শেষে দাঁড়ি (।) চিহ্ন থাকবে না।
- প্রবন্ধ বিষয়ে অবেক্ষকের পর্যবেক্ষণ ও মতামত অনুসারে সংশোধন, সংযোজন কিংবা বিয়োজন প্রয়োজনীয় হলে সম্পাদনা-পর্ষদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন-সংযোজন-বিয়োজন করে পাঠাতে হবে।

সম্পাদক

সাহিত্যিকী

বাংলা বিভাগ | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | রাজশাহী

সাহিত্যিকী

প্রকাশনা তথ্য

প্রবন্ধ-সংখ্যা ০৮ • পুস্তক-পর্যালোচনা ০১ • শব্দ-সংখ্যা ৪৬১০৯ • ফন্ট-এর আকার : বডি-টেক্সট ১২, সার-সংক্ষেপ ১১, তথ্যসূত্র ১১ • মার্জিন : চারপাশে ৬.৫×৪.১৫ • লাইন-স্পেসিং ১.০৮, ১.০২ • ব্যবহৃত কাগজ : ৮০ গ্রাম বসুন্ধরা অফ হোয়াইট • ফর্মা সংখ্যা ১২ • প্রচ্ছদ রঙিন • মুদ্রণ-সংখ্যা ৮০০ কপি • ব্যবহৃত ফন্ট : বাংলা SutonnyMJ, ইংরেজি: Corbel, Westfalia • মুদ্রাক্ষরিক আনোয়ার হোসেন • মুদ্রণ উত্তরা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী

1994-4888